হযরত ইমাম গায্যালী (র)

সৌভাগ্যের পরশমণি

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ব্যবহার

আবদুল খালেক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত ইমাম গায্যালী (র) ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও মর্মবাণীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলি মানুষের আত্মিক উন্নয়নে শত শত বছর ধরে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডারে হযরত ইমাম গায্যালী (র)-এর গ্রন্থরাজি হীরকখণ্ডের মতো বর্ণালী আলো ছড়িয়ে চলেছে। তাঁর গ্রন্থাবলি পৃথিবীর প্রায় সবগুলো শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। হযরত ইমাম গায্যালী (র) রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' একটি অনন্য গ্রন্থ। এর দ্বিতীয় খণ্ডে পানাহার, বিবাহ, উপার্জন, হালাল-হারাম, সন্দেহযুক্ত বিষয়ের পরিচয়, সর্বসাধারণ, বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশী, দাস-দাসী ও দরিদ্রের হক, নির্জনবাস, ভ্রমণ, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ এবং প্রজাপালন ও রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয়ে সুগভীর আলোচনা রয়েছে। এ সবগুলো বিষয়ই হযরত ইমাম গায্যালী (র) কুরআন-হাদীস, দর্শন ও যুক্তির নিরিখে অত্যন্ত সুগভীর পাণ্ডিত্যের সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর যুক্তির সাথে রয়েছে আত্মিক উপলব্ধিরও স্পর্শ। বিশ্বখ্যাত এই কিমিয়ায়ে সা'আদাত গ্রন্থটি 'সৌভাগ্যের পরশমণি' নামে অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক জনাব আবদুল খালেক। অত্যন্ত সহজ, হৃদয়গ্রাহী ও সাবলীল ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটি ইতোমধ্যে পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রচুর পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এর পঞ্চম সংস্করণ (ইফাবা চতুর্থ সংস্করণ) প্রকাশ করা হলো।

আমরা আশা করি, বইটি এবারও আগের মতোই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অভিমত

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায্‌যালী (র) ছিলেন ইসলাম জগতের অদ্বিতীয় আলিম ও অসামান্য খোদাপ্রেমিক ওলী। তাঁর রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' অন্যতম। এই গ্রন্থখানি তরীকত পন্থীদের পথপ্রদর্শক। ইহাতে আছে মানসিক রোগসমূহের সম্যক পরিচয় এবং উহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্য এই ব্যাপারে কামিল মুরশিদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

গ্রন্থখানি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া আল্লাহ্ প্রেমিক ও জ্ঞানানুরাগীদের পিপাসা মিটাইয়া আসিতেছে। বাংলা ভাষায়ও ইহার অভ্রান্ত অনুবাদ প্রকাশের তীব্র অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রিয় বন্ধু মৌলভী আবদুল খালেক বি.এ. (অনার্স) সাহেব বাংলা ভাষাভাষীদের এই অভাব পূরণে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

দোয়া করি, এই অনুবাদ গ্রন্থ 'সৌভাগ্যের পরশমণি' আল্লাহ্র দরবারে কবূল হউক এবং মূল গ্রন্থকার এবং অনুবাদকের পরিশ্রম ও নেক উদ্দেশ্য সফল হউক। আমীন!

আহ্কার
আবদুল ওহ্হাব
মুহ্তামিম
হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা
বড়কাটরা, ঢাকা

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ব্যবহার

এই খণ্ড দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত; যথা ঃ (১) পানাহার প্রণালী, (২) বিবাহ এবং বৈবাহিক জীবন যাপন পদ্ধতি, (৩) উপার্জন ও ব্যবসায় বিধি, (৪) হালাল রুযী অন্বেষণ, (৫) মানবজাতির সহিত জীবন যাপন প্রণালী, (৬) নির্জনবাস প্রণালী, (৭) বিদেশ ভ্রমণের নিয়ম, (৮) সঙ্গীত ও সঙ্গীত মোহ, (৯) সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্ম প্রতিরোধ প্রণালী, (১০) রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন পদ্ধতি।

প্রথম অধ্যায়

পানাহার

ইবাদতের পন্থাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং পথের সম্বলও এক হিসাবে পথের অন্তর্গত। সুতরাং ধর্মপথের যাবতীয় আবশ্যক বস্তুই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম-পথ-যাত্রীর আহারের প্রয়োজন। সকল ধর্ম-পথ-যাত্রীর একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ। ইল্‌ম ও সৎকর্ম ইহার বীজ। জ্ঞানলাভ ও কর্মানুষ্ঠান শারীরিক সুস্থতা ব্যতীত সম্ভব নহে এবং পানাহার ব্যতীত শারীরিক সুস্থতা অসম্ভব। সুতরাং ধর্ম পথে চলার জন্যে পানাহার একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই পানাহারও ধর্ম-কর্মের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

পাক হালাল খাদ্য আহার কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর।

খাদ্য গ্রহণ ও সৎকর্ম, এই উভয়টিকে আল্লাহ্ এই আয়াতে একত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন, সৎকর্মানুষ্ঠান ও ধর্ম-পথে চলার শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে আহার করে, তাহার পানাহারও ইবাদত বলিয়াই পরিগণিত হয়। এই জন্যই রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন ঃ "প্রত্যেক কাজেই মুসলমানের সওয়াব আছে; এমন কি যে গ্রাস সে নিজের মুখে তুলিয়া লয় এবং যে গ্রাস নিজের পরিবার-পরিজনের মুখে প্রদান করে তাহাতেও তাহার সওয়াব হয়।" তিনি এই জন্যই ইহা বলিয়াছেন যে, মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজই পরকালের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। অতএব তাহার পানাহারও ধর্ম-কর্মের অন্তর্গত।

পানাহার ধর্মকর্মের অন্তর্গত হওয়ার নিদর্শন ঃ পানাহার ধর্ম-কর্মের অন্তর্গত হওয়ার কতিপয় নিদর্শন আছে ; যথা ঃ (১) লোভের বশবর্তী হইয়া পানাহার না করা। (২) হালাল উপায়ে উপার্জিত বস্তু আবশ্যক পরিমাণে পানাহার করা এবং (৩) পানাহারের নিয়মসমূহ পালন করা।

পানাহারের প্রণালী ঃ আহার গ্রহণে কতিপয় সুন্নত কাজ আছে। উহার মধ্যে কয়েকটি আহারের পূর্বে, কয়েকটি আহার গ্রহণের সময় এবং কয়েকটি আহারের পরে পালন করিতে হয়।

আহারের পূর্বে সাতটি সুন্নত কার্য ঃ (১) হাত-মুখ ধৌত করা। পরকালের নিয়্যতে আহার করিলে ইহা ইবাদতে গণ্য হয় বলিয়া আহারের পূর্বে হাত-মুখ ধৌত

করা ওযুস্বরূপ। ইহা ব্যতীত ধৌত করায় হাত-মুখের মলিনতা বিদূরীত হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি আহারের পূর্বে হাত ধৌত করিবে সে দরিদ্রতা ও অভাবগ্রস্ততা হইতে নিশ্চিন্ত থাকিবে।" (২) আহার্যদ্রব্য দস্তরখানে রাখিয়া আহার করা, শুধু থালার উপর রাখিয়া আহার না করা। রাসূলে মকবুল (সা) খাদ্য দস্তরখানের উপর রাখিয়াই আহার করিতেন। কারণ, দস্তরখান সফরের (স্থানান্তরে গমনের) কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং দুনিয়ার সফর পরকালের সফরের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে। দস্তরখানের উপর আহার্য দ্রব্য রাখিয়া আহার করাতে দীনতাও প্রকাশ পায়। থালায় রাখিয়া আহার করাও দুরস্ত আছে, কেননা ইহার বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। তবে দস্তরখানের উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া আহার করাই পূর্বকালীন বুযর্গগণ ও রাসূলে মকবুল (সা)-এর অভ্যাস ছিল। (৩) ডান হাঁটু উঠাইয়া রাখিয়া বাম পা পাতিয়া বসিবে; কোন কিছুর উপর হেলান দিয়া আহারে বসিবে না। কারণ রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন ঃ "আমি হেলান দিয়া আহার করি না, কেননা আমি আল্লাহ্‌র একজন দাস; দাসের ন্যায় বসি এবং দাসের ন্যায় আহার করি।" (৪) ইবাদতে শক্তি সঞ্চয়ের নিয়্যতে আহার করা, লোভের তাড়নায় আহার না করা। হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন শায়বান (র) বলেন ঃ "আশি বৎসর যাবত কোন বস্তু আমি লোভের তাড়নায় ভক্ষণ করি নাই।" অল্লাহারের ইচ্ছা থাকিলেও এই নিয়্যত ঠিক বলিয়া ধরা যাইবে।। অতিভোজন মানুষকে ইবাদত হইতে বিরত রাখে। এই জন্যই রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন ঃ "ছোট ছোট কয়েক লোক্‌মা যাহা লোকের পিঠ সোজা রাখে, তাহাই যথেষ্ট। "এই পরিমাণে পরিতুষ্ট হইতে না পারিলে উদরের এক-তৃতীয়াংশ আহারের নিমিত্ত, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখিবে অর্থাৎ পেটের দুই তৃতীয়াংশ পানাহার দ্বারা পূর্ণকরতঃ এক তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখিবে (৫) ভালরূপে ক্ষুধা না পাইলে আহার করিবে না। আহারের পূর্বে পালনীয় সুন্নতসমূহের মধ্যে ক্ষুধাই প্রধান। কারণ, ক্ষুধার পূর্বে আহার করা মাক্‌রূহ ও নিতান্ত দূষণীয়। যে ব্যক্তি ক্ষুধা পাইলে আহারে প্রবৃত্ত হয় এবং কিছু ক্ষুধা থাকিতেই আহারে বিরত হয়, তাহার চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। (৬) উত্তম খাদ্যের জন্য লালায়িত না হইয়া যাহা জোটে তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে আহার করিবে। কারণ, মুসলমানের আহারের উদ্দেশ্য ইবাদতের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদ ইহার উদ্দেশ্য নহে। আহার্য-দ্রব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সুন্নত। কারণ, ইহার উপরই মানবদেহের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আহার্য-দ্রব্য উপস্থিত পাইলে তরকারির প্রতীক্ষায় না থাকিয়া, এমনকি নামাযের প্রতীক্ষাও না করিয়া আহার করিয়া ফেলিলেই উহার প্রতি বড় সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আহার্য-সামগ্রী উপস্থিত হইলে আহারের পর নামায পড়িবে। (৭) আহারের সাথী না আসা পর্যন্ত আহার গ্রহণ করিবে না। কারণ, একাকী

আহার করা সঙ্গত নহে। খাদ্য-পাত্রে যত অধিক হস্ত মিলিত হইবে ইহাতে তত অধিক বরকত হইবে। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, রাসূলে মক্‌বুল (সা) কখনও একাকী আহার করিতেন না।

আহারের সময় পালনীয় নিয়ম ঃ প্রথমে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিয়া আহার আরম্ভ করিবে এবং আহার শেষে 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌' বলিবে। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই যে. প্রথম গ্রাসে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌', দ্বিতীয় গ্রাসে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মান' এবং তৃতীয় গ্রাসের সময় 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলিবে। এইগুলি জোরে বলিবে যেন অপর লোকেরও স্মরণ হয়। ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ করিবে। লবণ দ্বারা আহার আরম্ভ করিবে এবং লবণ দ্বারাই শেষ করিবে। কারণ, খাহেশের বরখেলাপ লবণ দ্বারা আহার শুরু করত ঃ লোভ দমনের কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। ছোট ছোট গ্রাস মুখে দিবে এবং উত্তমরূপে চর্বণ করিবে। প্রথম গ্রাস গলাধঃকরণ না করিয়া অন্য গ্রাস গ্রহণ করিবে না। খাদ্য-দ্রব্যের কোন দোষ বর্ণনা করিবে না। কারণ রাসূলে মক্‌বুল (সা) কখনও খাদ্য-দ্রব্যের দোষ বর্ণনা করিতেন না; ভাল হইলে আহার করিতেন, অন্যথায় হস্ত সংকুচিত করিয়া লইতেন। বরতনের যে পার্শ্ব নিজের দিকে থাকে সে পার্শ্ব হইতে আহার করিবে। কিন্তু ফলমূল জাতীয় খাদ্য হইলে বরতনের সকল অংশ হইতে ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ করা যায়। কারণ, ফলমূল বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। "সারীদ' নামক খাদ্য বরতনের মধ্যভাগ হইতে আহার না করিয়া চারি পার্শ্ব হইতে গ্রহণ করিবে। রুটি মধ্যস্থল হইতে ছিঁড়িয়া খাইবে না; বরং চারি পার্শ্ব হইতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে। রুটি ও গোশ্‌ত ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাইবে না। পেয়ালা ইত্যাদি যাহা আহার্য দ্রব্য নহে তাহা রুটির উপর রাখিবে না। রুটির উপর হাত মুছিবে না।

গ্রাস বা খাদ্য-দ্রব্যের কোন অংশ হস্তচ্যুত হইলে উহা উঠাইয়া লইবে এবং পরিস্কার করিয়া খাইয়া ফেলিবে। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হস্ত হইতে পতিত খাদ্যাংশ পরিত্যাগ করিলে শয়তানের জন্যই পরিত্যাগ করা হয়। অঙ্গুলি সংযুক্ত খাদ্যাংশ প্রথমে চাটিয়া খাইয়া তৎপর নিজের কোন বস্ত্র দ্বারা হাত মুছিয়া ফেলিবে। কেননা অঙ্গুলি সংযুক্ত খাদ্যাংশে হয়ত বরকত থাকিয়া যাইতে পারে। আহার্য দ্রব্য গরম থাকিলে ফুৎকার দিয়া আহার করিবে না; বরং ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। খুরমা, আপেল বা এই প্রকার কোন দ্রব্য যাহা গণনা করা যায় তাহা বেজোড় সংখ্যায় যেমন, সাত, এগার কিংবা একুশ ইত্যাদি গণিয়া আহার করিবে যেন সকল কাজেই আল্লাহর সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কারণ, আল্লাহ্‌ একক, বেজোড়, তাহার কোন জোড়া নাই। যে কাজে কোন প্রকারেই আল্লাহ্‌র স্মরণ না হয় তাহা বাতিল ও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এই জন্যই বেজোড় সংখ্যক দ্রব্য জোড় সংখ্যক দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, ইহাতে আল্লাহর সম্বন্ধ থাকে। খুরমা আহার করিয়া ইহার

আঁটি বরতনে কিংবা হাতে রাখিবে না। যে সমস্ত বস্তুর খোসা বা অখাদ্য অংশ ফেলিয়া দিতে হয় সেসব সম্বন্ধেও এই একই ব্যবস্থা। আহারের সময় বেশি পানি পান করিবে না।

পানি পানের নিয়ম ঃ পানপাত্র ডান হাতে ধরিবে এবং 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলিয়া আস্তে আস্তে পান করিবে। দাঁড়াইয়া বা শায়িত অবস্থায় পান করিবে না। পানপাত্র হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ইহাতে কোন প্রকার খড়কুটা বা জীবাণু আছে কিনা। ঢেকুর উঠিলে পান পাত্র হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। এক ঢোকের অধিক পান করিতে চাহিলে তিন ঢোকে পান করিবে; প্রত্যেক বার 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলিবে এবং সর্বশেষে 'আলহামদলিল্লাহ্' বলিবে। পানপাত্রের নিম্নদিকে লক্ষ্য রাখিবে যেন পানীয়দ্রব্য টপকাইয়া না পড়ে। পানশেষে এই দু'আ পড়িবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَهٗ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا–

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি নিজ অনুগ্রহে এই পানীয়কে মিষ্ট ও সুস্বাদু করিয়াছেন এবং আমাদের পাপের কারণে ইহাকে লবণাক্ত ও বিস্বাদ করেন নাই।

আহার শেষে পালনীয় নিয়ম ঃ উদর পূর্ণ হইবার পূর্বেই আহারে ক্ষান্ত হইবে, আঙ্গুলগুলি চাটিয়া পরিষ্কার করিবে এবং দস্তরখানের উপর যে সমস্ত খাদ্যাংশ পড়িয়া থাকে তাহা নিঃশেষে তুলিয়া খাইবে। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দস্তরখানা হইতে খাদ্য তুলিয়া খাইবে তাহার জীবিকার সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার সন্তান-সন্ততি নির্দোষ ও নিরাপদে থাকিবে এবং ঐ খাদ্যসমূহ বেহেশ্‌তে হূরদের সহিত বিবাহের মাহর থাকিবে। অতপর হাত রুমাল বা দস্তরখানে মুছিয়া ফেলিবে। তৎপর খিলাল করিবে। দাঁতের ফাঁক হইতে বাহির হইয়া যাহা জিহ্‌বার উপর পতিত হয় তাহা গিলিয়া ফেলিবে এবং খিলালের সহিত যাহা বাহির হইয়া আসে তাহা ফেলিয়া দিবে। ভোজন-পাত্রের খাদ্যাংশ আঙ্গুল দ্বারা চাটিয়া খাইবে। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ভোজন-পাত্র মুছিয়া খায় ইহা তাহার জন্য এইরূপ দু'আ করে-"হে আল্লাহ ! এই ব্যক্তি যেমন আমাকে শয়তানের লেহন হইতে রক্ষা করিয়াছে তদ্রূপ তুমি তাহাকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।" ভোজনের পাত্র ধৌত করত এই পানি পান করিলে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাওয়া যায়। আহারান্তে বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا–

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদিগকে পানাহার করাইয়াছেন, আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছেন। তিনিই আমাদের পরিচালক ও প্রভু।

তৎপর সূরা ইখলাস ও সূরা কুরাইশ পাঠ করিবে।

হালাল খাদ্য খাইয়া থাকিলে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। কিন্তু সন্দেহজনক খাদ্য খাইয়া থাকিলে রোদন ও অনুতাপ করিবে। কারণ, যে ব্যক্তি আহারান্তে রোদন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নহে যে আহারান্তে উদাসীনতার দরুণ হাস্য করে। পরিশেষে হাত-মুখ ধুইবে। ধৌত করিবার সময় বাম হাতে 'ওশনান' নামক ঘাসের পাতা লইবে। প্রথমে ডান হাতের আঙ্গুলের অগ্রবাগ 'ওশ্‌নান ' ছাড়া ধুইবে। তৎপর ওশনানে আঙ্গুল মলিবে। ঠোঁট , দাঁত ও তালুর উপর ওশ্‌নান দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ইহার পর আঙ্গুলিগুলি ধুইয়া ফেলিবে। মুখের ভিতরের অংশও ওশ্‌নানের পাতার দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ধুইবে।

অন্যের সহিত আহারের নিয়ম ঃ একাকী কিংবা অন্যের সহিত ভোজনকালে সর্বাবস্থায় উল্লিখিত নিয়মসমূহ পালন করিতে হইবে। তদুপরি অপরের সহিত ভোজনকালে আরও সাতটি নিয়ম পালন করিতে হইবে। **প্রথম ঃ** যিনি বয়সে, জ্ঞানে পরহিযগারীতে কিংবা অন্য কোন কারণে শ্রেষ্ঠ, তিনি আহার আরম্ভ না করা পর্যন্ত আহারে প্রবৃত্ত হইবে না। অপর পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পক্ষে বিলম্ব করিয়া অন্যান্য লোককে প্রতীক্ষায় বসাইয়া রাখা উচিত নহে। **দ্বিতীয় ঃ** একেবারে চুপচাপ বসিয়া আহার করিবে না; কারণ নীরবে আহার করা বিজাতীয় রীতি। বরং মুত্তাকী, পরহিযগার, বুযুর্গগণের কাহিনী, জ্ঞানগর্ভ বাক্য ও শরীয়তের সুন্দর বিষয় আলোচনা করিবে। অলীক ও অশ্লীল কথা বলিবে না। **তৃতীয় ঃ** নিজে যেন সঙ্গীদের অপেক্ষা অধিক না খাও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সকলের আহার্য-দ্রব্য একত্রে মিলিত থাকিলে অধিক খাওয়া হারাম। বরং নিজে কম খাইয়া সঙ্গীদিগকে অধিক খাইতে দিবে এবং উপাদেয়গুলি তাহাদের সম্মুখে বাড়াইয়া দিবে। সঙ্গী ধীরে ধীরে খাইতে থাকিলে তাহাকে নিঃসঙ্কোচে ও প্রফুল্লচিত্তে অনুরোধ করিবে। কিন্তু তিনবারের অধিক 'খাও, খাও' বলিয়া অনুরোধ করিবে না। কারণ, ইহার অধিক করিলে অত্যধিক অনুনয়-বিনয় ও বাড়াবাড়ি করা হয়। আহারের জন্য কসমও দিবে না। কেননা, আহার অপেক্ষা কসমের মর্যাদা বেশি। **চতুর্থ ঃ** এমনভাবে আহার করিবে যেন সাথীকে 'খাও, খাও' বলিয়া অনুরোধ করিবার প্রয়োজন না পড়ে; বরং সাথী যেমনভাবে আহার করে তুমিও সেইভাবে আহার করিবে। নিজের অভ্যাসের চেয়ে কম আহার করিবে না। কারণ, ইহা রিয়া। সাথীদের সঙ্গে বসিয়া যেরূপভাবে আহার কর একাকী আহারকালেও সেই নিয়মগুলি মানিয়া চলিবে। তাহা হইলে মজলিসে আহারকালেও আদব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। সঙ্গীকে বেশি খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে নিজে অল্প আহার করা উত্তম।

হযরত ইব্‌ন মুবারক (র) দরিদ্রদিগকে দাওয়াত করত ঃ তাহাদের সম্মুখে খুরমা স্থাপন পূর্বক বলিতেন, "যে ব্যক্তি অধিক খাইবে এক- একটি আটির জন্য তাহাকে একটি করিয়া রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিব।" আহারের পর গণনা করত যাহার আঁটির সংখ্যা অধিক পাইতেন তাহাকে আঁটি প্রতি একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার দিতেন। **পঞ্চম ঃ** আহারের সময় দৃষ্টি নিম্নদিকে রাখিবে এবং অপরের লোকমার দিকে দৃষ্টি করিবে না। মজলিসের লোকেরা তোমাকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া জ্ঞান করিলে তুমি সকলের পূর্বে বরতন হইতে হাত উঠাইবে না। কিন্তু অপরের চক্ষে তুমি কম মর্যাদাসম্পন্ন হইলে প্রথম ভাগে তুমি হাত গুটাইয়া রাখিবে যেন শেষভাগে উত্তমরূপে আহার করিতে পার। কিন্তু উত্তমরূপে আহার করিতে অক্ষম হইলে ইহার কারণ প্রকাশ করিয়া দিবে। ইহাতে তোমার সঙ্গিগণ তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লজ্জাবোধ করিবে না। **ষষ্ঠ ঃ** আহারকালে এমন কোন কাজ করিবে না যাহাতে সহভোজীদের মনে ঘৃণার সঞ্চার হইতে পারে। বরতনের উপর হাত ঝাড়িবে না; বরতনের উপর এতটুকু ঝুঁকিয়া পড়িবে না যাহাতে মুখ হইতে বরতনে কিছু পড়িতে পারে। কোন কিছু মুখ হইতে বরতনে পড়িবার উপক্রম হইলে মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লইবে। চর্বিদার খাদ্য সির্কাতে ডুবাইয়া খাইবে না। যে দ্রব্য দাঁত দ্বারা কর্তন করা হইয়াছে তাহা পুনরায় বরতনে রাখিবে না। ইহাতে সহভোজীদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। যে সকল বস্তুর কথা বলিলে মনে ঘৃণা জন্মে এমন সব বস্তুর কথা বলিবে না। **সপ্তম ঃ** চিলম্‌চিতে হাত ধুইবার সময় অপরের সম্মুখে চিলম্‌চিতে থু থু-কাশি ফেলিবে না। মজলিসের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে হাত ধোয়াইয়া দিবে। সকলে তোমাকে সম্মান করিলে তাহা উপেক্ষা করিবে না। মজলিসে উপবিষ্ট লোকদের ডানদিক হইতে হাত ধোয়াইতে আরম্ভ করিবে। যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক লোকের হাত ধোয়াইয়া চিলম্‌চির পানি দূরে ফেলিয়া দিবে। প্রত্যেকের হাত ধোয়াইয়াই পানি ফেলিবে না। কারণ ইহা বিজাতীয় রীতি। একবার একই চিলমচিতে অনেক লোকের হাত ধোয়াই উত্তম। ইহাতে দীনতা ও নম্রতা প্রকাশ পায়। কুল্লি করিলে কুল্লির পানি চিলম্‌চিতে এত আস্তে ফেলিবে যেন অপরের শরীর বা বিছানায় পানি ছিটকাইয়া না পড়ে। যে ব্যক্তি হাত ধোয়াইবে তাহার দাঁড়াইয়া পানি ঢালাই উত্তম।

পানাহারের উল্লিখিত আবদসমূহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। এইগুলি দ্বারা মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। মনে যেরূপ চায় পশুরা তদ্রূপই আহার করিয়া থাকে। ইহারা ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারে না। আল্লাহ্ পশুকে ভাল-মন্দের বিচার-শক্তি প্রদান করেন নাই। মানুষকে আল্লাহ্ ইহা দান করিয়াছেন। এমতাবস্থায় সে যদি তদনুযায়ী কাজ না করে তবে বুদ্ধি ও বিচারশক্তিরূপ মহাদানের হক আদায় করা হইল না; বরং এই মহাদানের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল।

বন্ধু-বান্ধব ও ধর্মভ্রাতাগণের সহিত একত্রে আহারের ফযীলত ঃ বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করিয়া খাওয়ান প্রচুর দান-খয়রাত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, হাদীস শরীফে আছে যে, তিনটি বিষয়ে মানুষের নিকট হইতে কোন হিসাব গ্রহণ করা হইবে না। উহা এই ঃ (১) রোযার নিয়্যতে শেষরাতে যাহা খাইবে; (২) ইফতারের সময় যাহা আহার করিবে এবং (৩) বন্ধু-বান্ধবের সহিত যাহা আহার করিবে। হযরত জাফর ইব্‌ন সাদিক (র.) বলেন, "বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আহারে বসিয়া তাড়াতাড়ি করিবে না, যথাসম্ভব বিলম্ব করিবে। কারণ তাহাদের সহিত আহারকালে পরমায়ুর যে অংশটুকু ব্যয় হয় তাহার হিসাব হইবে না।" হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ "মানুষ নিজে যাহা পানাহার করে এবং স্বীয় মাতাপিতাকে যাহা পানাহার করায় উহার হিসাব হইবে। কিন্তু যে খাদ্য সে ধর্ম-বন্ধুদের সম্মুখে স্থাপন করে তাহার হিসাব হইবে না।" কোন এক বুযর্গের অভ্যাস ছিল যে, তিনি ধর্ম-বন্ধুগণকে খাওয়াইবার জন্য বহু পরিমাণে খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া সমস্তই তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেন এবং বলিতেন, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ "যে খাদ্য মেহমানের সম্মুখ হইতে উদ্বৃত্ত হয় তাহার হিসাব হইবে না। সুতরাং আমার ইচ্ছা এই যে, বন্ধুদের ভোজনের পর যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা হইতে আহার করি, যেন হিসাব দিতে না হয়।" হযরত আলী (রা) বলেন ঃ "ধর্মভ্রাতাগণের সম্মুখে এক সা (প্রায় সাড়ে তিন সের) পরিমাণ খাদ্য স্থাপন করা আমার নিকট একজন গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে বলিবেন, "হে আদম -সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে আহার দেও নাই।" মানুষ বলিবে, "হে আল্লাহ্! কেমন করিয়া তুমি ক্ষুধার্ত হইয়াছিলে? তুমি তো নিজেই সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি, তুমি তো কখনও আহারের মুখাপেক্ষী নও।" আল্লাহ্ বলিবেন, "তোমার ভাই ক্ষুধার্ত হইয়াছিল, তুমি তাহাকে আহার প্রদান করিলে যেন আমাকেই প্রদান করা হইত।' রাসূলে মকবুল (সা) বলেন ঃ " যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইকে উদর পূর্ণ করিয়া পানাহার করাইবে, আল্লাহ্ তাহাকে দোযখের অগ্নি হইতে সাত খন্দক দূরে রাখিবেন; প্রতি খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথ।" তিনি আরও বলেন ঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ-

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে ক্ষুধার্তকে আহার প্রদান করে।

বন্ধু দর্শনে গিয়া আহারের নিয়ম ঃ বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে আহারের চারিটি নিয়ম পালন করিতে হয়। যথা ঃ

১. অনাহূতভাবে আহারের সময় কাহারও নিকট যাইবে না। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, অনাহূতভাবে অপরের খাদ্য আহারের ইচ্ছা করা পাপের কার্য এবং অনাহূতভাবে আহার করিলে হারাম ভক্ষণ করা হয়। অকস্মাৎ আহারের সময় কাহারও বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলে সমাদর ব্যতীত তথায় আহার করিবে না। সমাদর করিলেও যদি মনে হয় যে, সমাদর আন্তরিক নহে তবেও খাওয়া উচিত নহে; বরং নম্রতার সহিত খাইতে অস্বীকার করিবে। কিন্তু যাহার বন্ধুত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে এবং যাহার মনোভাব জানা আছে, তাহার বাড়িতে অনাহূতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আহারের উদ্দেশ্যে গমন করা দুরস্ত আছে। বরং বন্ধুদের মধ্যে ইহা সুন্নত। কেননা, রাসূলে মক্‌বুল (সা), হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত উমর (রা) ক্ষুধার্ত হইলে কোন কোন সময় হযরত আবূ আইয়ুব আন্‌সারী ও হযরত আবুল হাসীম ইব্‌ন তাইহান (রা) -এর গৃহে গিয়া খাবার চাহিয়া খাইতেন। যদি জানা থাকে যে, গৃহস্বামী এরূপ মেহমানের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব, তবে এইরূপ চাহিয়া খাওয়াতে তাহাকে সৎকার্যে সহায়তা করা হয়।

কোন এক বুযর্গের তিনশত ষাট জন বন্ধু ছিলেন। এক-এক রাত্রিতে তিনি এক-এক বন্ধুর গৃহে রাত্রি যাপন করিতেন এবং আহার গ্রহণ করিতেন। অপর এক বুযর্গের ত্রিশজন বন্ধু ছিলেন। আবার কোন কোন বুযর্গের সাতজন করিয়া বন্ধু ছিলেন। এক-এক রজনীতে এক-এক বন্ধুর গৃহে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। এই বন্ধুগণই যেন তাঁহাদের পেশা ও উপার্জনস্বরূপ ছিলেন এবং বন্ধুগণের কারণেই ঐ বুযর্গগণ নিশ্চিন্ত মনে ইবাদতের সুযোগ লাভ করিতেন। ধর্মের বন্ধনই যে ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সূত্র, এমন স্থলে বরং বন্ধুর অনুপস্থিতিতেও তাহার খাদ্য হইতে আহার করা দুরস্ত আছে। রাসূলে মক্‌বুল (সা) হযরত বুরাইদাহ (রা) গৃহে গমন করত তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহার খাদ্য হইতে আহার করিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, হযরত বুরাইদাহ্ (রা) ইহাতে আনন্দিত হইবেন। হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসে (রা) নামক এক বুযর্গ তাঁহার মুরীদানসহ হযরত হাসান বস্‌রী (র)-এর গৃহে গমন করিতেন এবং গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতেই গৃহে যাহা পাইতেন তাহাই আহার করিতেন। হযরত হাসান বস্‌রী (র) গৃহে প্রত্যাবর্তন করত ঃ ইহা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কয়েকজন বুযর্গ হযরত সুফিয়ান সাওরী (র)–এর গৃহে গমন করতঃ তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহার খাদ্য হইতে আহার করিলেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ইহা অবগত হইয়া বলিলেন ঃ "তোমরা আমাকে পূর্ববর্তী বুযর্গগণের ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিলে। তাঁহারা এইরূপই করিতেন।"

২. কোন বন্ধু গৃহে আগমন করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত থাকে তাহাই তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিবে। উদ্যোগ-আয়োজনের বাড়াবাড়ি করিবে না। কিছু না থাকিলে ঋণ করা উচিত নয়। নিজ পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত না থাকিলে বন্ধুর

মেহমানদারী না করিয়া তাহাদের জন্য রাখিয়া দিবে। এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা) কে দাওয়াত করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "তিনটি শর্ত মানিয়া তোমার দাওয়াত গ্রহণ করিব। প্রথম, আমার জন্য বাজার হইতে কিছুই ক্রয় করিয়া আনিবে না। দ্বিতীয়, গৃহে যাবতীয় বস্তু যাহা যে স্থানে আছে আমার সম্মানার্থ তাহার কিছুই সরাইবে না। তৃতীয়, খাদ্যদ্রব্য হইতে পরিবারবর্গের সকলের পূর্ণ অংশ রাখিবে।" হযরত ফুযাইল (র) বলেন, "আয়োজনের বাড়াবাড়ির দরুনই লোকের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এই বাড়াবাড়ি উঠিয়া গেলেই পুনরায় তাহারা পরস্পর মিলিত হইতে পারে।" এক ব্যক্তি তাহার জনৈক বুযর্গ বন্ধুর আগমনে আড়ম্বরের সহিত আহারের আয়োজন করিল। বুযর্গ বলিলেন ঃ "তুমি একাকী তো এরূপ আড়ম্বরপূর্ণ খাদ্য আহার কর না, আর আমিও একাকী এরূপ আড়ম্বরপূর্ণ খাদ্য আহার করি না। সুতরাং আমরা দুইজনই যখন একত্রিত হইয়াছি তখন এরূপ আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? হয় তুমি আড়ম্বর পরিত্যাগ কর, না হয় আমি তোমার বাড়ি আসা বন্ধ করি।" হযরত সালমান (রা) বলেন যে, রাসূলে মক্‌বুল (সা) তাঁহাকে বলিয়াছেন, মেহমানদের আগমনে আহারের আয়োজনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিও না; যাহা কিছু প্রস্তুত থাকে তাহা মেহমানের সম্মুখে হাজির করিতে দ্বিধাবোধ করিও না। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) একে অন্যের সম্মুখে রুটির টুকরা ও শুষ্ক খুরমা রাখিয়া বলিতেন, "জানি না, সেই ব্যক্তিই অধিক পাপী যে উপস্থিত খাদ্য-দ্রব্যকে অকিঞ্চিতকর মনে করিয়া বন্ধুর সম্মুখে হাজির করে না-- না সেই ব্যক্তি অধিক পাপী, যে বন্ধু কর্তৃক উপস্থাপিত খাদ্য-দ্রব্যকে নগণ্য জ্ঞানে ঘৃণা করে।" হযরত ইউনুস (আ) রুটির টুকরা ও গৃহজাত শাকসব্জির তরকারি বন্ধুদের সম্মুখে স্থাপনপূর্বক বলিতেন, "খাদ্যের আয়োজনে বাড়াবাড়িকারীদের উপর আল্লাহ্ লানত না করিলে আমি বাড়াবাড়ি করিতাম।"

একদা কতিপয় বিবদমান ব্যক্তি তাহাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য হযরত যাকারিয়া (আ) কে মধ্যস্থ মানিয়া তাঁহার বাড়িতে গমন করতঃ দেখিতে পাইল যে, তিনি গৃহে উপস্থিত নাই। তাহারা তাঁহার গৃহে এক পরমা সুন্দরী মহিলা দেখিতে পাইল। ইহাতে তাঁহারা বিস্মিত হইল যে, তিনি পয়গাম্বর হইয়াও এমন পরমা সুন্দরী মহিলার সহিত আমোদ-প্রমোদ করেন! তাহারা তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি একস্থানে মজুরি খাটিতে গিয়াছেন। সেই সময় তিনি আহার করিতেছিলেন। তাহাদের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ হইল। কিন্তু তাঁহার সহিত আহার করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে সমাদর করিলেন না। কর্মশেষে বাড়ি ফিরিবার সময় পাদুকা খুলিয়া তিনি নগ্নপদে চলিতে লাগিলেন। এই তিন ব্যাপারে তাহারা আশ্চর্য বোধ করিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, "ধর্ম রক্ষার জন্য আমি সুন্দরী মহিলা বিবাহ করিয়াছি যেন আমার চক্ষু ও অন্তর অন্যত্র কোন সুন্দরী মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট না

হয়। আহারের সময় তোমাদিগকে সমাদর না করার কারণ এই, যে খাদ্য আমার সঙ্গে ছিল উহা আমার দেহের শক্তি বজায় রাখার জন্য নিতান্ত আবশ্যক ছিল। ইহা অপেক্ষা কম আহার করিলে মজুরি কার্যে আমার ত্রুটি ঘটিত; অথচ কার্যটি সুচারুরূপে সমাধা করা আমার উপর ফরয ছিল। আর নগ্ন পদে চলার কারণ এই যে, উক্তজমির স্বত্ব লইয়া মালিকদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে। সুতরাং আমি ইচ্ছা করি নাই যে, আমার জুতার সহিত উক্ত ভূমির মাটি সংযুক্ত হইয়া অন্য লোকের জমিতে যাইয়া পড়ে। এই ঘটনা হইতে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক কার্যে সততা ও সাধুতা রক্ষা করার শিষ্টাচার প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করা অপেক্ষা উত্তম।

৩.মেহমান গৃহস্বামীর উপর এমন ফরমায়েশ করিবে না যাহা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়। দুইটি জিনিসের মধ্যে কোন্‌টি পছন্দনীয়, এই কথা মেহ্‌মানকে জিজ্ঞাসা করা হইলে যাহা গৃহস্বামীর পক্ষে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য, তাহাই তাহার পছন্দ করা উচিত। কারণ রাসূলে মক্‌বুল (সা) প্রত্যেক কার্যে এইরূপ করিতেন। এক ব্যক্তি হযরত সালমান (রা) গৃহে আগমন করিলে তিনি যবের রুটির টুকরা ও কিঞ্চিত লবণ তাহার সম্মুখে হাযির করিলেন। সে ব্যক্তি বলিল, "লবণের সহিত সামান্য সা'তার (এক প্রকার শাক) হইলে ভালই হইত।" হযরত সালমান (রা) নিকট তখন টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। অগত্যা একটি বদ্‌না বন্ধক রাখিয়া ইহার বিনিময়ে সা'তার খরিদ করতঃ মেহমানের সম্মুখে হাজির করিলেন। মেহ্‌মান আহার শেষে বলিতে লাগিল ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَنَعْنَا بِمَا رَزَقْتَنَا–

"সেই আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদিগকে যাহা কিছু রিযিক দান করিয়াছেন তাহাতেই তৃপ্তি দান করিয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া হযরত সালমান (রা) বলিলেন ঃ "অল্পেই তোমার তৃপ্তি হইলে আমার বদ্‌নাটি বন্ধকে যাইত না।" কিন্তু নিশ্চিতরূপে যদি জানা থাকে যে, ফরমায়েশ করিলে গৃহস্বামীর কোন কষ্ট হইবে না; বরং তিনি সন্তুষ্টই হইবেন তবে এরূপ স্থলে ফরমায়েশ করা দুরস্ত আছে। এক সময়ে হযরত ইমাম শাফি'ঈ (র) বাগদাদে এক যা'ফরান ব্যবসায়ীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। আহারের জন্য যে যে জিনিসের ইমাম সাহেবের প্রয়োজন, যা'ফরান ব্যবসায়ী প্রত্যহ সেই জিনিসগুলির তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় বাবুর্চির নিকট দিত। একদা ইমাম সাহেব (র) উক্ত তালিকায় স্বহস্তে অপর একটি নূতন জিনিসের নাম বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। যা'ফরান ব্যবসায়ী সেই তালিকাটি স্বীয় দাসীর হাতে দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইল যে,ইহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সেই ক্রীতদাসীকে আযাদ করিয়া দিল।

৪. মেহমানের ফরমায়েশ পূর্ণ করাতে গৃহস্বামীর আন্তরিক সন্তুষ্টি থাকিলে মেহমান কি খাইতে ভালবাসে জিজ্ঞাসা করা উচিত। কারণ মেহমানকে তাহার অভিরুচি অনুযায়ী খাদ্য প্রদানে সন্তুষ্ট করার মধ্যে বড় সওয়াব রহিয়াছে। রাসূলে মক্‌বুল(সা) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভ্রাতার মনের বাসনা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হয়, তাহার আমলনামায় হাজার হাজার সওয়াব লিখিত হয়, হাজার হাজার পাপ তাহার আমলনামা হইতে মিটাইয়া দেওয়া হয়, তাহার মরতবা হাজার হাজার দরজায় উন্নত করা হয় এবং 'ফিরদাউস', 'আদন' ও 'খুল্‌দ' এই তিন বেহেশ্‌ত হইতে তাহার জন্য অংশ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়।" আহারের সময় মেহ্‌মানকে এরূপ প্রশ্ন করা মাক্‌রূহ ও মন্দ যে, 'অমুখ জিনিস আনিব কি না।' বরং যাহা কিছু প্রস্তুত আছে মেহমানের সম্মুখে উপস্থিত করিবে; মেহ্‌মান যাহা ইচ্ছা করে আহার করিবে, যাহা আহার না করে ফিরাইয়া নিবে।

দাওয়াত করতঃ আহার প্রদানের ফযীলত ঃ অনাহূতভাবে সাক্ষাত করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল মেহ্‌মান আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে দাওয়াত করিয়া আনা হয় তাহাদিগকে আহার প্রদানের প্রণালী অন্য প্রকার। বুযর্গগণ বলিয়াছেন, "অনিমন্ত্রিত মেহ্‌মানের আহার প্রদানের জন্য আয়োজনের বাড়াবাড়ি করিবে না। কিন্তু নিমন্ত্রিত মেহ্‌মানের বেলায় উদ্যোগ-আয়োজনে কোন প্রকার ত্রুটি করিবে না; সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা ও আয়োজন করিবে।" মেহমানদারীর ফযীলত খুব বেশি। আরববাসিগণ বিদেশ সফরকালে একে অন্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এইরূপ মেহ্‌মানের হক আদায় করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী মেহ্‌মানদারী করে না তাহার মধ্যে মঙ্গল নাই।" তিনি আরও বলেন ঃ "মেহমানদের জন্য আয়োজনে বাড়াবাড়ি করিও না।" কারণ এরূপ করিলে মেহ্‌মানের সহিত শত্রুতা করা হয়; "যে ব্যক্তি মেহমানের সহিত শত্রুতা পোষণ করে সে আল্লাহ্‌র সহিত শত্রুতা পোষণ করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ্‌ও তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়া থাকেন।" বিদেশী মুসাফির আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার জন্য ঋণ করিয়াও আয়োজন করা দুরস্ত আছে। কিন্তু এক বন্ধু অপর বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে আয়োজনের বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। কারণ বন্ধুর আগমনে আয়োজনের বাড়াবাড়ি করিতে করিতে বন্ধুর প্রতি ভালবাসা কমিয়া যায়। হযরত আবু রাফে' (রা) বলেন, "একদা রাসূলে মক্‌বুল (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন, অমুক ইয়াহূদীর নিকট হইতে আমার জন্য কিছু আটা কর্জ করিয়া আন, আমি উহা রজব মাসে পরিশোধ করিয়া দিব; কারণ আমার গৃহে একজন মেহ্‌মান আসিয়াছেন। ইয়াহূদী বিনাবন্ধকে ধার দিতে অস্বীকার করিল। হযরত আবু রাফে' (রা) বলেন,

আমি হুযূর (সা) -এর নিকট ইয়াহূদীর উক্তি বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন-- আল্লাহ্‌র কসম! আমি নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে বিশ্বাসী বলিয়া খ্যাত। বিনা বন্ধকে প্রদান করিলেও আমি পরিশোধ করিতাম। যাও, আমার ঐ বর্মটি বন্ধক রাখিয়া আটা আন। হযরত আবূ রাফে' (রা) বলেন-- আমি বর্মটি লইয়া গেলাম ও ইহা বন্ধক রাখিয়া আটা ধার আনিলাম।"

ইবরাহীম (আ) মেহমানের সন্ধানে গৃহ হইতে বাহির হইয়া দুই-এক মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইতেন। মেহ্‌মান না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আহার করিতেন না। তাহার এইরূপ একনিষ্ঠ মেহ্‌মানদারীর বরকতে তাঁহার পবিত্র সমাধি পার্শ্বে এখনও মেহমানদারীর রীতি প্রচলিত আছে। সেই স্থানটি কোন রাত্রিতেই মেহ্‌মানশূন্য হয় না। কোন কোন সময় সেখানে একশত দুইশত মেহ্‌মানের সমাগম হইয়া থাকে। ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য বহু-সংখ্যক গ্রাম ওয়াক্‌ফ করা রহিয়াছে।

দাওয়াত করা ও দাওয়াত গ্রহণের নিয়ম ঃ দাওয়াতের সুন্নত এই যে, পরহিযগার লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও দাওয়াত করিবে না। কেননা, আহার প্রদান করত শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং পাপী লোককে দাওয়াত করিয়া আহার প্রদান করিলে তাহার পাপকর্মে সাহায্য করা হইয়া থাকে। ফকীর-মিসকিনদিগকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবে; ধনীদিগকে দাওয়াত করিবে না। রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন ঃ "সেই ওলীমার খানা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যাহাতে গরীবদিগকে বঞ্চিত রাখিয়া ধনীদিগকে দাওয়াত করা হয়।"[১] তিনি আরও বলেন ঃ "তোমরা দাওয়াত করিতেও গুনাহ্ করিয়া থাক। এমন লোককে দাওয়াত করিয়া থাক যাহারা আসে না এবং যাহারা আসিবার তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। আত্মীয় ও নিকটবর্তী বন্ধু-বান্ধবদিগকে দাওয়াত করিতে ভূলিবে না। কারণ, ইহা সভ্যতা বহির্ভূত কার্য।" আত্মগর্বও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যিয়াফত করিবে না। সুন্নত প্রতিপালন ও গরীব-দুঃখীদিগকে তৃপ্তিদানের জন্য যিয়াফত করিবে। দাওয়াত গ্রহণ যাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া জানা যায়, তাহাকে দাওয়াত করিবে না। কারণ তাহাকে দাওয়াত করিলে কষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণে আগ্রহশীল নহে তাহাকেও দাওয়াত করিবে না। কারণ, এরূপ লোক দাওয়াতে আসিলেও তাচ্ছিল্যের সহিত আহার করিবে। ইহাতে গুনাহ্ হইবে।

দাওয়াত গ্রহণের পাঁচটি নিয়ম ঃ ১. দাওয়াত গ্রহণে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন প্রকার বিভিন্নতা দেখাইবে না; দরিদ্রের দাওয়াত উপেক্ষা করিবে না। কারণ রাসূলে মকবুল (সা) দরিদ্রের দাওয়াত গ্রহণ করিতেন। হযরত ইমাম হাসান (রা) এক গরীব

১. (বিবাহের পর বরের পক্ষ হইতে যে যিয়াফত করা হয় তাহাকে ওলীমা বলে)।

কওমের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তাহারা রুটির টুকরা ভক্ষণ করিতেছিল, তাহারা নিবেদন করিল ঃ "হে রাসূলের ফরযন্দ! আপনিও আমাদের সহিত আহারে শামিল হউন।" তিনি তৎক্ষণাৎ বাহন-পশুর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করতঃ তাহাদের সহিত আহারে বসিলেন এবং বলিলেন, "অহঙ্কারী লোকদিগকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।" আহারান্তে এই দরিদ্র লোকদের পরবর্তী দিনে তাঁহার বাড়িতে আহারের জন্য দাওয়াত করিয়া তিনি নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। ঐদিন তাহাদের জন্য নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করা হইল এবং তিনি তাহাদের সহিত একত্রে আহার করিলেন।

২. নিমন্ত্রিত ব্যক্তির যদি জানা থাকে যে, নিমন্ত্রিতকে ভোজন করাইয়া পরে লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইবে এবং যদি বুঝিতে পারে যে, সুন্নতের অনুসরণরূপে যিয়াফত হইতেছে না, দেশপ্রথা হিসাবে হইতেছে, তবে ভদ্রোচিত বাহানার সহিত এইরূপ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে, গ্রহণ করিবে না। মেহমান দাওয়াত গ্রহণ করিলে বরং ইহাকে মেয্‌বান নিজের সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া মনে করিবে এবং মেহমানের অনুগ্রহ স্বীকার করিবে। মেহ্‌মান যদি জানে যে, মেযবানের খাদ্য সন্দেহযুক্ত অথবা মজলিসের রীতিনীতি মন্দ, যেমন তথায় রেশমী ফরাস বিছানো হয়, রৌপ্য-নির্মিত ধুপদানী, দেওয়াল ও ছাদে জীব-জন্তুর ছবি, বাদ্যযন্ত্র সহকারে রাগ-রাগিনী, সং সাজানী, অশ্লীল বাক্যালাপ, পুরুষ-দর্শনে যুবতীদের আগমন ইত্যাদি ধর্ম-বিগর্হিত কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে এমন দাওয়াতে কখনও যাইবে না। আবার মেয্‌বান বিদ্‌আতী, জালিম কিংবা ফাসিক হইলে অথবা অহঙ্কার ও বাহাদুরী প্রকাশ তাহার যিয়াফতের উদ্দেশ্য হইলে তাহার দাওয়াত কবূল করিবে না। কিন্তু দাওয়াত কবূল করতঃ মেয্‌বানের বাড়িতে গিয়া এই প্রকার মন্দ কার্য দেখিতে পাইলে এবং তাহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি না থাকিলে সে স্থান হতে চলিয়া আসা ওয়াজিব।

৩. দূরের রাস্তা বলিয়া দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে না; বরং যতদূর পর্যন্ত চলার অভ্যাস আছে ততদূরের মধ্যে দাওয়াত কবূলের কষ্ট স্বীকার করিয়া লইবে। তাওরীতে নির্দেশ আছে, রোগীকে দেখিবার জন্য এক মাইল, জানাযার সহিত দুই মাইল, দাওয়াত রক্ষার্থে তিন মাইল এবং ধর্ম-বন্ধুর মুলাকাতের উদ্দেশ্যে চার মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিয়া যাইবে।

৪. রোযা রাখিয়াছ বলিয়া দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে না; বরং নির্ধারিত সময়ে দাওয়াতে উপস্থিত হইবে। দাওয়াতকারী সন্তুষ্ট থাকিলে রোযা না ভাঙ্গিয়া শুধু সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ এবং সদালাপে তাহাকে পরিতুষ্ট করিবে। এই পর্যন্ত করিলেই রোযাদারের পক্ষে দিবাভাগের দাওয়াত রক্ষা হইবে। কিন্তু আহার গ্রহণ না করিলে দাওয়াতকারী অসন্তুষ্ট হইলে নফল রোযা ভঙ্গ করতঃ পানাহার করিয়া দাওয়াতকারীকে সন্তুষ্ট

করিবে। কেননা, কোন মুসলমানের মন সন্তুষ্ট করাতে নফল রোযা অপেক্ষা অধিক সওয়াব রহিয়াছে। কেহ নফল রোযা ভাঙ্গিয়া দাওয়াতকারীকে সন্তুষ্ট করিতে অস্বীকার করিলে রাসূলে মকবুল (সা) বলিতেন, "তোমার ভাই তোমার জন্য এত আয়োজন করিয়াছে, আর তুমি বলিতেছ আমি রোযাদার!"

৫.কেবল উদর পূর্তির জন্য দাওয়াত গ্রহণ করিবে না; ইহা পশুর স্বভাব। বরং নিম্নোক্ত নিয়্যতে দাওয়াত কবূল করিবে; যথা ঃ (ক) নবী করীম (সা) সুন্নতের অনুসরণ। (খ) তিনি যে সতর্ক বাণী প্রদান করিয়াছেন উহা হইতে অব্যাহতি লাভ। কারণ, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দাওয়াত কবূল করিবে না সে আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট পাপী হইবে।" এই হাদীসের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন আলিম দাওয়াত কবূল করা ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। (গ) দাওয়াতকারী মুসলমান ভ্রাতার সম্মান রক্ষা করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "কোন মুসলমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌কেই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।" (ঘ) দাওয়াতকারী মুসলমান ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "কোন মুসলমান ভ্রাতার মন সন্তুষ্ট করিলে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা হয়।" (ঙ) দাওয়াতকারী মুসলমান ভ্রাতার সহিত সাক্ষাত করা। কারণ, কোন মুসলমানের সহিত সাক্ষাত করিলেও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ হয়। (চ) অপরকে পরনিন্দার সুযোগ প্রদান না করা। কারণ, তুমি দাওয়াতে না গেলে লোকে বলিতে পারে যে, তুমি কু-স্বভাব ও অহংকারবশত ঃ দাওয়াত রক্ষা কর নাই। দাওয়াতে যাওয়ার সময় উক্তরূপ নিয়্যত করিলে প্রত্যেক নিয়্যতের জন্য পৃথক পৃথক সওয়াব পাওয়া যায়। এই প্রকার নেক নিয়্যতের ফলে মুবাহ্ কার্যও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বুযর্গগণ স্বীয় জীবনের প্রত্যেকটি গতিবিধি এবং কর্মানুষ্ঠানকে ধর্মের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন, যেন তাঁহাদের একটি নিঃশ্বাসও বৃথা অপচয় না হয়।

দাওয়াতে হাযির হওয়ার নিয়ম ঃ (১) দাওয়াত গ্রহণ করিলে যথাসময়ে উপস্থিত হইবে; দাওয়াতকারীকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিবে না। (২) উত্তম স্থান দেখিয়া বসিতে চেষ্টা করিবে না। (৩) গৃহস্বামী যেখানে নির্দেশ করিবে সেখানেই বসিয়া পড়িবে। (৪) অন্যান্য মেহমান তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে বসাইতে চাহিলে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিবে। (৫) নারী মহলের সম্মুখে বসিবে না। (৬) যেদিক হইতে খাদ্য-দ্রব্য আনয়ন করা হয়, সেদিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিবে না। (৭) ভোজসভায় উপবেশন করতঃ পার্শ্ববর্তী মেহ্মানের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবে। (৮) শরীয়ত বিরোধী কোন কার্য হইতে দেখিলে উহার প্রতিরোধ করিবে। প্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকিলে তথা হইতে উঠিয়া যাইবে। হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন,

যিয়াফত-মজলিসে রৌপ্য-নির্মিত সুর্মাদানী দেখিলেও তথা হইতে উঠিয়া যাইবে। (৯) মেহ্মান মেযবানের বাড়িতে রাত্রিবাস করিলে মেযবান তাহাকে কিবলার দিক, পায়খানা ও প্রস্রাবখানা দেখাইয়া দিবে।

মেহ্মানের সম্মুখে খাদ্য-দ্রব্য আনয়নের নিয়ম ঃ (ক) মেহ্মানকে আহারের প্রতীক্ষায় বসাইয়া রাখিবে না, তাড়াতাড়ি করিবে। ইহা করিলে মেহ্মানকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। নিমন্ত্রিত প্রায় সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিলে, মাত্র দুই-একজন এখনও হাযির না হইয়া থাকিলে তাহাদের অপেক্ষা না করিয়া উপস্থিত মেহ্মানগণের সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখাই উত্তম। কিন্তু কোন দরিদ্র মেহ্মানের উপস্থিত হইতে যদি বিলম্ব হয় এবং তাহার অনুপস্থিতিতে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন হইয়া গেলে তাহার মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে তাহার জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। হযরত হাতেম আসম (র) বলেন ঃ "তাড়াতাড়ি করা শয়তানের কাজ; কিন্তু পাঁচটি কাজ তাড়াতাড়ি করা কর্তব্য। যথা ঃ (১) মেহমানকে আহার করান, (২) মৃতকে দাফন করা, (৩) বিবাহযোগ্য কন্যার বিবাহ দেওয়া, (৪) ঋণ পরিশোধ করা এবং (৫) পাপ হইতে তওবা করা। ওলীমার দাওয়াতে তাড়াতাড়ি করা সুন্নত।

(খ) খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ফলমূলাদি সর্বাগ্রে উপস্থিত করিবে। দস্তরখান সব্জি জাতীয় তাজা দ্রব্য হইতে শূন্য রাখিবে না। হাদীস শরীফে আছে, দস্তরখানে সব্জি জাতীয় তাজা দ্রব্য থাকিলে তথায় ফেরেশতা উপস্থিত হয়। উত্তম খাদ্য সর্বাগ্রে উপস্থিত করিবে যেন মেহ্মান ইহা আহারে পরিতৃপ্ত হয়। অতিভোজীদের অভ্যাস এই যে, মেহমানকে অধিক আহার করাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নশ্রেণীর খাদ্য দস্তরখানে সর্বাগ্রে হাযির করে। ইহা মাকরূহ। আবার সর্বপ্রকার খাদ্য দস্তরখানে একবারে উপস্থিত করাও কোন কোন লোকের অভ্যাস যেন মেহ্মানগণ যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই আহার করিতে পারে। এইরূপে সর্বপ্রকার খাদ্য একবারে দস্তরখানে আনয়ন করা হইলে অবশিষ্ট খাদ্য দস্তরখান হইতে তাড়াতাড়ি অপসারণ করিবে না; কারণ, মেহমানদের মধ্যে এমনও কেহ থাকিতে পারেন যিনি আহার করিয়া এখনও পরিতৃপ্ত হন নাই।

(গ) অতি অল্প খাদ্য দস্তরখানে স্থাপন করিবে না; কারণ ইহাতে অশিষ্টতা প্রকাশ পায়। অপরপক্ষে সীমাতিরিক্ত খাদ্যও উপস্থিত করিবে না; কারণ, ইহাতে অহংকার প্রকাশ পায়। কিন্তু মেহ্মানের সম্মুখে অতিরিক্ত খাদ্য উপস্থিত করাতে কোন দোষ নাই। হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (র) একদা হযরত সুফিয়ান সওরী (র) -এর সম্মুখে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য স্থাপন করিলেন। ইহাতে হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলিলেন, "তুমি কি অপব্যয়কে ভয় কর না?" হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (র) উত্তর দিলেন ঃ মেহমানের জন্য প্রস্তুত খাদ্য অপব্যযই হয় না।

(ঘ) প্রস্তুত খাদ্য হইতে নিজ পরিবারবর্গের অংশ অগ্রেই পৃথকভাবে উঠাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট খাদ্য মেহমানের সম্মুখে আনয়ন করিবে। তাহা হইলে তাহাদের লোলুপদৃষ্টি দস্তরখানেরপ্রতি আকৃষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে পরিবারস্থ লোকদের অংশ উঠাইয়া না রাখিলে মেহ্মানের দস্তরখান হইতে যদি কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া না আসে তবে পরিবারবর্গের কেহ না কেহ মেহ্মানকে তিরস্কার করিতে পারে। ইহাতে মেহ্মানের প্রতি অসদাচরণ করা হয়।

(ঙ) যিয়াফতের মজলিস হইতে খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া মেহমানের উচিত নহে। কিন্তু গৃহস্বামী যদি আনন্দের সহিত পূর্বাহ্নেই কিছু খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিয়া থাকেন কিংবা মেহ্মান যদি জানিতে পারেন যে, তদ্রূপ কার্যে গৃহস্বামী অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইবেন তবে খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া নেওয়াতে কোন দোষ নাই। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নিজের অংশের অধিক লইয়া সহভোজীদের প্রাপ্য অংশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা না হয়। অধিক লইয়া গেলে অন্যায় হইবে। আবার গৃহস্বামীর অসুন্তুষ্টিতে খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া যাওয়াও নিষিদ্ধ। গৃহস্বামীর অসুন্তুষ্টিতে লইয়া যাওয়া আর চুরি করাতে কোনই প্রভেদ নাই। সহভোজীরা সন্তোষের সহিত ত্যাগ না করিয়া চক্ষু লজ্জায় যাহা পরিত্যাগ করে, তাহাও বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ।

যিয়াফত মজলিস ত্যাগ করিবার নিয়ম ঃ আহার শেষে মেহ্মান গৃহস্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক বাহির হইবে। গৃহস্বামী মেহ্মানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দ্বারদেশ পর্যন্ত আসিবে। কারণ,রাসূলে মক্বুল (সা) এইরূপই করিতেন। মেহ্মানের সহিত সদালাপ করা ও প্রফুল্ল বদনে থাকা মেযবানের কর্তব্য। কিন্তু মেহ্মান মেযবানের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাইলে তাহা ক্ষমা করিবে এবং সৎস্বভাবের সহিত গোপন রাখিবে। কারণ সৎস্বভাব সান্নিধ্য হইতে উৎকৃষ্ট। কথিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি কতিপয় লোককে দাওয়াত করিয়াছিল। গৃহস্বামীর পুত্র পিতার অজ্ঞাতসারে হযরত জুনাইদ (র)-কেও দাওয়াত করিল। তিনি তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে বারণ করিল। তিনি ফিরিয়া গেলেন। গৃহস্বামীর পুত্র তাঁহাকে আবার ডাকিয়া আনিতে গেল' তিনিও আগমন করিলেন। কিন্তু এবারও গৃহস্বামী তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি আবার ফিরিয়া গেলেন। নিমন্ত্রণকারী যুবকটিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি এইরূপ চারিবার আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহার পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চারিবারই ফিরিয়া গিয়াছিলেন; অথচ এইরূপ নিমন্ত্রণের তিনি মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এইরূপ আহ্বান ও প্রত্যাখ্যানকে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতেই মনে করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবাহ্

পানাহারের ন্যায় বিবাহও ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্য যেমন মানব দেহের স্থিতির আবশ্যক এবং এই স্থিতি পানাহার ব্যতীত সম্ভব নহে তদ্রূপ মানব বংশের স্থায়িত্বও নিতান্ত আবশ্যক এবং এই স্থায়িত্ব বিবাহ ব্যতীত অসম্ভব। সুতরাং বিবাহ মানব জাতির অস্তিত্বের মূল কারণ এবং পানাহার এই অস্তিত্ব রক্ষার হেতু। এই জন্যই আল্লাহ্ বিবাহকে মুবাহ্ (শরীয়তে সিদ্ধ) করিয়াছেন। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে: বরং কাম-প্রবৃত্তিকে বিবাহের প্রেরণা প্রদানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে কাম-প্রবৃত্তি স্ত্রী-পুরুষকে উত্তেজিত করিয়া পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং এই উপায়ে ধর্ম-পথের পথিক জন্মগ্রহণ করে ও ধর্ম-পথে চলে। কেননা আল্লাহ্ যাবতীয় সৃষ্টকে ধর্মকর্মের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ-

আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি।

মানুষ যতই বৃদ্ধি পায় আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূলে মক্বুল (সা)-এর উম্মত ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কারণেই রাসূলে মকবুল (সা) বলেন ঃ "বিবাহ কর যেন তোমরা সংখ্যায় অধিক হইতে পার। তাহা হইলে কিয়ামত দিবস তোমাদের সংখ্যাধিক্য হেতু অন্যান্য নবীর উম্মতের উপর আমি গর্ব করিব। এমনকি, যে শিশু মাতৃউদর হইতে গর্ভভ্রষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় তাহার কারণেও আমি গর্ব করিব।" অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে বংশবৃদ্ধির চেষ্টা করে সে বড় সওয়াব পাইবে। এইজন্যই পিতার হক অধিক এবং উস্তাদের হক তদপেক্ষা অধিক। কেননা, পিতা কেবল জন্ম দিয়া থাকেন এবং উস্তাদ ধর্ম-পথ প্রদর্শন করেন। এই কারণেই কতক আলিম বিবাহকে নফল ইবাদতে মশগুল থাকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।

বিবাহকে যখন ধর্মপথের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তখন ইহার নিয়মাবলী জানিয়া লওয়া আবশ্যক। নিম্নলিখিত তিনটি অনুচ্ছেদে উহার বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে। (১) বিবাহের উপকারিতা ও আপদসমূহ, (২) বিবাহ বন্ধনের নিয়মাবলী এবং (৩) দাম্পত্য জীবন যাপনের প্রণালী।

প্রথম অনুচ্ছেদ

বিবাহের উপকারিতা ও আপদসমূহ

বিবাহের উপকারিতার কারণেই উহাতে সওয়াব আছে এবং উহাতে পাঁচ প্রকার উপকারিতা আছে।

প্রথম উপকার ঃ সন্তান লাভ করা। সন্তানের কারণে আবার চারি প্রকার সওয়াব পাওয়া যায়।

প্রথম সওয়াব ঃ মানবের জন্ম ও মানব বংশের স্থায়িত্ব যাহা আল্লাহ্‌র প্রিয় ও বাঞ্ছিত তাহাতে যত্নবান থাকা। যে ব্যক্তি সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে ব্যক্তি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবে যে, মানববংশের বৃদ্ধিসাধন এবং ইহার স্থায়িত্বের কার্যে যত্নবান থাকা আল্লাহর প্রিয়। প্রভু যখন স্বীয় ভৃত্যকে কৃষির উপযোগী জমি, বীজ, হালের বলদ ও কৃষিকার্যের যাবতীয় যন্ত্রপাতি প্রদান করিলেন এবং তাহাকে কৃষিকার্যে লিপ্ত রাখিবার জন্য তাহার উপর একজন দণ্ডধারী নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন তখন প্রভু মুখে না বলিলেও ভৃত্যের বুদ্ধি থাকিলে সে বুঝিতে পারিবে যে, তাহার দ্বারা ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন ও বৃক্ষ উৎপাদন করানই তাহার উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ বাচ্চাদানী ও পুরুষাঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষের পৃষ্ঠে ও নারীর বক্ষে সন্তানের বীজ উৎপন্ন করিয়াছেন এবং কামভাবকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রেরণাদায়করূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং এ সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কোন বুদ্ধিমানের নিকটই অজ্ঞাত নহে। কোন ব্যক্তি বীজ অর্থাৎ শুক্র অনর্থক নষ্ট করিলে এবং প্রেরণাদাতা কামভাবকে অন্য উপায়ে পরিহার করিলে সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতে বিমুখ রহিল। এইজন্যই সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও পূর্বকালীন বুযর্গগণ বিবাহ ব্যতীত পরলোকগমন করাকে ঘৃণা করিতেন। এমনকি হযরত মু'আয (রা) -এর দুই পত্নী প্লেগ রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন এবং অবশেষে তিনিও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া বলিলেন ঃ "আমি মরিব ত মরিবই; তোমারা আমাকে আবার বিবাহ করাও। স্ত্রীবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাকে আমি পছন্দ করি না।"

দ্বিতীয় সওয়াব ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর অনুসরণ করা। বিবাহ করত তাঁহার উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে যেন তিনি কিয়ামত দিবস স্বীয় উম্মতের সংখ্যাধিক্য হেতু গর্ব করিতে পারেন। এই জন্যই তিনি বন্ধ্যা নারী বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ বন্ধ্যা নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা নাই। তিনি আরও বলেন ঃ "খেজুরের চাটাই ঘরে বিছাইয়া রাখা বন্ধ্যা স্ত্রীলোক হইতে উৎকৃষ্ট।" অন্যত্র তিনি বলেন ঃ "সন্তান প্রসবিনী কুৎসিত নারী সুন্দরী বন্ধ্যা নারী হইতে

উৎকৃষ্ট।" এই সমস্ত হাদীস হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহ কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নহে; কাম -প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কুৎসিত নারী অপেক্ষা সুন্দরী রমণীই উৎকৃষ্ট।

তৃতীয় সওয়াব ঃ সন্তানের দু'আ লাভ হয়। হাদীস শরীফে আছে, "যে সমস্ত নেক কার্যের সওয়াব মৃত্যুর পরেও বন্ধ হয় না, তন্মধ্যে সন্তানও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাহাদের জন্য সন্তানের দু'আ সর্বদা চলিতে থাকে এবং উহার সওয়াব তাহারা পাইতে থাকে। হাদীস শরীফে আছে, "দু'আ নূরানী পাত্রে করিয়া মৃতের সম্মুখে স্থাপন করা হয়। এবং উহাতে তাহারা শান্তি পাইয়া থাকে।"

চতুর্থ সওয়াব ঃ মাতাপিতার জীবদ্দশায় শিশু সন্তানের মৃত্যু হইলে তাহারা মর্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। এ সমস্ত শিশু সন্তান কিয়ামত দিবসে মাতাপিতার জন্য সুপারিশ করিবে। রাসূলে মকবুল (সা) বলেন ঃ "শিশু সন্তানদিগকে যখন বেহেশতে প্রবেশের জন্য বলা হইবে তখন তাহারা গোঁ ধরিয়া বলিবে, আমাদের পিতামাতাকে না লইয়া আমরা কখনই প্রবেশ করিব না। রাসূলে মকবুল (সা) এক ব্যক্তির পরিধানের বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিলেন ঃ যেরূপে আমি তোমাকে টানিতেছি তদ্রূপ শিশু সন্তানও স্বীয় মাতাপিতাকে বেহেশতের দিকে টানিতে থাকিবে।" হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, "শিশুগণ বেহেশতের দ্বারদেশে সমবেত হইয়া অকস্মাৎ চিৎকার ও রোদন করিতে আরম্ভ করিবে। এবং নিজ নিজ মাতাপিতার অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। অবশেষে মাতাপিতাদিগকে সন্তানের নিকট যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হইবে এবং সন্তানদিগকেও তাহাদের মাতাপিতাকে বেহেশতে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করা হইবে।" এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। এক বুযর্গ বিবাহ করিতে আপত্তি করিতেছিলেন। এক রজনীতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, কিয়ামত উপস্থিত হইয়াছে এবং মানবকুল পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। একদল শিশু স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে তাহাদিগকে পানি পান করাইতেছে। উক্ত বুযর্গও ঐ শিশুদের নিকট পানি চাহিলেন। কিন্তু তাহাদের কেহই তাঁহাকে পানি দিল না এবং বলিল, আমাদের মধ্যে কেহই তোমার সন্তান নহি। উক্ত বুযর্গ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া অবিলম্বে বিবাহ করেন।

দ্বিতীয় উপকার ঃ বিবাহের সাহায্যে মানব স্বীয় ধর্মকে দুর্গের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত রাখে এবং শয়তানের প্রধান অস্ত্র কাম-প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারে। এই জন্যেই রাসূলে মকবুল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে সে নিজের অর্ধেক ধর্মকে দুর্গের মধ্যে রক্ষা করিতে পারিয়াছে।" যে ব্যক্তি বিবাহ করে না সে নিজের অঙ্গ বিশেষকে অপকর্ম হইতে রক্ষা করিতে পারিলেও অধিকাংশ সময় স্বীয় চক্ষুকে কুদৃষ্টি হইতে এবং হৃদয়কে কুচিন্তা হইতে রক্ষা করিতে পারে না।" সন্তানলাভের

উদ্দেশ্যে বিবাহ করা উচিত; কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। কারণ যে কার্য প্রভুর কাম্য ও প্রিয়, তাহা যথাযথ সম্পন্ন করিলেই প্রভুর আদেশ পালন করা হয়, প্রভূ-নিযুক্ত দণ্ডধারীকে পরিহার করিলে প্রভুর আদেশ পালন করা হয় না। আল্লাহ্ কাম-প্রবৃত্তিকে দণ্ডধারী প্রেরণাদায়করূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, নারী-পুরুষকে সন্তান প্রজননের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিবে। এতদ্ব্যতীত কাম-প্রবৃত্তি সৃষ্টির মধ্যে আরও গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। ইহা এই যে, তাহাতে একপ্রবল সুখাস্বাদ রহিয়াছে যাহা পারলৌকিক সুখাস্বাদের নমুনাস্বরূপ। অনুরূপভাবে অগ্নিকে পরকালের কষ্ট ও শাস্তির নমুনাস্বরূপ সৃষ্ট করা হইয়াছে। অবশ্য স্ত্রীসঙ্গমের সুখাস্বাদ ও পার্থিব অগ্নির যাতনা পরকালের সুখাস্বাদ ও যাতনার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে তাঁহার নিকট বহু উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। একই জিনিসে বহু উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে পারে। কিন্তু সে সমস্ত গূঢ় রহস্যের বিষয় কেবল হক্কানী আলিম ও বুযর্গগণের নিকটই প্রকাশ পাইয়া থাকে। রাসূলে মক্বুল (সা) বলেন ঃ "প্রত্যেক স্ত্রীলোকের সহিত শয়তান আছে। কাহারও দৃষ্টিতে কোন স্ত্রীলোক লোভনীয় বলিয়া বোধ হইলে নিজ গৃহে গমনপূর্বক স্বীয় স্ত্রীর সহিত সহবাস করা উচিত। এ বিষয়ে সমস্ত নারী সমান।"

তৃতীয় উপকার ঃ বিবাহের কারণে স্ত্রীর সহিত অনুরাগ জন্মে। তাহার নিকট বসিয়া রসালাপ করিলে হৃদয়ে আনন্দ আসে। এই আনন্দের ফলে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সতেজ হয়। সর্বদা ইবাদতে মানুষ বিষণ্ন ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। স্ত্রীর সহিত আমোদে ইবাদতের শক্তি পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ "সুখ-শান্তি ও বিশ্রাম ভোগ হৃদয় হইতে অকস্মাৎ ছিনাইয়া লইও না। ইহাতে হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।" রাসূলে মক্বুল (সা)-এর অন্তদৃষ্টিতে সময় সময় এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আসিয়া পড়িত যাহার গুরুভার বহন করা তাঁহার কোমল দেহের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা) দেহের উপর স্বীয় পবিত্র হস্ত স্থাপনপূর্বক বলিতেন ঃ

كَلِّمِيْنِىْ يَا عَائِشَةُ–

'হে আয়েশা! আমার সহিত কথা বল।'

ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আধ্যাত্মিক কার্যের গুরুভার বহনে যখন সময় সময় তাঁহার দৈহিক শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িত তখন প্রিয়জনের সহিত বাক্যালাপে সেই লুপ্ত শক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়া লওয়া, যেন ওহীর গুরুভার বহনের ক্ষমতা পুনরায় লাভ করিতে পারেন। আধ্যাত্মিক কার্য শেষ হওয়ার পর যখন তিনি এ জগতে আসিতেন তখন পুনরায় আধ্যাত্মিক কার্যের প্রেরণা জন্মিবামাত্র হযরত বিলাল

(রা)-কে বলিতেন– اَرِحْنَا يَا بِلَالُ "হে বিলাল! (আযান দিয়া) আমাদিগকে শান্তি প্রদান কর।' তৎপর নামাযের দিকে মনোনিবেশ করিতেন। আবার কখনও কখনও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করত ঃ তিনি মস্তিষ্কে শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইতেন। এই জন্যই তিনি বলেন ঃ

حُبِّبَ اِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَثَ اَلطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَقُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ–

তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার নিকট প্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে– "সুগন্ধি দ্রব্য, স্ত্রীলোক ও নামাযের মধ্যে আমার চক্ষুর শান্তি।

নামাযকে এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, সুগন্ধি দ্রব্য ও স্ত্রীলোক দৈহিক সুখভোগের জন্য। এই সুখভোগের ফলে নামাযের শক্তি পুনর্জীবিত হয় এবং অবশেষে নামায পাঠে নয়নের জ্যোতি লাভ হয়। এই জন্যই রাসূলে মক্বুল (সা) পার্থিব ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিতে নিষেধ করিতেন। হযরত উমর (রা) নিবেদন করিলেন ঃ "আল্লাহ্র রাসুল! দুনিয়া বর্জন করতঃ আমরা কোন্ বস্তু অবলম্বন করিব?" উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ

لِيَتَّخِذَ اَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَّقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً مُّؤْمِنَةً–

তোমাদের গ্রহণ করা উচিত-- যিক্রকারী রসনা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী।

এই স্থলে তিনি স্ত্রীকে যিক্র ও শোকরের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

চতুর্থ উপকার ঃ গৃহকর্মে স্ত্রীর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ। খাদ্য-দ্রব্য পাক করা, বাসনপত্র ধৌত করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া প্রভৃতি কর্ম স্ত্রী সম্পন্ন করিয়া থাকে। পুরুষ এই সকল কার্যে ব্যস্ত থাকিলে জ্ঞানার্জন, ধর্মকর্ম সম্পাদন ও ইবাদত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইত। এই কারণেই স্ত্রী ধর্ম-পথে স্বামীর বন্ধু ও সাহায্যকারিণী হইয়া থাকে। এই জন্যই হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (র) বলেন ঃ "ধর্মপরায়ণা স্ত্রী পার্থিব বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং পারলৌকিক উপকরণসমূহের অন্যতম অর্থাৎ স্ত্রী গৃহকর্মে সাহায্য করত ঃ তোমাকে নিরুদ্বিগ্ন ও নির্লিপ্ত রাখে, যেন তুমি পারলৌকিক কার্যে একাগ্রচিত্তে মগ্ন থাকিতে পার।" হযরত উমর (রা) বলেন ঃ "ঈমানের পর ধর্মপরায়ণা স্ত্রী সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত।"

পঞ্চম উপকার ঃ স্ত্রীর প্রকৃতি ও চরিত্রগত অভ্যাসের প্রতি ধৈর্য অবলম্বন করা, তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা এবং তাহাকে ধর্মপথে স্থির রাখা অতি কষ্টকর।

এই কষ্ট উৎকৃষ্ট ইবাদতে গণ্য। হাদীস শরীফে আছে ঃ স্ত্রীকে জীবিকা প্রদান করা দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বুযর্গগণ বলেন ঃ "পরিবার -পরিজনের জন্য বৈধভাবে উপার্জন করা আব্‌দালগণের কাজ।" হযরত ইবনে মুবারক (র) কয়েকজন বুযর্গের সহিত জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ জিহাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য আছে কি? বুযর্গগণ উত্তরে বলিলেন ঃ জিহাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন কার্য আছে বলিয়া আমরা জানি না। হযরত ইবনে মুবারক (র) বলিলেন ঃ "জিহাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য আছে, আমি জানি। পরিবার -পরিজনবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি তাহাদিগকে সৌজন্য ও কল্যাণের সহিত লালন-পালন করে এবং রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সন্তানদিগকে নগ্নদেহে দেখিলে তাহাদের দেহ আবৃত করিয়া দেয় তবে তাহার এই কার্য জিহাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে।" হযরত বিশরে হাফী (র) বলেন ঃ "ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)-এর তিনটি বিশেষ গুণ আছে যাহা আমার মধ্যে নাই। তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি নিজের জন্য ও তদীয় পরিবার-পরিজনের নিমিত্ত হালাল জীবিকা উপার্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি কেবল আমার নিজের জন্য উপার্জন করিয়া থাকি।" হাদীস শরীফে আছে ঃ "সমস্ত গুনাহর মধ্যে এমন একটি গুনাহ্ আছে একমাত্র পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের কষ্টে যাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।"

একটি কাহিনী ঃ এক বুযর্গের পত্নী বিয়োগ ঘটে। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য লোকেরা তাহাকে অনুরোধ করে। কিন্তু বিবাহে তাঁহার আগ্রহ ছিল না। এবং তিনি বলিতেন ঃ একাকী থাকিলে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন ঃ আকাশের দরজা উন্মুক্ত হইয়াছে এবং একদল পুরুষ অগ্রপশ্চাতে বহির্গত হইয়া আকাশের দিকে যাইতেছেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট আসিলে একজন বলিলেন ঃ এই লোকটিই কি সেই হতভাগ্য ব্যক্তি? দ্বিতীয় জন বলিলেন ঃ হ্যাঁ। তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন ঃ এই লোকটিই কি সেই হতভাগ্য ব্যক্তি? চতুর্থ ব্যক্তি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, সে-ই বটে। সেই বুযর্গ তাঁহাদের প্রতাপে ভীত হইয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না। তাঁহাদের সকলের পশ্চাতে এক বালক ছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাঁহারা হতভাগ্য কাহাকে বলিলেন? বালকটি উত্তর দিল ঃ তোমাকেই ত বলিয়াছেন। কারণ, ইতিপূর্বে তোমার কার্যাবলী মুজাহিদগণের কার্যাবলীর সহিত আসমানে নীত হইত। কিন্তু জানি না, তোমার কোন্ ত্রুটির ফলে এক সপ্তাহ যাবত তোমাকে মুজাহিদ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। সেই বুযর্গ যেন পুনরায় মুজাহিদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন এই নিয়্যতে জাগ্রত হইয়াই দ্বিতীয় বিবাহ করিলেন। উপরিউক্ত উপকারলাভের উদ্দেশ্যেই বিবাহের বাসনা জাগ্রত হওয়া উচিত।

বিবাহের অপকার ঃ বিবাহে তিনটি অপকারের আশঙ্কা রহিয়াছে। প্রথম ঃ বিবাহের ফলে পরিবারবর্গের জন্য হালাল জীবিকা অর্জন সম্ভব হইয়া উঠিবে না;

বিশেষত এ যুগে ইহা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহের জন্য হয়ত সন্দেহজনক, এমনকি হারাম মালও অর্জন করিতে হইবে। পরিশেষে ইহাই তাহার স্বীয় ধর্ম-জীবনের ধ্বংস সাধন ও তাহার পরিবার-পরিজনের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আর কোন নেক কার্যই এই ধ্বংস ও বিনাশের ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হইবে না। হাদীস শরীফে আছে ঃ "এক ব্যক্তির নেক কার্য পরিমাণে পাহাড় সম হইবে। অথচ তাহাকে যখন দাঁড়িপাল্লার সম্মুখে আনিয়া প্রশ্ন করা হইবে, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের খাওয়া পরা কিভাবে প্রদান করিয়াছ? তখন সে উত্তর দিতে পারিবে না, বিপদে পড়িবে, তাহার সমস্ত নেক কাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। তারপর গায়েবী আওয়াজ হইবে ঃ "এই ব্যক্তির সমস্ত নেক কাজ তাহার পরিবার-পরিজন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এখন সে বিপদে পড়িয়াছে।" হাদীস শরীফে এইরূপ বর্ণনা আছে ঃ "কিয়ামতের দিন সকল কিছুর আগে মানুষের স্বীয় পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিবে। পরিবার-পরিজন বলিবে, "ইয়া আল্লাহ্! আমাদিগকে এই ব্যক্তি হারাম জিনিস খাওয়াইয়াছে, কিন্তু আমরা জানিতাম না। আমাদিগকে তাহার যে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল, তাহা শিক্ষা দেয় নাই, ফলে আমরা ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞ ও অন্ধ ছিলাম।" এ কারণেই যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হালাল দ্রব্য পায় নাই বা হালাল দ্রব্য কামাই করে না, তাহার বিবাহ করা উচিত নয়। কিন্তু সে যদি স্থির নিশ্চিত হয় যে, বিবাহ না করিলে ব্যভিচারের (জিনার) মহাপাপে জড়িত হইয়া পড়িবে, তবে তাহাকে অবশ্যই বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহের ফলে সন্তান ও পরিবার বাড়িয়া গেলে তাহাদের প্রতি কর্তব্যাদি ঠিকমত সম্পাদন করা সম্ভব হয় না, কখনও কখনও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের রুষ্ট ব্যবহার হাসিমুখে সহ্য করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি সাধ্যমত তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য নিয়মমাফিক পরিশ্রম করিয়া যায়, তাহার জন্য বিবাহ করায় বিপদ নাই। অবশ্য এইভাবে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলা সহজ কাজ নহে।

দ্বিতীয় ঃ মানুষ কখনো কখনো ধৈর্য হারাইয়া ফেলে এবং পরিবার-পরিজনের উপর অত্যাচার করে, যার ফলে সে পাপে পতিত হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

যে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজন ফেলিয়া পালাইয়া যায়, সে পলাতক দাসের মত অপরাধী। ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহার নামায-রোযা কিছুই আল্লাহর নিকট কবূল হয় না।

মানুষ মাত্রেরই জীবন আছে, সেই জীবনের অভাব দূর না করিয়া অন্যের জীবনের ভার লওয়া অনুচিত। কেন বিবাহ করিতেছেন না—হযরত বিশরে হাফী (র)-কে এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

"আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ- وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

স্ত্রীর প্রতি পুরুষের যেসব সদ্ব্যবহার ওয়াজিব, পুরুষের প্রতিও স্ত্রীর সেসব সদ্ব্যবহার ওয়াজিব।

আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ শুনিয়া আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি।" হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) বলিয়াছেন, "আমি বিবাহ করিব কেন? আমার বিবাহেরও কোন প্রয়োজন নাই, স্ত্রীর হক আদায় করারও কোন প্রয়োজন নাই।"

তৃতীয় ঃ মানুষ পরিবার-পরিজনের খাওয়া-পরার চিন্তায় ডুবিয়া যায় এবং পরকাল ও আল্লাহ্র চিন্তা ভুলিয়া যায়। যাহা আল্লাহ্র ইবাদত ও আল্লাহ্র স্মরণ হইতে মানুষকে সরাইয়া রাখে তাহা মানুষের ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ –

হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র যিক্র হইতে দূরে সরাইয়া না রাখে।

বিবাহের পরও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকিতে পারিয়াছেন, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের কথা তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয় নাই। কিন্তু যদি কোন মানুষ বুঝিতে পারে যে, বিবাহ করিলে সে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকিতে পারিবে না; বরং বিবাহ না করিলেই আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকিতে পারিবে- হারাম কাজ হইতেও বিরত থাকিতে পারিবে, তবে তাহার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। বিবাহ না করিলে যাহার জিনায় জড়াইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে তাহার পক্ষে কিন্তু বিবাহ করাই উত্তম। অপরদিকে যে মানুষের হালাল রুযী অর্জনের ক্ষমতা আছে, যে নিজের উত্তম স্বভাব প্রকৃতি, আদব-কায়দা, বিনয়, দয়া, প্রভৃতি গুণ অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহার আরও বিশ্বাস আছে যে, বিবাহ করিলে সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকর করার সুযোগ পাইবে তাহার জন্য বিবাহ করা অতিশয় উত্তম কাজ। -اَللّٰهُ اَعْلَمُ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বিবাহকার্য ও উহার পদ্ধতি

দুলহা এবং দুলহিন (বর ও কনে)-এই উভয় পক্ষের বিবাহ কার্যে কয়েকটি অবশ্য করণীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা কর্তব্য। বিবাহে যে সমস্ত শর্ত পালন করিতে হয় এবং কন্যার যেসব গুণ আগে ভাগে যাচাই করিয়া দেখা উচিত, নিচে তাহা বর্ণনা করা হইল।

বিবাহ কার্যের শর্ত পাঁচটি ঃ প্রথম শর্ত ঃ ওলী বা অভিভাবক। নাবালক বর ও নাবালিকা কন্যার বিবাহ ওলী ছাড়া জায়েব হইবে না। ওলী না থাকিলে দেশের সুলতান বা তাঁহার প্রতিনিধি ওলীর কাজ করিবে। **দ্বিতীয় শর্ত ঃ** সম্মতি অর্থাৎ কনের সম্মতি গ্রহণ। কিন্তু নাবালিকা কন্যাকে তাহার পিতা বা পিতামহ বিবাহ দিলে তাহার সম্মতি শর্ত নহে। তথাপি বিবাহ সম্বন্ধে তাহাকে খবর দেওয়া উত্তম। খবর পাইয়া সে নীরব থাকিলেই যথেষ্ট। **তৃতীয় শর্ত ঃ** ন্যূনপক্ষে দুইজন ন্যায় পরায়ণ ও ধার্মিক সাক্ষীর বিবাহ মজলিসে উপস্থিতি। কিন্তু শুধু দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিকেই যথেষ্ট মনে না করিয়া বরং বিবাহ মজলিসে কতিপয় মুত্তাকী ও পরহিযগার ব্যক্তির সমাবেশ করাই সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু দুইজন পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইলে এবং সাক্ষীদ্বয় পাপাচারী (ফাসিক) কিনা, ইহা -নারী-পুরুষ সকলেরই অজ্ঞাত থাকিলেও বিবাহ দুরস্ত হইবে। **চতুর্থ শর্ত ঃ** ইজাব ও কবূল অর্থাৎ বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মতিসূচক উক্তি। বিবাহ শব্দটি যেমন স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা হয় তদ্রূপ বর ও কনের পক্ষ হইতে তাহাদের ওলী বা উকিলকে বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মতিসূচক উক্তিও স্পষ্টভাবে বলিতে হইবে। এই গুলি মাতৃভাষায় বলা যাইতে পারে। সুন্নত তরীকা এই বিবাহের খুতবার পর ওলী বলিবেন, "বিস্মিল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহ্, অমুক স্ত্রীলোকটিকে এত টাকা মাহরানায় তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।" তৎপর বর বলিবে, "বিস্মিল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহ্, এই বিবাহ আমি এত টাকা মাহরানায় কবূল করিলাম।"

বিবাহের পূর্বে কনে দেখিয়া লওয়া ভাল। কারণ, পূর্বে দেখিয়া পছন্দ করার পর বিবাহ হইলে দাম্পত্য জীবনে ভালবাসা জন্মিবার খুব আশা করা যায়। সন্তানলাভ এবং মন ও চক্ষুকে মন্দ কার্য হইতে বাঁচাইয়া রখিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিবে; কেবল কামভাব চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ করিবে না। **পঞ্চম শর্ত ঃ** স্ত্রীলোকটি এমন অবস্থায় হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাহাকে বিবাহ করা বৈধ হয়।

প্রায় বিশ প্রকার স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম (১) অন্যের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায়। (২) পূর্ব স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর ইদ্দত পালনাবস্থায়। (৩) ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক অন্য ধর্ম অবলম্বনের অবস্থায়। (৪) মূর্তিপূজক মহিলা। (৫) যিন্দীক অর্থাৎ পরকাল, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি যাহার ঈমান নাই। (৬) যে রমণী শরীয়তবিরুদ্ধ কাজকে ভাল মনে করে অর্থাৎ যে পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে ও নামায না পড়াকে বৈধমনে করে এবং বলে- ইহাই আমার জন্য ঠিক ও পরকালে তজ্জন্য কোন শাস্তি হইবে না। (৭) খৃষ্টান বা ইহুদী নারী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নবূওত লাভের পর খৃষ্টান বা য়াহুদী হইয়াছে এমন পিতামাতার ঘরে যে নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (৮) স্বাধীন নারীকে মাহর প্রদানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এমন ক্রীতাদাসীকে বিবাহ করা হারাম যাহাকে বিবাহ না করিলে তৎসঙ্গে

ব্যভিচারের কোন আশঙ্কা নাই। (৯) মনিবের পক্ষে নিজের ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা হারাম; উক্ত দাসীর সে একক মালিক হউক বা অপরের সহিত অংশবিশেষের মালিক হউক উভয় অবস্থায়ই নিজ দাসীকে বিবাহ করা হারাম। (১০) নিকট আত্মীয়তার কারণে যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য হারাম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; যথা-মা, নানী, কন্যা, ইত্যাদি। (১১) স্তন্য-দুগ্ধ পানজনিত কারণে যে সকল স্ত্রীলোক পানকারীর পক্ষে হারাম হইয়াছে। যেমন ঃ দুধ মা, দুধ ভগ্নী। (১২) যে স্ত্রীলোকের কন্যা, মা, দাদীকে পূর্বে বিবাহ করতঃ সহবাস করিয়াছে অথবা যে স্ত্রীলোক একবার স্বীয় পুত্র বা পিতার বিবাহাধীনে ছিল। (১৩) চারিজন স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে তদুপরি অপর একজনকে বিবাহ করতঃ সংখ্যায় পাঁচজন পূর্ণ করা হারাম। (১৪) যে নারীর বোন, ফুফু বা খালাকে পূর্বে বিবাহ করা হইয়াছে তাহাদের সহিত সেই নারীকে বিবাহ-বন্ধনে একত্র করা হারাম। কারণ দুই বোন, ফুফু, ভাতিজী এবং খালা, ভগ্নীকন্যাকে একত্রে বিবাহাধীনে রাখা দুরস্ত নহে। (১৫) দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি এমন একটি আত্মীয়তা থাকে যে, তাহাদের একজনকে পুরুষ ধরিয়া লইলে তাহাদের উভয়ের বিবাহ হারাম হয় তবে তদ্রূপ দুইজন স্ত্রীলোককে বিবাহ বন্ধনে একত্র করা দুরস্ত নহে। (১৬) যে স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়া হইয়াছে বা (১৭) যে বিবাহিতা ক্রীতদাসীকে তিনবার ক্রয়-বিক্রয় করা হইয়াছে অন্য পুরুষ তাহাকে বিবাহ করত ঃ সহবাসের পর তালাক না দেয়া পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ দুরস্ত নহে। (১৮) স্বামী স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার ফলে কাযীর নির্দেশানুযায়ী একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করত বিবাহ-বিচ্ছেদ করিলে এই স্ত্রী পুনরায় পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল নহে। (১৯) পুরুষ নারীর মুহরিম হইলে অথবা পুরুষ এবং স্ত্রীলোক হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ দুরস্ত নহে। (২০) ইয়াতীম নাবালিকাকে বিবাহ করা সঙ্গত নহে; পরিণত বয়স্ক হইলে দুরস্ত আছে।

পাত্রীর গুণসমূহ ঃ বিবাহের পূর্বে পাত্রীর আটটি গুণ দেখিয়া লওয়া সুন্নত।

১. ধর্মপরায়ণতা ঃ এই গুণই সর্বপ্রধান। কারণ, স্ত্রী যদি ধর্মপরায়ণা না হয় এবং স্বামীর ধন-সম্পত্তিতে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাহাকে দুর্ভাবনাগ্রস্ত থাকিতে হইবে। স্ত্রী স্বীয় সতীত্ব রক্ষায় বিশ্বাসঘাতকতা করিলে স্বামী নীরব থাকিলে তাহার সম্মানের হানি হয় এবং ধর্ম-নাশ ঘটে; সমাজে লজ্জিত ও দুর্নামের ভাগী হইতে হয়। আবার নীরব না থাকিলে জীবন বিষময় হইয়া উঠে এবং তালাক দিলে হয়ত স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগের দরুন দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয়। সুন্দরী স্ত্রী অসতী হইলে ভীষণ বিপদ। অসতী স্ত্রীর প্রতি মন অতি নিবিষ্ট না থাকিলে তাহাকে তালাক দেওয়াই উত্তম। এক ব্যক্তি স্বীয় অসতীত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করিলে

তিনি বলিলেন ঃ তাহাকে তালাক দাও। সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ হুযূর, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি। হুযূর বলিলেন ঃ তবে তালাক দিও না। তালাক দিলে পরে বিপদে পড়িবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রূপ ও অর্থের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করে সে উভয়টি হইতেই বঞ্চিত থাকিবে এবং ধর্মের জন্য বিবাহ করিলে তাহার উক্ত উভয় উদ্দেশ্যই সফল হইবে।

২. সৎস্বভাব ঃ রুক্ষ স্বভাবের নারী অকৃতজ্ঞ ও ঝগড়াটে হইয়া থাকে এবং স্বামীর উপর অন্যায় কর্তৃত্ব চালায়। এমন স্ত্রীর সহিত সংসার যাত্রা নির্বাহ করিলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে এবং ধর্মকর্মে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

৩. সৌন্দর্য ঃ ইহা অনুরাগ ও ভালবাসার কারণ হইয়া থাকে। এই জন্যই বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখিয়া লওয়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আন্‌সার মহিলাদের নয়নে কিছু জিনিস আছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে বিবাহের পূর্বে দেখিয়া লওয়া তাহার উচিত। বুযর্গগণ বলেন ঃ পূর্বে পাত্রী না দেখিয়া বিবাহ করিলে পরিণামে অনুতাপ ও দুঃখ করিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, 'ধর্মের জন্য বিবাহ করা উচিত, সৌন্দর্যের জন্য নহে। ইহার অর্থ এই যে, শুধু সৌন্দর্যের বিবাহ করিবে না। ইহাতে এমন বোঝায় না যে, সৌন্দর্যের কামনাই করিবে না। যদি কেহ একমাত্র সন্তানলাভ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত পালনের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, রূপের কামনা না করে তবে ইহা তাহার পরহিযগারী বলিয়া গণ্য হইবে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) জনৈকা কানা মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বোন অতিশয় রূপসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তৎপ্রতি অনুরক্ত হন নাই। কারণ, তিনি শুনিয়াছিলেন যে, কানা মহিলাটি তাঁহার রূপসী বোন হইতে বুদ্ধিমত্তায় অধিক উৎকৃষ্ট।

৪. মাহর কম হওয়া ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "স্ত্রীলোকদের মধ্যে সে-ই উত্তম যাহার মাহর অল্প; অথচ তাহার রূপ ও গুণ অধিক।" অধিক পরিমাণে মাহর নির্ধারণ করা মাকরূহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন স্ত্রীর মাহর দশ দিরহাম নির্ধারিত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় কন্যাগণের মাহর চল্লিশ দিরহামের অধিক নির্ধারণ করেন নাই।

৫. বন্ধ্যা না হওয়া ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বন্ধ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা গৃহের কোণে পতিত খেজুর পাতার পুরাতন চাটাই উৎকৃষ্ট।

৬. পাত্রী কুমারী হওয়া ঃ কারণ, কুমারী স্ত্রী সহিত প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়া থাকে এবং যে স্ত্রীলোক একবার অপর স্বামীর সঙ্গ-সুখ ভোগ করিয়া আসিয়াছে প্রায়ই দেখা যায় যে, তাহার অন্তর পূর্ব স্বামীর দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। হযরত জাবির (রা) এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি

কুমারী বিবাহ করিলে না কেন? তাহা হইলে সে তোমার সহিত ও তুমি তাহার সহিত খেলা করিতে পারিতে।

৭. ধার্মিকতা ও পরহিযগারীর পরিপ্রেক্ষিতে পাত্রী কুলীন হওয়া ঃ কারণ পরিবেশগত নীচতার মধ্যে লালিতা স্ত্রীলোক সাধারণত অসৎ- স্বভাবের হইয়া থাকে এবং মাতার এই স্বভাবের প্রভাব হয়তো সন্তানানাদির উপরও প্রতিফলিত হয়।

৮. পাত্রী নিকট সম্পর্কের আত্মীয় না হওয়া ঃ কেননা হাদীস শরীফে আছে, আত্মীয় স্ত্রীর গর্ভে দুর্বল সন্তান জন্মিয়া থাকে। ইহার কারণ হয়ত এই যে, ঘনিষ্ঠ মহিলার প্রতি কামস্পৃহা কম হইয়া থাকে।

বিবাহের পূর্বে পাত্রীর মধ্যে উল্লিখিত গুণসমূহ যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক।

পাত্রের গুণসমূহ ঃ ওলী বা পিতা কন্যার ভবিষ্যত মঙ্গল ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিষ্ট ও সৎস্বভাবসম্পন্ন পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবে। রুক্ষস্বভাব, কুৎসিত এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিতে অক্ষম এমন ব্যক্তির নিকট কন্যা বিবাহ দিবে না। বংশমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা, ধর্মপরায়ণতা, প্রভৃতি বিষয়ে পাত্রীকুলের সমকক্ষ না হইলে তদ্রূপ পাত্রে কন্যাদান সঙ্গত নহে। তদ্রূপ পাপাচারী ও ব্যভিচারীর নিকটও কন্যা বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় কন্যাকে পাপাচারীর সহিত বিবাহ দেয় তাহার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে।

দাম্পত্য জীবন যাপন প্রণালী ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিবাহ ধর্মের মৌলিক কার্যাবলীর অন্যতম। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে ধর্মের বিধানাবলী মানিয়া চলা দম্পতিযুগলের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় মানবের বিবাহ এবং ইতর প্রাণীর বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকিবে না। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে বারটি নিয়ম পালন করিয়া চলা উচিত।

প্রথম ঃ ওলীমা। বিবাহের পর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে সাধ্যানুযায়ী ভোজ দেওয়াকে ওলীমা বলে (ইহা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, হানাফী মযহাবমতে সুন্নাতে-যাইদাহ)। হযরত আবদুর রহমান বিন 'আউফ (রা) বিবাহ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ-

একটি ছাগল যবেহ করিয়া হইলেও ওলীমার যিয়াফত কর।

ছাগল যবেহ করিতে অসমর্থ হইলে বন্ধু-বান্ধবদের সম্মুখে যে খাদ্য উপস্থিত করিবে তাহাই ওলীমা বলিয়া গণ্য হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হযরত সাফিয়্যা (র)-কে বিবাহ করেন তখন কেবল খুরমা ও যবের ছাতু দ্বারা ওলীমা করিয়াছিলেন। অতএব, বিবাহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী ওলীমা কর। বিলম্বের কারণ ঘটিলেও ইহাতে এক সপ্তাহের অধিক বিলম্ব করিবে না।

দ্বিতীয় ঃ স্ত্রীর সহিত সর্বদা সদ্ভাব বজায় রাখিবে। ইহার অর্থ এই নহে যে, তাহাকে শাসনেই রাখিবে না। বরং শাসনে রাখিবে এবং তাহার ক্রোধ সহ্য করিবে। তাহার অন্যায় আবদার ও অকৃতজ্ঞতা সূচক ব্যবহারেও ধৈর্য ধারণ করিবে। হাদীস শরীফে আছে, স্ত্রীলোককে দুর্বলতা ও সতর (ঢাকিয়া রাখার উপযুক্ত বস্তু) দ্বারা সৃজন করা হইয়াছে। নীরবতা তাহাদের দুর্বলতার প্রতিকার এবং গৃহে আবদ্ধ রাখাই তাহাদের আবরণীয় অবস্থার জন্য মঙ্গলজনক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর কর্কশ স্বভাব সহ্য করিবে সে হযরত আইয়্যুব (আ) তদীয় বিপদরাশি সহ্য করতঃ যেরূপ সওয়াব পাইয়াছেন তদ্রূপ সওয়াব পাইবে। শোনা গিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওফাতের সময় তিনটি কথা ধীরে ধীরে বলিতেছিলেন ঃ (১) নামায কায়েম কর, (২) আল্লাহ্‌র বান্দাগণের সহিত সদ্ব্যবহার কর, (৩) স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তাহারা তোমাদের হস্তে বন্দিনী। তাহাদের সহিত উত্তমরূপে জীবন যাপন কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীগণের ক্রোধে ধৈর্য ধারণ করিতেন।

একদা হযরত উমর (রা)-এর স্ত্রী সরোষে তাঁহার কথার প্রতিউত্তর দিলে হযরত উমর (রা) বলেন ঃ হে দুর্মুখী! তুমি আমার কথার প্রতিউত্তর করিতেছ! তাঁহার স্ত্রী বলিলেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার পত্নীগণও তাঁহার কথার প্রতিউত্তর দিয়া থাকেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে হাফসা (রা) যদি বিনীত না হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য আফ্‌সোস। অতঃপর তিনি স্বীয় দুহিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম পত্নী হযরত হাফ্‌সা (রা)-কে দেখিয়া বলিলেন ঃ সাবধান, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার প্রতিউত্তর করিও না। হযরত আবুবকর (রা)-এর কন্যার অনুকরণ করিও না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে ভালবাসেন এবং তিনি তাঁহার কৌতুক ও রসিকতা সহ্য করিয়া থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ-

তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে স্বীয় স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং আমি আমার পত্নীগণের সহিত তোমাদের সকলের অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করিয়া থাকি।

তৃতীয় ঃ স্ত্রীর সহিত রসালাপ এবং ক্রীড়া-কৌতুক করিবে; নীরস ও রুক্ষ হইয়া থাকিবে না এবং তাহার বুদ্ধির অনুরূপ তাহার সহিত আচার-ব্যবহার করিবে। স্বীয় পত্নীর সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেরূপ ক্রীড়া-কৌতুক করিয়াছেন তদ্রূপ কেহই করিতে পারে নাই। এমনকি, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র সঙ্গে দৌড়েরও প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) জয়ী হইলেন। দ্বিতীয়বার দৌড় প্রতিযোগিতার সুযোগ ঘটিল। এইবার হযরত আয়েশা (রা) জয়ী হইলেন। তখন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা প্রথমবারের প্রতিশোধ হইল অর্থাৎ এখন তুমি ও আমি সমান হইলাম। একদা কতিপয় হাব্‌শী ক্রীড়া-কৌতুক ও লম্ফ-ঝম্ফ করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলেন ঃ তুমি দেখিতে চাও কি? হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁহার নিকট আগমন করত স্বীয় বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন। হযরত আশেয়া (রা) স্বীয় চিবুক হুযূর (সা)-এর বাহুর উপর স্থাপনপূর্বক বহুক্ষণ ধরিয়া হাব্‌শীদের ক্রীড়া-কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে আয়েশা! এখনও তৃপ্ত হও নাই? হযরত আয়েশা (রা) নীরব রহিলেন। এইরূপে তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর হযরত আয়েশা (রা) উক্ত ক্রীড়া-কৌতুক দর্শনে ক্ষান্ত হইলেন। (সম্ভবত পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হারাম করতঃ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সুতরাং এই ঘটনা দ্বারা কেহই বিভ্রান্ত হইবেন না)। হযরত উমর (রা) প্রত্যেক কার্যে অতিশয় কঠোর কড়া হওয়া সত্ত্বেও বলিতেন ঃ নিজের স্ত্রীর সহিত তরুণের মতো হাস্যরসের অবতারণা ও তদ্রূপ আচার-ব্যবহার করা পুরুষের উচিত। কিন্তু সাংসারিক কার্যে পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করা আবশ্যক। বুযর্গগণ বলেন ঃ পুরুষ হাস্যমুখে গৃহে প্রবেশ করিবে; যাওয়ার সময় নীরবে চলিয়া যাইবে; গ্রহে আসিয়া যাহা কিছু পাইবে তাহাই আহার করিবে এবং যাহা তৈয়ার পাইবে না তজ্জন্য কিছু বলিবে না।

চতুর্থ ঃ স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক ও হাসি- তামাশা এত অধিক করিবে না যাহাতে স্ত্রীর হৃদয় হইতে তোমার ভয় সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত হইয়া যায় এবং মন্দ কার্যে স্ত্রীর মতের পোষকতা করিবে না। বরং সে মানবতা ও শরীয়তের বিরোধী কোন কার্যে উদ্যত হইলে তাহাকে শাসন করিবে। কারণ এইরূপ কার্যে স্ত্রীর পক্ষপাতিত্ব করিলে পুরুষ গোলাম হইয়া পড়ে। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ-

স্বামী স্ত্রীর উপর শাসক; স্ত্রীর উপর সর্বদা তাহার প্রবল থাকা উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ –تَعِسَ عَبْدُ الزَّوْجَةِ যে পুরুষ স্ত্রীর গোলাম হইয়া থাকে, সে হতভাগ্য।

কারণ সৃষ্টিগতভাবেই স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত হইয়া থাকা উচিত। বুযর্গগণ বলেন ঃ স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পরামর্শ কর; কিন্তু কেবল তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিও না। প্রকৃতপক্ষে নারীর প্রকৃতি অবাধ্য কুপ্রবৃত্তি তুল্য। পুরুষ তাহাদিগকে একটু স্বাধীনতা দিলে তাহারা নাগালের বাহিরে যাইবে ও সীমা অতিক্রম করিবে এবং পরিশেষে তাহাদিগকে বশে আনয়ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। মোটকথা, নারীর

মধ্যে এক প্রকার দুর্বলতা আছে; ধৈর্যাবলম্বনই ইহার প্রতিকার। তাহাদের মধ্যে বক্রতাও আছে; শাসনই ইহার ঔষধ। বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় সর্বদা স্ত্রীর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা পুরুষের কর্তব্য। প্রতিকারের উপযোগী কোন বিষয় দেখিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিকার করিবে। কিন্তু সর্বক্ষণ অতিশয় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত কাজ করিতে হইবে। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নারী পুরুষের পাঁজরের বাঁকা হাড্ডি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। জোরে টানিয়া সোজা করিতে চাহিলে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

পঞ্চম ঃ লজ্জাশীলতার ব্যাপারে যথাসাধ্য সংযত হইবে এবং মধ্যম পন্থা বর্জন করিবে না। বিপদ ও অশুভ ঘটনার উদ্ভব হইতে পারে এমন কার্য হইতে স্ত্রীকে বারণ করিবে। যথাসম্ভব তাহাকে গৃহের বাহিরে যাইতে দিবে না। গৃহের ছাদে উঠিতে ও বাহিরে দরজায় দাঁড়াইতে দিবে না। এইরূপ স্থানে দন্ডায়মান হইলে তাহার দৃষ্টি পরপুরুষের উপর এবং পরপুরুষের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িতে পারে। জানালার ছিদ্র দিয়া পরপুরুষের ক্রিয়া-কৌতুক দেখিবার অনুমতি স্ত্রীলোককে কখনও দিবে না। কারণ, চক্ষু হইতে যাবতীয় পাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট থাকিলে উহা সৃষ্টি হয় না; বরং জানালার ফাঁক, ছাদ ও দ্বারদেশ দিয়াই পাপ প্রবেশ করে। সুতরাং স্ত্রীলোকের জন্য তামাশা দেখাকে সামান্য কার্য বলিয়া অবহেলা করিবে না। বিনা কারণে স্ত্রীর প্রতি কুধারণা পোষণ করা, তাহার দুর্নাম করা এবং সীমাতিরিক্ত লজ্জা রাখা উচিত নহে। স্ত্রীর প্রত্যেক কার্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনেও বাড়াবাড়ি করিবে না।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাম দেশের নিকটবর্তী এলাকা হইতে প্রত্যাগমন করত সঙ্গী-সাথিগণকে বলিলেনঃ অদ্য রাতে কেহই অতর্কিত নিজে গৃহে প্রবেশ করিও না। রজনী প্রভাত হওয়া পর্যন্ত এখানেই অবস্থান কর। দুইজন এই আদেশ লংঘন করতঃ রাত্রিকালেই নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিকূলতার জন্য মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিল না। হযরত আলী (রা) বলেনঃ লজ্জাশীলতার ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের প্রতি সীমার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিও না। কারণ সমাজে ইহা প্রকাশ পাইলে লোকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিবে। বড় লজ্জাশীলতা এই যে, পরপুরুষের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হইতে দিবে না। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ স্ত্রীলোকদের পক্ষে উত্তম কি? হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন ঃ ইহাই উত্তম যে, কোন পরপুরুষ তাহাদিগকে এবং তাহারা কোন পরপুরুষকে দেখিতে না পায়। স্বীয় দুহিতার নিকট হইতে এই উত্তর শুনিয়া রাসূলূল্লাহ (সা) অত্যন্ত সন্তুস্ট হইলেন এবং তাঁহাকে গলায় লাগাইয়া বলিলেন ঃ –بِضْعَةٌ مِّنِّىْ 'তুমি আমারই কলিজার টুকরা।

একদা হযরত মুআয (রা) স্বীয় স্ত্রীকে জানালা দিয়া উকি মারিতে দেখিয়া প্রহার করিয়াছিলেন। অপর একদিন একটি সেব ফলের এক টুকরা নিজে খাইয়া অপর টুকরা

গোলামকে দিয়াছিলেন দেখিয়াও প্রহার করিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ নারীদিগকে আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতে দিও না। তাহা হইলে তাহারা গৃহের বাহির হইবে না। কারণ, আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতে দিলেই গৃহের বাহিরে যাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় স্ত্রীলোকদের জন্য মস্‌জিদে নামাযের জামা'য়াতে পশ্চাতের সারিতে দাণ্ডায়মান হওয়ার অনুমতি ছিল। সাহাবী (রা)-গণ তাঁহাদের যমানায় তাহাদিগকে মস্‌জিদে গমন করিতে নিষেধ করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীলোকদের বর্তমান অবস্থা যদি রাসূলুল্লাহ (সা) দেখিতেন তবে তিনি তাহাদিগকে মস্‌জিদে যাইতে নিষেধ করিতেন।

বর্তমান যুগে নারীদিগকে মস্‌জিদে ও সভায় গমনে এবং পর-পুরুষদিগকে দর্শনে নিবৃত্ত রাখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু অতি বৃদ্ধ মহিলা পুরাতন চাদরে বা বোরকায় দেহ আবৃত করিয়া গমন করিলে কোন দোষ নাই। অধিকাংশ সময় স্ত্রীলোকদের উপর সভায় ও প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বিপদ উপস্থিত হয়। সুতরাং যে স্থানে বিপদের আশংকা আছে তথায় স্ত্রীলোকদিগকে যাইতে দেওয়া দুরস্ত নহে। জনৈক অন্ধ পুরুষ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহে গমন করেন। হযরত আয়েশা (রা) ও অন্য স্ত্রীলোকগণ যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের কেহই অন্ধলোকটিকে দেখিয়া পর্দার অন্তরালে গমন করিলেন না; বরং তাঁহারা বলিলেন, এই ব্যক্তি অন্ধ। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ এই ব্যক্তি অন্ধ হইলে তোমরাও কি অন্ধ?

ষষ্ঠ ঃ স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ উত্তমরূপে করিবে, সঙ্কীর্ণতাও করিবে না এবং অপব্যয়ও করিবে না। বুঝিয়া লইবে যে, স্ত্রীকে জীবিকা প্রদানের সওয়াব সদ্‌কা খয়রাতের সওয়াব অপেক্ষা অধিক। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি এক দীনার জিহাদে ব্যয় করে, এক দীনার দ্বারা গোলাম খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দেয়, এক দীনার কোন মিস্‌কীনকে দান করে এবং এক দীনার স্বীয় স্ত্রীকে দান করে তবে এই শেষোক্ত দীনারের সওয়াব সর্বাধিক হইবে। কোন উত্তম খাদ্য স্বামীর একাকী খাওয়া উচিত নহে। কোন কারণে তদ্রূপ খাদ্য একাকী খাইয়া থাকিলে তাহা গোপন রাখিবে। যে খাদ্য নিজ গৃহে প্রস্তুত করিতে সক্ষম না হও স্ত্রীর নিকট ইহার উল্লেখ করিবে না। ইব্‌ন সিরীন (র) বলেন ঃ সপ্তাহে একবার হালুয়া তৈয়ার করিবে অথবা মিঠাই প্রস্তুত করিবে। অকস্মাৎ মিষ্টান্ন ভোজন বন্ধ করিয়া দেওয়া অমানুষিকতার কাজ। কোন মেহ্‌মান উপস্থিত না থাকিলে স্বীয় স্ত্রীর সহিত আহার করিবে। কারণ, হাদীস শরীফে আছে, যে গৃহের লোকেরা একসঙ্গে আহার করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের মাগফিরাত কামনা করিয়া থাকে।

মোটকথা, হালাল উপার্জন দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিবে। কারণ হারাম মাল দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করা বিশ্বাসঘাতকতা ও নিতান্ত অবিচারের কাজ। তদপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিচার আর হইতে পারে না।

সপ্তম ঃ স্বামী স্ত্রীকে নামায, পাক-পবিত্রতা, হায়েয-নিফাস, ইত্যাদি বিষয়ক প্রয়োজনীয় ধর্ম-শিক্ষা প্রদান করিবে। স্বামী শিক্ষা না দিলে গৃহের বাহিরে যাইয়া আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া স্ত্রীর উপর ফরয। স্বামী শিক্ষা দিলে তাহার অনুমতি ব্যতীত বাহিরে যাওয়া এবং পরপুরুষের নিকট জিজ্ঞাসা করা স্ত্রীর জন্য দুরস্ত নহে। স্ত্রীকে ধর্মবিষয়ক শিক্ষা প্রদানে ত্রুটি করিলে স্বামী তজ্জন্য গুণাহগার হইবে। কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا–

তোমরা তোমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।

ইহাও স্ত্রীলোকদিগকে শিখাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, সূর্যাস্তের পূর্ব হায়েয বন্ধ হইলে সেই দিনের আসরের নামাযেরও কাযা আদায় করিতে হইবে। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই এই মাস্‌য়ালা অবগত নহে।

অষ্টম ঃ একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা স্বামীর কর্তব্য। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি কোন এক স্ত্রীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে কিয়ামত দিবসে তাহার অর্ধেক শরীর বাঁকা হইয়া যাইবে। উপহার প্রদানে ও রাত্রি যাপনে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবে। কিন্তু ভালবাসা ও সহবাস বিষয়ে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব নহে। কারণ ভালবাসা ও সম্ভোগেচ্ছার উপর কাহারও হাত নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) এক-এক রাত্রি এক-এক স্ত্রীর সহিত যাপন করিতেন। কিন্তু তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে সর্বাধিক ভালবাসিতেন এবং বলিতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্। যে বিষয় আমার ক্ষমতা আছে তাহাতে সমতা রক্ষার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু হৃদয়ের উপর আমার অধিকার নাই।

কোন স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলে এবং তাহার সহিত সহবাসের ইচ্ছা না হইলে তাহাকে তালাক দিয়া দেওয়া উচিত, আবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্গত নহে।

নবম ঃ স্ত্রী স্বীয় অক্ষমতাবশত ঃ স্বামীর আদেশ পালন করিতে না পারিলে ভালবাসা প্রদর্শনে ও নম্র ব্যবহারে তাহার দ্বারা আদেশ পালন করাইয়া লওয়া উচিত। নম্র ব্যবহারেও আদেশ পালনে বাধ্য না হইলে স্বামী তাহাকে রাগ দেখাইবে এবং শয়নকালে তাহার দিকে পৃষ্ঠ দিয়া শয়ন করিবে। ইহাতেও অনুগত না হইলে তিন রাত্রি নিজে পৃথক বিছানায় শয়ন করিবে। এই ব্যবস্থাও ফলপ্রদ না হইলে তাহাকে

মারিবে। কিন্তু মুখমণ্ডলে প্রহার করিবে না এবং এত জোরেও প্রহার করিবে না যাহাতে ক্ষত হইয়া যাইতে পারে। নামায কিংবা ধর্মের কোন কার্যে ত্রুটি করিলে মাসেক কাল পর্যন্ত তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকিবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) তদীয় সহধর্মিনিগণের প্রতি পূর্ণ এক মাসকাল ক্রুদ্ধ ছিলেন।

দশম ঃ সহবাসের সময় পশ্চিম দিকে মুখ করিবে না। সহবাসের পূর্বে রসালাপ, ক্রীড়া-কৌতুক, প্রেম-সম্ভাষণ, চুম্বন ও আলিঙ্গনাদির সাহায্যে স্ত্রীকে প্রফুল্ল করিয়া লইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জন্তুর ন্যায় আপন স্ত্রীর উপর পতিত হওয়া মানুষের উচিত নহে; বরং সঙ্গমের পূর্বে দূত প্রেরণ আবশ্যক। সাহাবী (রা)-গণ নিবেদন করিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই দূত কি ? তিনি বলিলেন ঃ চুম্বনই সেই দূত। সহবাসের প্রারম্ভে এই দু'আ পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ–

মহান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

এতদসঙ্গে সূরা ইখ্‌লাস পড়িয়া লওয়া উত্তম। সহবাস ঠিক আরম্ভকালে এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا

হে আল্লাহ্! আমাদিগকে শয়তান হইতে দূরে রাখ এবং আমাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছ তাহা হইতে শয়তানকে দূরে রাখ।

কারণ হাদীস শরীফে আছে, সহবাসকালে এই দু'আ পড়িলে, এই সহবাসে যে সন্তান জন্মিবে সে শয়তান হইতে নিরাপদে থাকিবে। শুক্রপাতের সময় এই আয়াতের ধ্যান করিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا–

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি (শুক্ররূপ) পানি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্তর তাহাকে বংশ ও শ্বশুর-সম্পর্ক বিশিষ্ট করিয়াছেন।

শুক্রপাতের উপক্রম হইলে ইহা রোধ করত স্ত্রীর শুক্র অগ্রে পাত করিবার চেষ্টা করিবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ পুরুষের দুর্বলতার লক্ষণ তিনটি ঃ (১) যে ব্যক্তি ভালবাসে তাহার নাম জিজ্ঞাসা না করা। (২) কোন ভ্রাতা সম্মান করিলে উহা উপেক্ষা করা। (৩) চুম্বন আলিঙ্গনাদির পূর্বে স্ত্রীর সহিত সহবাসে লিপ্ত হওয়া এবং স্ত্রীর শুক্রপাত হওয়া পর্যন্ত নিজের শুক্র রোধে অক্ষম হওয়া। হযরত আলী (রা), হযরত

আবু হুরায়রা (রা) এবং হযরত মু'আবিয়া (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, চান্দ্র মাসের প্রথম, পঞ্চদশ এবং শেষ তারিখের রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা মাকরূহ। কারণ এই কয়েক রাত্রে সহবাস-কালে শয়তান উপস্থিত থাকে।

হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হইতে দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সহিত নগ্নদেহে শয়ন করা নিষিদ্ধ নহে। হায়েয বন্ধ হইলেও গোসলের পূর্বে সহবাস করা উচিত নহে। একবার সহবাসের পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করিলে উভয়েই নিজ নিজ অঙ্গ ধৌত করিয়া লইবে। অপবিত্র অবস্থায় কিছু খাইবার ইচ্ছা করিলে উযূ করিয়া লইবে। শয়ন করিতে চাহিলেও উযূ করিয়া শয়ন করিবে। উযূ দ্বারা সহবাসজনিত নাপাকী দূর হইবে না বটে তথাপি আহার ও নিদ্রার জন্য উযূ করিয়া লওয়া সুন্নত। স্ত্রীসহবাসের পর গোসলের পূর্বে ক্ষৌরকার্য করিবে না ও নখ কাটিবে না। কারণ এইরূপ অপবিত্র অবস্থায় চুল, নখ কাটিয়া ফেলা ভাল নহে।

স্ত্রীর জরায়ুতে শুক্র পৌছাইবার চেষ্টা করিবে; বাহিরে ফেলিবে না। কিন্তু শুক্রপাতের উপক্রমেই বাহিরে আনিয়া ফেলা হারাম নহে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিবেদন করিল ঃ এক ক্রীতদাসী আমার খিদমত করিয়া থাকে। সে গর্ভবতী হইয়া কাজে অক্ষম হইয়া পড়ে আমি ইহা চাহি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ সহবাসকালে শুক্রপাতের উপক্রম হইলে পুরুষাঙ্গ বাহিরে আনিয়া শুক্রপাত করিবে। কিন্তু ভাগ্যে সন্তান থাকিলে সন্তান আপনা-আপনিই জন্মিবে। কিছুকাল পর সেই লোক আগমন করত বলিল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সে দাসীর গর্ভে) একটি সন্তান জন্মিয়াছে। হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ–

আমরা জন্মনিরোধের জন্য বাহিরে শুক্রপাত করিতাম, তখন কুরআন অবতীর্ণ হইত; (কিন্তু বাহিরে শুক্রপাত করা আমাদের প্রতি নিষিদ্ধ হয় নাই)।

একাদশ ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র তাহার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত বলিবে। হাদীস শরীফে আছে যে, এইরূপ করিলে সন্তান শিশু রোগ হইতে নিরাপদ থাকিবে। সন্তানের উৎকৃষ্ট নাম রাখিবে। হাদীস শরীফে আছে, আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান এবং এবংবিধ নাম আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোৎকৃষ্ট। গর্ভভ্রষ্ট সন্তানেরও নাম রাখা সুন্নত। আকীকা সুন্নতে মুআককাদা (হানাফী মযহাব মতে সুন্নতে যাইদা)।

কন্যা সন্তানের জন্য একটি এবং পুত্র সন্তানের জন্য দুইটি ছাগ যবেহ করিয়া আকীকা করা উচিত। দুইটি না থাকিলে একটি করিলেও চলিবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, আকীকার ছাগের হাড় ভাঙ্গা উচিত নহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহার মুখে কোন মিষ্টদ্রব্য দেওয়া ও সপ্তম দিনে তাহার চুল কাটাইয়া সেই চুলের সমান ওজনে স্বর্ণ বা রৌপ্য সদকা করা সুন্নত।

কন্যা সন্তানের ফযীলত ঃ কন্যা সন্তান জন্মিলে অসন্তুষ্ট এবং পুত্র সন্তান জন্মিলে খুব আনন্দিত হওয়া উচিত নহে। কারণ কোন্ সন্তানে মঙ্গল হইবে তাহা লোকে জানে না। কন্যা সন্তান অতি শুভ এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণে অধিক সওয়াব মিলে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহার তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন আছে এবং তাহাদের জন্য তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইতেছে, তাহার এই অনুগ্রহকৃত পরিশ্রমের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাহার উপর অনুগ্রহ করিবেন। এক ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি দুইজন থাকে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ দুইজন হইলেও। তখন এক ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ একজনই যদি থাকে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তাহা হইলেও। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহার একটি কন্যা আছে সে দুঃখগ্রস্ত, যাহার দুই কন্যা আছে সে ভারী বোঝাগ্রস্ত, যাহার তিন কন্যা আছে, হে মুসলমানগণ! তোমরা তাহাকে সহানুভূতি ও সাহায্য কর। সে আমার এই দুইটি অঙ্গুলির ন্যায় বেহেশতে আমার সঙ্গে থাকিবে। অর্থাৎ সে আমার নিকট অবস্থান করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজার হইতে ফল খরিদ করিয়া গৃহে আনয়ন করে তাহার সওয়াব সদকা তুল্য। প্রথমে কন্যাকে প্রদান করিয়া পরে পুত্রকে দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি কন্যাকে সন্তুষ্ট করিবে সে আল্লাহর ভয়ে রোদনকারীর ন্যায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করে তাহার জন্য দোযখের অগ্নি হারাম হইয়া যায়।

দ্বাদশ ঃ সাধ্যপক্ষে স্ত্রীকে তালাক দিবে না। কারণ, তালাক মুবাহ্ হইলেও আল্লাহ্র নিকট নিতান্ত অপছন্দনীয় এবং তালাক শব্দ উচ্চারণ-মাত্রই স্ত্রী নিতান্ত বেদনা পাইয়া থাকে। অযথা কাহাকেও বেদনা দেওয়া কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলে তালাক দেওয়া যাইতে পারে। একবারে এক তালাকের অধিক প্রদান করা উচিত নহে। একবারে তিন তালাক দেওয়া মাক্রূহ। হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। আবার হায়েযের পর পবিত্রাবস্থায় সহবাস করিয়া থাকিলেও তালাক দেওয়া হারাম। তালাক দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিলেও দয়াপরবশ হইয়া তালাক দিতে বিলম্ব করিবে। ক্রোধ ও ঘৃণার বশবর্তী হইয়া তালাক দিবে না। তালাকের পর স্ত্রীকে উপহার দিবে; তাহাতে সে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিবে। স্ত্রীর গোপনীয় বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না এবং কি দোষে তাহাকে তালাক দিতেছ তাহাও কাহারও নিকট বলিবে না। তালাক দিতে উদ্যত এক ব্যক্তিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ তুমি তালাক দিতেছ কেন? সে ব্যক্তি বলিলঃ আমি আমার স্ত্রীর গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিতে পারি না। তালাক দেওয়ার পর আবার লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ তুমি তালাক দিলে কেন? সে ব্যক্তি বলিল ঃ বেগানা নারীর গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করায় আমার কি প্রয়োজন?

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ঃ উপরে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিরাট কর্তব্য রহিয়াছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করিতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহাকেও সিজদা করিবার বিধান থাকিলে নিজ নিজ স্বামীকে সিজ্দা করার জন্য প্রত্যেক স্ত্রীকে নির্দেশ প্রদান করা হইত।" নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রী স্বামীর গৃহে অবস্থান করিবে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে গৃহের বাহির হইবে না। দরজা-জানালায় দাঁড়াইবে না এবং ছাদের উপর যাইবে না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বেশি আলাপ-আলোচনা ও বন্ধুত্ব করিবে না। অকারণে প্রতিবেশিদের গৃহে যাইবে না। স্বামীর সুনাম ব্যতীত কখনও দুর্নাম করিবে না। স্বামীর সহিত নিঃসঙ্কুচিত সহবাস ও আনুগত্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রত্যেক কার্যে স্বামীর উদ্দেশ্য ও সন্তোষের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি রাখিবে। স্বামীর ধনের খেয়ানত করিবে না। স্বামীর প্রতি সর্বদা কোমলতা প্রদর্শন করিবে । স্বামীর কোন বন্ধু দ্বারে উপস্থিত হইলে এমনভাবে উত্তর দিবে যেন তোমাকে বন্ধুর স্ত্রী বলিয়া সে ব্যক্তি চিনিতে না পারে। স্বামীর সকল বন্ধু-বান্ধব হইতে পর্দা করিবে যেন তাহারা তোমাকে চিনিতে না পারে। অবস্থানুযায়ী যাহা জোটে তাহাতেই স্বামীর সহিত সন্তুষ্ট থাকিবে, অতিরিক্ত চাহিবে না। স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য অপেক্ষা স্বামীর প্রতি তোমার কর্তব্যকে বড় বলিয়া মনে করিবে। সর্বদা নিজেকে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে যেরূপ সাজসজ্জা সহবাসের জন্য প্রয়োজনীয়। যে কাজ স্বহস্তে করিতে পার তাহা নিজেই সমাধা করিবে। স্বামীর সম্মুখে নিজের রূপ ও সৌন্দর্যের অহংকার করিবে না। স্বামীর সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের প্রতি কখনও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না। "তুমি আমার সহিত কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" এইরূপ কখনও বলিবে না। সর্বদা অকারণে ক্রয়-বিক্রয় ও তালাকের প্রশ্ন উত্থাপন করিবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি দোযখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তথায় বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, নিজ নিজ স্বামীর প্রতি অভিশাপ, ভর্ৎসনা ও অকৃতজ্ঞতা করার জন্য তাহাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

উপার্জন ও ব্যবসায়

পৃথিবী পরকালের পথে একটি পান্থশালা। জীবন ধারণের জন্য মানুষের পানাহারের আবশ্যক এবং উপার্জন ব্যতীত পানাহারের সমগ্রী পাওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং উপার্জনের নিয়মাবলী জানিয়া লওয়া আবশ্যক; কারণ দুনিয়া অর্জনে যে ব্যক্তি দেহ-মন সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত রাখে সে নিতান্ত হতভাগা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করত ঃ সর্বদা কেবল পরকালের পাথেয় সংগ্রহে নিজেকে মশ্‌গুল করিয়া রাখেন, তিনি অতি সৌভাগ্যবান। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে মধ্যপন্থা এই যে, মানুষ পার্থিব সম্পদও উপার্জন করিবে এবং তৎসঙ্গে পরকালের সম্বল সংগ্রহেও লিপ্ত থাকিবে। কিন্তু পরকালের সম্বল সংগ্রহ হইবে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং একমাত্র পরকালের সম্বল নিরুদ্বেগে সংগ্রহের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যেই পার্থিব সম্পদ উপার্জন করিবে। সুতরাং উপার্জন সম্বন্ধে শরীয়তের যে বিধানসমূহ ও নিয়মাবলী অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক উহা এ স্থলে পাঁচটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ

উপার্জনের ফযীলত ও সওয়াব

নিজেকে ও নিজের পরিবারবর্গকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া না রাখা এবং হালাল জীবিকা উপার্জনপূর্বক তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করা ধর্ম-যুদ্ধের সমতুল্য এবং বহু ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক বলিষ্ঠ যুবক অতি প্রত্যূষে অপর পার্শ্ব ধরিয়া এক দোকানে চলিয়া গেল। সাহাবা (রা)-গণ বলিলেন ঃ আফসোস, এই ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র পথে (লিপ্ত হওয়ার জন্য) এত প্রত্যূষে উঠিত! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ এইরূপ বলিও না। কারণ এই ব্যক্তি যদি নিজকে বা নিজের মাতাপিতা অথবা নিজের স্ত্রী-পুত্রদিগকে পরমুখাপেক্ষী না করার উদ্দেশ্যে গমন করিয়া থাকে তাহা হইলেও সে আল্লাহর পথে আছে। আর বাহাদুরী, অহংকার এবং অতিরিক্ত ধনার্জনের উদ্দেশ্যে গমন করিয়া থাকিলে সে শয়তানের পথে রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে পরমুখাপেক্ষী না করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা স্বীয় প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে হালাল উপার্জন করে, কিয়ামত দিবস তাহার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হইবে। তিনি বলেন ঃ সৎ ব্যবসায়িগণ কিয়ামত-দিবস সিদ্দীক-শহীদগণের দলে উঠিবে। তিনি বলেন ঃ ব্যবসায়ী মুসলমানকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। তিনি বলেন ঃ শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিলে ব্যবসায়ীদের উপার্জন সর্বাধিক হালাল। তিনি বলেন ঃ বাণিজ্য কর। কারণ ধনের দশ ভাগের নয় ভাগ শুধু বাণিজ্যে রহিয়াছে। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ্ তাহার জন্য দরিদ্রতার সত্তর দরজা খুলিয়া দেন। হযরত ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি কাজ কর? সে ব্যক্তি বলিল ঃ ইবাদত করি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আহার কোথা হইতে পাও ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ আমার ভাই আছেন; তিনি আমার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন ঃ তোমার ভাই তোমা অপেক্ষা অধিক ইবাদতকারী। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ উপার্জন ত্যাগ করিও না এবং আল্লাহ্ জীবিকা দান করিবেন বলিয়া অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিও না। কারণ আল্লাহ্ আসমান হইতে স্বর্ণ-রৌপ্য নিক্ষেপ করেন না। অর্থাৎ তিনি আস্‌মান হইতে স্বর্ণ-রৌপ্য নিক্ষেপে সক্ষম বটে কিন্তু কোন উসীলায় জীবিকা প্রদান করাই তাঁহার সাধারণ নীতি।

লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদানে বলেন ঃ হে বৎস! উপার্জন ছাড়িও না। কারণ যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী হয় তাহার ধর্ম সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, বুদ্ধি দুর্বল ও মানবতা বিনষ্ট হয় এবং লোকে তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। এক বুযর্গকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আবিদ শ্রেষ্ঠ, না আমানতদার ব্যবসায়ী ? তিনি বলিলেন ঃ আমানতদার ব্যবসায়ী শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি সর্বদা শয়তানের সহিত জিহাদে লিপ্ত। শয়তান দাঁড়ি-পাল্লা ও আদান-প্রদানের অন্তরালে সর্বদা ব্যবসায়ীর পশ্চাতে লাগিয়া থাকে এবং তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ পরিবারবর্গের জীবিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাজারে গমন করত হালাল উপার্জনকালে আমার মৃত্যু ঘটিলে আমার নিকট এই মৃত্যু অন্য সকল স্থানের মৃত্যু অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ যে ব্যক্তি ইবাদতের জন্য মসজিদে অবস্থান করে এবং বলে, আল্লাহ্ আমাকে জীবিকা প্রদান করিবেন, আপনি এই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি বলেন ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ সে ব্যক্তি মূর্খ, শরীয়ত সম্বন্ধে অবগত নহে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার রিযক বল্লমের ছায়াতলে অর্থাৎ জিহাদের মধ্যে আল্লাহ আমার জীবিকা রাখিয়াছেন।

হযরত আওযাঈ (র) হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (র)-কে লাক্‌ড়ির বোঝা স্কন্ধে লইয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি আর কতকাল এইরূপ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন ? আপনার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ আপনার এই কষ্ট দূর করিতে সক্ষম। হযরত ইবরাহীম আদ্‌হাম (র) বলিলেন ঃ চুপ থাক। হাদীস শরীফে আছে "হালাল জীবিকা অন্বেষণে যে ব্যক্তি নীচ স্থানে দণ্ডায়মান হয়, বেহেশ্‌তে তাহার জন্য স্থান সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে।

এ স্থলে কেহ যদি প্রশ্ন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

مَا أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنِ اجْمَعِ الْمَالَ وَكُنْ مِّنَ التَّاجِرِيْنَ وَلٰكِنْ أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ-

সঞ্চয় করিতে এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন নাই; বরং প্রশংসা সহকারে স্বীয় প্রভুর তস্‌বীহ পাঠ করিতে ও সিজদাকারীগণের দলভুক্ত থাকিতে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বীয় প্রভুর ইবাদত করিতে আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

এই হাদীস দ্বারা তো ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকা উপার্জন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার উত্তর এই, যে ব্যক্তি নিজের ও স্বীয় পরিবারবর্গের নিমিত্ত যথেষ্ট ধনের অধিকারী, সর্বসম্মত মতে সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকাই তাহার জন্য উপার্জনে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু আবশ্যকের অতিরিক্ত উপার্জনে লিপ্ত হওয়াতে কোনই ফযীলত নাই। বরং ইহাতে অনিষ্ট সাধিত হয় এবং ইহাই সংসারাসক্তি। আর এইরূপ অনাবশ্যক উপার্জনই যাবতীয় পাপের অগ্রণী। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি নির্ধন; কিন্তু হালাল অর্থে তাহার জীবিকা নির্বাহ হইতেছে তাহার জন্য উপার্জনে প্রবৃত্ত না হওয়াই উত্তম। এই বিধান চারি শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রযোজ্য ঃ (১) যাঁহারা জনসাধারণের হিতকর ধর্মীয় বা পার্থিব জ্ঞানে লিপ্ত, যেমন শরীয়তের ইল্‌ম বা চিকিৎসা বিদ্যা। (২) যাঁহারা শরীয়তের বিচার-কার্যে নিযুক্ত আছেন, যাহাদের হাতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ভার ন্যস্ত আছে অথবা যাঁহারা মানবের কোন মঙ্গলজনক কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। (৩) যাঁহার অন্তরে সূফীগণের অবস্থা এবং অন্তর্দৃষ্টির পথ-উন্মুক্ত হইয়াছে। (৪) যাঁহারা সূফীদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত খান্‌কায় অবস্থান করত আল্লাহ্‌র ইবাদত ও ওযীফা পাঠে নিমগ্ন থাকেন। অপর লোকের নিকট হইতে যদি এই শ্রেণীর লোকদের জীবিকা পৌছিতে থাকে এবং যমানাও এইরূপ হয় যে, বিনা প্রার্থনায় ও অনুগ্রহের খোঁটা না দিয়া কেবল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে তাহাদিগকে সাহায্য করারূপ সওয়াবের কার্যে অনুপ্রাণিত হয়, তবে উক্ত চারি শ্রেণীর লোকের জন্য উপার্জনে লিপ্ত না হওয়াই উত্তম।

অতীতকালের জনৈক বযুর্গের ৩৬০ জন বন্ধু ছিল। তিনি সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকিতেন এবং এক-এক রজনীতে এক-এক বন্ধুর গৃহে মেহ্‌মানস্বরূপ থাকিতেন। তাঁহাকে উপার্জনের আবিল্য হইতে মুক্ত রাখাকে তাঁহার বন্ধুগণ ইবাদত বলিয়া গণ্য করিত। নেক কার্যের দ্বারা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই তৎকালে এই রীতি প্রচলিত ছিল। অপর এক বুযর্গের ৩০ জন বন্ধু ছিল। সারা মাস তিনি এক-এক রজনীতে এক-এক বন্ধুর বাড়িতে থাকিতেন। কিন্তু যমানার অবস্থা যদি এইরূপ হয় যে, প্রার্থনার অপমান ভোগ করা ব্যতীত শুধু সওয়াবের আশায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোক দান না করে, তবে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করা উত্তম। কারণ ভিক্ষা করা মন্দ কার্য, বিশেষ প্রয়োজনে ইহা হালাল হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি উচ্চ মরতবার অধিকারী এবং যাঁহার দ্বারা লোকের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, এমতাবস্থায় জীবিকা অন্বেষণে তাঁহাকে কিছুটা অপমান সহ্য করিতে হইলেও উপার্জনে লিপ্ত না হওয়াই তাহার জন্য উত্তম। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি হইতে বাহ্য ইবাদত ব্যতীত কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও উপকার পাওয়া যায় না, উপার্জনে লিপ্ত হওয়াই তাহার জন্য উত্তম। আর যে ব্যক্তি উপার্জনের কার্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও মনকে আল্লাহ্‌র স্মরণে নিবদ্ধ রাখিতে পারেন তাঁহার জন্যও উপার্জনে লিপ্ত হওয়াই উত্তম। কারণ আল্লাহ্‌র স্মরণই সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য এবং উপার্জনে রত থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌র সহিত অন্তরকে সংযুক্ত রাখিতে পারেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

শরীয়ত সম্মত উপার্জনের জ্ঞান

ব্যবসায়-বাণিজ্য বিষয়ক অনুচ্ছেদটি অতি বিস্তৃত। ফিকাহ্-শাস্ত্রসমূহে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থলে মানুষের অবগতির জন্য শুধু এতটুকু বর্ণিত হইবে যাহা অধিকাংশ সময় দরকার পড়ে এবং তদতিরিক্ত জটিল বিষয় উপস্থিত হইলে আলিমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারে। এ স্থলে যাহা বর্ণিত হইবে তাহাও জানা না থাকিলে লোকে হারাম ও সুদে নিপতিত হইয়া পড়িবে এবং ইহাও বুঝিবে না যে, এ বিষয়ে কাহারও নিকট জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

উপার্জনের শ্রেণী বিভাগ ঃ মোটামুটি ছয় প্রকার কারবারে উপার্জন হইয়া থাকে। যথা ঃ (১) ক্রয়-বিক্রয়, (২) সুদ, (৩) দাদন, (৪) ইজারা, (৫) পুঁজি দিয়া অপর কর্তৃক কারবার চালান ও (৬) নির্দিষ্ট অংশে শরীক হইয়া কারবার করা। নিম্নে এই সমস্তের শর্তসমূহ বর্ণিত হইতেছে।

ক্রয়-বিক্রয় ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মাস্‌য়ালা জানা ফরয। কারণ প্রত্যেককেই ক্রয়-বিক্রয় করিতে হয়। হযরত উমর (রা) বাজারে যাইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের মাস্‌য়ালায়

অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদিগকে দুর্রা মারিতেন এবং বলিতেন ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মাস্‌য়ালা শিক্ষা না করিয়া যেন কেহই এই বাজারে কারবার না করে। অন্যথায় ইচ্ছায় হউক বা ভুলে হউক লোকে সুদে নিপতিত হইয়া পড়িবে।

ক্রয়-বিক্রয়ের তিনটি অংশ ঃ (১) ক্রেতা ও বিক্রেতা, (২) পণ্যদ্রব্য, (৩) ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাক্যে স্থিরীকৃত হওয়া।

ক্রেতা ও বিক্রেতা ঃ পঞ্চবিধ লোকের নিকট ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। যথাঃ (১) নাবালেগ ছেলে, (২) পাগল, (৩) ক্রীত দাস-দাসী, (৪) অন্ধ ও (৫) হারামখোর।

ইমাম শাফিঈ (র)-র মতে নাবালেগ ব্যক্তি অভিভাবকের অনুমতিক্রমে ক্রয়-বিক্রয় করিলেও ইহা দুরস্ত নহে এবং পাগলের ক্রয়-বিক্রয়েও এই একই বিধান। নাবালেগ বা পাগলের নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে যদি ইহা ক্রেতার হাতে নষ্ট হয় তবে ক্রেতাকেই ইহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে নাবালেগ বা পাগলের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে এবং ক্রেতার হাতে উহা নষ্ট হইলে বিক্রেতা কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না। কারণ বিক্রেতা স্বয়ং উহা দিয়া নিজেই দ্রব্যটি নষ্ট করিয়াছে। ক্রীত দাস-দাসীও প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রয়-বিক্রয় করিলে তাহা দুরস্ত হইবে না। কসাই, রুটি বিক্রেতা, মুদী প্রভৃতি ব্যবসায়ী দাস-দাসীর প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাহাদের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করিলে এই ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয হইবে না। কিন্তু যদি কোন ন্যায় বিচারক সংবাদ প্রদান করে অথবা শহরে এই কথা প্রচারিত থাকে যে, উক্ত দাস-দাসীর প্রভু তাহাদিগকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছে, এমতাবস্থায় প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাহাদের নিকট হইতে কিছু ক্রয় করিলে ক্রেতাকে তজ্জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে প্রভুর অনুমতি ব্যতীত এইরূপ দাস-দাসীর নিকট কিছু বিক্রয় করিলে তাহার আযাদ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের নিকট কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইবে না। অন্ধ ব্যক্তিকৃত কারবার অশুদ্ধ। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি যদি কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করে তবে উকিল যাহা ক্রয় করে উহার ক্ষতিপূরণ তাহারই দেয়া হইবে। কারণ সে শরীয়তের বিধানাবদ্ধ ও স্বাধীন।

হারাম ভক্ষণকারী যেমন; তুর্কী (সেইকালে তুর্কীগণ অমুসলমান ছিল; তাহারা মৃত জীবজন্তু ইত্যাদি খাইত এবং মদ্যপান করিত। এখন তাহারা মুসলমান; সুতরাং বর্তমানে তাহাদের সহিত ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ নহে)। অত্যাচারী, চোর, সুদদাতা, মদ্য বিক্রেতা, ডাকাত, গায়ক, শোকগাথা গাহিয়া উপার্জনকারী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, ঘুষখোর ইত্যাদি হারামখোরের সহিত ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। যদি সঠিকভাবে জানা যায় যে, এইরূপ লোক হইতে ক্রয়ের বস্তু তাহার নিজস্ব সম্পদ, হারাম উপায়ে অর্জিত নহে, তবে উহা ক্রয় করা হারাম নহে, বরং দুরস্ত। কিন্তু যদি সঠিকভাবে জানা যায় যে, ক্রীতদ্রব্য তাহার নিজস্ব নহে; বরং হারাম উপায়ে অর্জিত; তবে তাহা ক্রয় দুরস্ত

নহে। সন্দেহযুক্ত বস্তুর অধিকাংশ হালাল ও কম অংশ হারামের হইলে তাহা ক্রয় দুরস্ত হইবে বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহ হইবে না। কিন্তু অধিকাংশ হারাম ও সামান্য অংশ হালালের হইলে প্রকাশ্যতঃ ইহার ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম বলা না গেলেও ইহা এমন সন্দেহজনক যে, হারামের নিকটবর্তী এবং ইহার বিপদ বড় ভয়ানক।

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সহিত ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইলেও তাহাদিগকে কুরআন শরীফ দেওয়া উচিত নহে এবং মুসলমান দাস-দাসীও তাহাদের নিকট বিক্রয় করিবে না। তাহারা মুসলমানদের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তাহাদের নিকট যুদ্ধাস্ত্রও বিক্রয় করিবে না। এই বিক্রয় প্রকাশ্য শরীয়তমতে অশুদ্ধ এবং বিক্রেতাও পাপী হইবে।

ইবাহতীগণ শরীয়তের বিধান অমান্যকারী ধর্মহীন। তাহাদের সহিত কারবার দুরস্ত নহে। তাহাদিগকে হত্যা করা ও তাহাদের ধন ছিনাইয়া লওয়া বৈধ। তাহারা কোন দ্রব্যের মালিক নহে; তাহাদের সহিত বিবাহ দুরস্ত নহে। ইসলাম-ধর্ম ত্যাগী মুরতাদদের প্রতি প্রযোজ্য বিধি তাহাদের উপরও প্রযোজ্য। যাহারা অত্র গ্রন্থের দর্শন খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সপ্তবিধ 'ভ্রম'-এর কোন এক ভ্রমে নিপতিত হইয়া মদ্যপান, যাহাদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ নহে এমন স্ত্রীলোকের সহিত উঠাবসা এবং নামায না পড়াকে দুরস্ত বলিয়া মনে করে তাহারা যিন্দীক, ধর্মদ্রোহী। তাহাদের সহিত কোন কারবার করা এবং বিবাহ দুরস্ত নহে।

পণ্যদ্রব ঃ যাহা ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে ইহাকেই পণ্যদ্রব্য বলে। এ বিষয়ে ছয়টি শর্তের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রথম শর্ত ঃ বিক্রয়ের দ্রব্য পবিত্র হওয়া। কুকুর, শূকর, গোবর, হস্তীর হাড়, মদ্য, মৃত প্রাণীর মাংস ও চর্বি ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। কিন্তু পবিত্র তৈলে অপবিত্র বস্তু পতিত হইলে উহা ক্রয়-বিক্রয় হারাম নহে। এইরূপ অপবিত্র বস্তু বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নহে। মৃগনাভী, রেশম বীজ, রেশম সূতার ক্রয়-বিক্রয়ও দুরস্ত। কারণ উহা অপবিত্র নহে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ বিক্রয়ের দ্রব্য উপকারী হওয়া। সাপ, বিচ্ছু এবং মাটির নিচে অবস্থানকারী কীট বা প্রাণীসমূহের ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। সাপুড়িয়াগণ সাপ নাচাইয়া যাহা উপার্জন করে তাহাও দুরস্ত নহে। একটি মাত্র গমের দানা এবং এই প্রকার নগণ্য পদার্থ যাহাতে উল্লেখযোগ্য কোন উপকার নাই, উহার ক্রয়-বিক্রয়ও দুরস্ত নহে। কিন্তু বিড়াল, মৌমাছি, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি যে সকল জন্তু বা উহাদের চর্ম মানুষের উপকারে আসে, সে সকল প্রাণী ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত আছে। তোতা, ময়ুর, প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পাখী ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত। কারণ, এই শ্রেণীর সুদর্শন পাখী দেখিয়া লোকে আনন্দ পায়। সেতার, বীণা, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। কারণ এইগুলি হইতে আনন্দ লাভ করা হারাম এবং এইগুলি হইতে কোন উপকার

পাওয়া যায় না। বালক-বালিকাদের মাটির খেলনা প্রাণীর মূর্তি হইলে উহার ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এইরূপ খেলনা ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজিব। বৃক্ষলতা ও ফল-ফুলের আকৃতিবিশিষ্ট খেলনা তৈয়ার করা দুরস্ত (এবং উহাদের ক্রয়-বিক্রয়ও অবৈধ নহে)। প্রাণীর মূর্তিবিশিষ্ট থালা ও বস্তু ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত আছে। কিন্তু এইরূপ বস্তু পরিধান করা দুরস্ত নহে। উহা দ্বারা বালিশ ও বিছানা তৈয়ার করা যাইতে পারে।

তৃতীয় শর্ত ঃ পণ্য দ্যব্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা স্বত্ব থাকা। কারণ অপরের দ্রব্য মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করিলে এই বিক্রয় বৈধ নহে। এমন কি, বিনা অনুমতিতে স্বামীর দ্রব্য স্ত্রী, পুত্রের দ্রব্য পিতা এবং পিতার দ্রব্য পুত্রও বিক্রয় করিতে পারে না। বিক্রয়ের পর মালিকের অনুমতি লইলেই এই বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। কারণ বিক্রয়ের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

চতুর্থ শর্ত ঃ বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতাকে ছাড়িয়া দেওয়ার উপযুক্ত হওয়া। পলাতক দাস-দাসী, পানির মধ্যস্থিত মাছ, শূন্যে উড়ন্ত পাখী, গর্ভস্থ শাবক এবং অশ্বপৃষ্ঠস্থিত শুক্র ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। কারণ এইগুলি তৎক্ষণাৎ ক্রেতার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া বিক্রেতার ক্ষমতাধীন নহে। পশুর পৃষ্ঠস্থিত পশম বা বাঁটের দুগ্ধ বেচাকেনাও জায়েয নহে। কারণ বিক্রয়ান্তে ক্রেতাকে সমর্পণ করিয়া দিতে যে সময় লাগিবে সেই সময়ের মধ্যে পশুর লোম বৃদ্ধি পাইবে এবং বাটে নূতন দুগ্ধ সঞ্চারিত হইয়া পূর্বে সঞ্চারিত দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবে। রেহেন গ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত রেহেনে আবদ্ধ বস্তু বিক্রয় দুরস্ত নহে। দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মিয়া থাকিলে তাহাকে বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। কারণ তাহাকে ক্রেতার হস্তে সমর্পণ করা সম্ভব নহে। যে দাসীর সন্তান অল্প বয়স্ক, সন্তান রাখিয়াই সেই দাসীকে বা দাসী রাখিয়া সন্তানকে বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। কারণ তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান হারাম।

পঞ্চম শর্ত ঃ বিক্রেয় বস্তু, ইহার পরিমাণ এবং অবস্থা ও গুণ জ্ঞাত হওয়া। বিক্রেয় বস্তু অজ্ঞাত হওয়ার মর্ম এইরূপ যে, যেমন কেহ বলিল, এই পালের যে ছাগলটি বা এই গাঠুরি হইতে যে থানটি তোমার মনঃপূত হয় তাহাই তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। (কারণ ইহাতে বিক্রেয় বস্তুটি নির্দিষ্টরূপে জানা গেল না)। কিন্তু পালের কোন একটি ছাগল বা গাঠুরির কোন এক থান কাপড় আকারে-ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট করা হইলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে। তদ্রূপ কেহ যদি বলে, এই ভূমির দশ গজ তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম, যে দিক হইতে ইচ্ছা গ্রহণ কর। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও শুদ্ধ নহে। কারণ শুধু দশ গজ বলিলে জমির আয়তন প্রকাশ পায় না, দৈর্ঘ্য-প্রস্থসহ জমির নির্দিষ্ট পরিমাণ জানা আবশ্যক। ক্রেতার দর্শন ব্যতীত কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নহে। বিক্রেতা যদি বলে, অমুক ব্যক্তি যত মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিয়াছে তত মূল্যে আমি ইহা তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম।

অথবা অমুক জিনিস সেই ওজনের স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিলাম। আর যদি জিনিস ও মূল্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকে তবে এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও অশুদ্ধ। কিন্তু স্তূপীকৃত গম দেখাইয়া বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে ঃ এই পাত্রপূর্ণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে এই গমগুলি তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম; আর ক্রেতা সেই গমের স্তূপ এবং পাত্র দর্শন করে তবে এই ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।

বিক্রেয় দ্রব্যের গুণ ও অবস্থা অবগত হওয়ার অর্থ হইল, যে দ্রব্য দেখা হয় নাই তাহা দেখিয়া লওয়া। পরিবর্তনশীল দ্রব্য পূর্বে দর্শনকালে যেরূপ দেখা গিয়াছিল পরে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পরে। সুতরাং উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উহার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া না লইলে উহার ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। যে মিহি বস্তু চট বা অন্য ভাঁজ করা বস্ত্রের মধ্যে মিলিয়া রহিয়াছে এবং যে গম আঁটির মধ্যে, উহা ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নহে। দাসী ক্রয়কালে তাহার মাথার চুল, হস্ত-পদ ইত্যাদি যাহা কিছু দাস বিক্রয় করার সময় ব্যবসায়ীরা সচরাচর দেখাইয়া দিয়া থাকে, এই সকল দেখিয়া লইবে। এই সমস্তের কোন কিছু দেখিবার বাকি থাকিলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। গৃহ ক্রয়কালে একটি দরজা দেখিবার বাকি থাকিলেও উহার ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু আখ্‌রোট, বাদাম, কালাই, ডালিম, ডিম ইত্যাদি পৃষ্ঠাবরণে আবৃত থাকা অবস্থায়ও উহাদের ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে। কারণ এই সকল পদার্থ এই অবস্থায় বিক্রয় করাই সুবিধাজনক। কাঁচা আখ্‌রোট, কলাই দুইটি আবরণে আবৃত থাকিলেও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলে উহাদের ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত আছে। ফকা' (فقاع) ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। কারণ ইহা অপ্রকাশ্য। কিন্তু মালিকের অনুমতি গ্রহণপূর্বক ইহা পানাহার করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ খরিদা বস্তু ক্রেতার অধিকারে না আসা পর্যন্ত উহা পুনরায় বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। উহা প্রথমে অধিকারে আনয়ন করত তৎপর বিক্রয় করিতে হইবে।

ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি নির্ধারণ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি কথায় প্রকাশ করা আবশ্যক। বিক্রেতা বলিবে-এই দ্রব্য আমি তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম; ক্রেতা বলিবে-আমি ক্রয় করিলাম; অথবা বিক্রেতা বলিবে-এই দ্রব্যের বিনিময়ে আমি তোমাকে ইহা দিলাম এবং ক্রেতা বলিবে-আমি ইহা লইলাম বা গ্রহণ করিলাম; কিংবা ক্রেতা ও বিক্রেতা অবিকল উপরিউক্ত বাক্য স্পষ্টভাবে উচ্চারণ না করিলেও এমন বাক্য ব্যবহার করিবে যাহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থ বোঝা যায়। আদান-প্রদানের পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থ বাক্যে প্রকাশ না পাইলে ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। যেমন আজকাল বাক্যহীন ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। ছোটখাট দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়কালে ক্রয়-বিক্রয়ের বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করিলেও চলিতে পারে। কারণ এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া

পড়িয়াছে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন এবং শাফিঈ মযহাবের কতিপয় আলিমও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনটি কারণে এই মত সমর্থন করা যাইতে পারে ঃ (১) এইরূপ নির্বাক প্রথায় ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। (২) সম্ভবত ছোটখাট ক্রয়-বিক্রয়ের এই রীতি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর যুগেও প্রচলিত ছিল। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের কথা মুখে উচ্চারণের কড়াকড়ি তাঁহাদের যুগের থাকিলে তাঁহারা অসুবিধার সম্মুখীন হইতেন এবং সেই কড়াকড়ির কথা তাঁহারা বর্ণনা করিতেন ও উহা গোপন থাকিত না। (৩) কোন কিছু অভ্যাসে পরিণত হইয়া পড়িলে সে স্থলে কার্যকে কথার স্থলবর্তী বলিয়া গণ্য করা অসম্ভব নহে। কাহাকেও উপহারস্বরূপ কিছু প্রদানের এই রীতিই প্রচলিত আছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপহার প্রদানকালে, 'আমি উপহার দিলাম' এবং 'আমি গ্রহণ করিলাম' বাক্য উচ্চারণের বাড়াবাড়ি ছিল না। উহার সম্বন্ধে এই রীতি সবযুগেই প্রচলিত ছিল। দান-উপহার ইত্যাদি বিনিময়বিহীন বিষয়াদিতে প্রচলিত রীতি অনুসারে শুধু গ্রহণ কার্য দ্বারাই যেমন প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণকারীর অধিকারের আসে, তদ্রূপ ছোটখাট দ্রব্য মূল্যের বিনিময়ে বিনাবাক্য উচ্চারণে ক্রেতার অধিকারভুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। উপহারের ব্যাপারে ছোটখাট ও মূল্যবান পদার্থের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্যের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু গৃহ, জমি, গোলাম, পশু, মূল্যবান বস্তু ইত্যাদির ব্যাপারে ক্রয়-বিক্রয় প্রকাশ বাক্য উচ্চারণের প্রথা পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত মূল্যবান বস্তু ক্রয়-বিক্রয়কালে ক্রয়-বিক্রয় প্রকাশক বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করিলে পূর্ববর্তী বুযর্গগণের কার্যের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে এবং বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার অধিকারভুক্ত হইবে না। কিন্তু গোশ্‌ত, রুটি, ফল ইত্যাদি সামান্য মূল্যের যে সকল দ্রব্য অল্প অল্প পৃথক পৃথক বেচাকেনা হয়, প্রচলিত প্রথা অনুসারে উহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়ার পক্ষে যুক্তি রহিয়াছে। ছোটখাট দ্রব্য ও মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে শ্রেণী ও স্তরের পার্থক্য আছে। সুতরাং কোন্‌টি ছোটখাট জিনিস এবং কোন্‌টি মুল্যবান জিনিস, জানিয়া লওয়া উচিত। যখন এই শ্রেণীবিভাগ করা যায় না বা কঠিন হইয়া পড়ে, তখন সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয় অর্থাৎ এইরূপ স্থলে ক্রয়-বিক্রয়ের বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করাই উত্তম।

ক্রয়-বিক্রয় প্রকাশক শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত নীরবে মূল্য প্রদানপূর্বক কেহ এক গাধার বোঝা পরিমাণ গম খরিদ করিলে উহা ক্রেতার অধিকারভুক্ত হইবে না। কারণ উহা সামান্য জিনিস নহে। কিন্তু উহা ভক্ষণ ও ব্যবহার করা ক্রেতার জন্য হারাম নহে। কেননা মৌন স্বীকৃতি ও বস্তু প্রদানের কারণে উহার ব্যবহার বৈধ হইয়া পড়ে, যদিও এমতাবস্থায় বস্তু ক্রেতার অধিকারভুক্ত হয় না। উক্তরূপ গম দ্বারা নিমন্ত্রিত

মেহমানদিগকে আহার করাইলেও দুরস্ত হইবে। কারণ ক্রয়-বিক্রয়সূচক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া থাকিলেও বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ পূর্বক গমগুলি ক্রেতার নিকট সমর্পণ করা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, সে উহা ক্রেতার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছে। যদি গমের মালিক সুস্পষ্টরূপে এইরূপ বলিয়া দিত যে, আমার এই গম তোমার মেহমানকে খাওয়াইয়া দাও; পরে ক্ষতিপূরণ বা মূল্য দিয়া দিবে। এমতাবস্থায় উহার মেহমানকে আহার করাইয়া পরে ক্ষতিপূরণ দিলেও দুরস্ত হইত এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হইত। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রকাশ্যে তাহা না বলিয়া নিজের কার্যকলাপে সেই অনুমতির লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহাতেও উক্ত গম ব্যবহার করা বা মেহমানকে খাওয়ান ক্রেতার পক্ষে দুরস্ত হইবে। কিন্তু প্রকাশ্যে ক্রয়-বিক্রয়সূচক বাক্য উচ্চারণ না করায় উক্ত গমের উপর ক্রেতার অধিকার না হওয়ার কারণে সে উহা অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং ক্রেতা উক্ত গম ভক্ষণ করার পূর্বে বিক্রেতার ইচ্ছা করিলে তাহা ফেরত লইতে পারে; যেমন দস্তরখানায় পরিবেশিত খাদ্যদ্রব্য মেহমান আহার করিবার পূর্বে গৃহস্বামী ইচ্ছা করিলে উঠাইয়া লইতে পারে।

ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে অন্য কোন শর্ত করিলে ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হয় না। যেমন, ক্রেতা যদি বলে-আমি লাকড়িসমূহ এই শর্তে ক্রয় করিতেছি যে, আমার গৃহে তুমি এইগুলি পৌঁছাইয়া দিবে বা এই গমগুলি এই শর্তে খরিদ করিতেছি যে, এইগুলি তুমি পিষিয়া দিবে কিংবা তুমি আমাকে কিছু ধার দিবে অথবা এবংবিধ অন্য কোন শর্ত আরোপ করে তবে এই ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ে ছয় প্রকার শর্ত আরোপ করা দুরস্ত আছে ঃ (১) অমুক দ্রব্য আমার নিকট বন্ধক রাখিলে এই দ্রব্য তোমার নিকট বিক্রয় করিব। (২) অমুক ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখিতে হইবে। (৩) অমুক ব্যক্তিকে জামিন রাখিতে হইবে। (৪) এখনই মূল্য দিতে হইবে, এত দীর্ঘ সময়ের জন্য বাকি দিতে পারি না। (৫) তিনদিন বা তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে এই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে; তিনদিনের অধিক সময়ের শর্ত করা দুরস্ত নহে। (৬) গোলাম লেখাপড়া জানিলে বা কোন ব্যবসায় সম্বন্ধে অবগত হইলে ক্রয় করিলাম। এ সকল শর্তে ক্রয়-বিক্রয় নাযায়েয হইবে না।

সুদ ঃ নগদ স্বর্ণ-রৌপ্য ও টাকা-পয়সা এবং শস্যে সুদ হইয়া থাকে। স্বর্ণ-রৌপ্য দুইটি বিষয় হারাম। (১) ধারে বিক্রয় করা। কারণ এই স্থানে একই সময়ে এবং হাতে হাতে আদান-প্রদান করতঃ স্থান পরিত্যাগের পূর্বেই বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত না হইলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে এবং (২) স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করিলে উহাদের পরিমাণ সমান হইতে হইবে। পরিমাণ কমবেশি হইলে ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইবে না।

গোটা দীনার, টুকরা দীনার বা টুকরা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা উচিত নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ দীনারের বিনিময়ে অবিশুদ্ধ দীনার অধিক পরিমাণে লওয়াও সঙ্গত নহে। বরং বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ, গোটা ও টুকরা পরিমাণে সমান সমান হওয়া আবশ্যক। গোটা দীনারের বিনিময়ে বস্তু খরিদ করত সেই বিক্রেতার নিকটই পুনরায় সেই বস্তু অধিক পরিমাণে টুকরা দীনার অথবা টুকরা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা দুরস্ত আছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মিশ্রিত মুদ্রার বিনিময়ে খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আদান-প্রদান সিদ্ধ নহে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মিশ্রিত মুদ্রা দ্বারা অন্য বস্তু ক্রয় করত ইহা খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা যাইতে পারে। স্বর্ণ খচিত বা রৌপ্য জড়িত বস্তু অথবা খাদ মিশানো স্বর্ণ-রৌপ্যের সম্বন্ধে এই একই বিধান। মোতির মালায় স্বর্ণ থাকিলে উহা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। এইরূপ জরিদার বস্ত্র স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করাও দুরস্ত নহে। কিন্তু বস্ত্রখচিত স্বর্ণ প্রদত্ত মূল্যের সমান হইলে এবং জরিদার বস্ত্র দগ্ধ হইয়া গেলে তন্মধ্যে যে স্বর্ণ পাওয়া যায় উহা মূল্যরূপে প্রদত্ত স্বর্ণের অধিক না হইলে দুরস্ত আছে।

দুই শ্রেণীর হইলেও খাদ্যশস্যের পরিবর্তে খাদ্যশস্য ধারে বিক্রয় করা সঙ্গত নহে। বরং একই স্থানে একই সময়ে উভয় বস্তু আদান-প্রদান হওয়া আবশ্যক। একই প্রকার খাদ্য শস্যও, যেমন গমের পরিবর্তে গম ধারে বিক্রয় করা এবং অল্পের বিনিময়ে অধিক লওয়া দুরস্ত নহে; বরং একই স্থানে আদান-প্রদান করিতে হইবে এবং পরিমাণে সমান সমান হইতে হইবে। কেবল সমান সমান হইলেই চলিবে না; বরং প্রত্যেক বস্তুই স্থানীয় প্রচলিত ওজন অনুসারে সমান সমান হইতে হইবে। কসাইকে গোশ্‌তের পরিবর্তে ছাগল দেওয়া, রুটিওয়ালাকে রুটির বিনিময়ে গম দেওয়া, তেলীকে তৈলের পরিবর্তে তিল, সরিষা বা নারিকেল দেওয়া দুরস্ত নহে। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু বিক্রয় না করিয়া রুটি গ্রহণের আশায় গমের মালিক গম প্রদান করতঃ যে রুটি পাইবে তাহা নিজে ভক্ষণ করা দুরস্ত হইবে। তবে সে রুটির মালিক হইবে না এবং অপরের নিকট ইহা বিক্রয়ও করিতে পারিবে না। রুটির মালিক রুটির বিনিময়ে যে গম পাইবে তাহাও সে কেবল নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবে অপরের নিকট বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি রুটি নিয়াছে তাহার গম রুটিওয়ালার নিকট এবং রুটিওয়ালার রুটি যে ব্যক্তি নিয়াছে তাহার নিকট বাকি রহিয়া গেল। তাহারা উভয়ে নিজ নিজ দ্রব্য যখন ইচ্ছা তখনই দাবি করিতে পারিবে। তাহাদের পরস্পরে দাবি ছাড়িয়া দিলেও যথেষ্ট হইবে না। কারণ একজন যদি অপরজনকে বলে ঃ তুমি দাবি ছাড়িয়া দিবে এই শর্তে আমি আমার দাবি ছাড়িয়া দিলাম। এইরূপ দাবি ত্যাগ সিদ্ধ নহে। সুস্পষ্টরূপে উক্ত শর্ত না করিয়া যদি বলে ঃ আমি আমার দাবি পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু অপর পক্ষ যদি জানে যে, তাহার অন্তরে

উক্ত শর্তই আছে এবং তদ্ব্যতীত সে সামান্য পরিমাণ গমের দাবিও পরিত্যাগ করিবে না, তবে পরকালে এইরূপ দাবি ত্যাগের কোনই মূল্য হইবে না। কারণ এইরূপ সম্পত্তি অর্থাৎ দাবি ত্যাগ কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে। যে সম্মতি আন্তরিক নহে তাহা পরকালে কাজে লাগিবে না। কিন্তু একজন যদি বলে ঃ তুমি আমার উপর দাবি পরিত্যাগ কর বা না কর আমি তোমার উপর দাবি ছাড়িয়া দিলাম এবং বাস্তবে তাহার অন্তরেও ইহা থাকে, তবে এইরূপ দাবি ত্যাগ সিদ্ধ হইবে। এইরূপে বিনা শর্তে অপর পক্ষও আন্তরিকভাবে দাবি পরিত্যাগ করিলে ইহাও সিদ্ধ হইবে। আর তাহাদের কেহই যদি দাবি পরিত্যাগ না করে এবং উভয় পক্ষের দ্রব্য মূল্যে ও পরিমাণে সমান হয়, তবে দুনিয়ার বিচারে তাহারা ঠেকিবে না এবং পরকালের বিচারেও অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু উভয় পক্ষের দ্রব্যে সামান্য কমবেশি হইলেও ইহ-পরকালে উভয় জগতের বিচারেই ঠেকিবার আশংকা আছে।

যে খাদ্য-শস্য দ্বারা যে বস্তু প্রস্তুত হয় তাহা সমপরিমাণে হইলেও সেই খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা উচিত নহে। সুতরাং গম হইতে প্রস্তুত আটা, রুটি, ছানা, প্রবৃতি গমের পরিবর্তে বিক্রয় করা উচিত নহে। এইরূপ আঙ্গুরের সির্কা ও মধুও এবং দুধের পরিবর্তে পণীর ও মাখন বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। আঙ্গুর শুকাইয়া মনাক্কা এবং কাঁচা খুরমা শুকাইয়া শুক্‌না খুরমায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আঙ্গুরের পরিবর্তে আঙ্গুর এবং কাঁচা খুরমার পরিবর্তে কাঁচা খুরমা বিক্রয় করা দুরস্ত নহে।

ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ বহু বিস্তৃত। যাহা বর্ণিত হইল তাহা শিখিয়া লওয়া ওয়াজিব। এতদভিন্ন কোন অজ্ঞাত বিষয় উপস্থিত হইলে আলিমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করত শরীয়তের বিধান অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য করিতে হইবে যেন হারামে নিপতিত না হয় এবং কোন ওযর-আপত্তি না থাকে। কারণ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা যেমন ফরয, ইল্‌ম শিক্ষা করাও তেমনি ফরয।

দাদন (সলম) ঃ (দ্রব্য অগ্রিম প্রদান করিয়া কিছুকাল পরে মূল্য বা মূল্য অগ্রিম দিয়া কিছু কাল পরে দ্রব্য গ্রহণ করাকে দাদন বলে)। এই শ্রেণীর কারবারে দশটি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

প্রথম শর্ত ঃ দাদনী চুক্তিতে দ্রব্যের পরিমাণ ও রকম পরিষ্কাররূপে বলা ও শোনা আবশ্যক। যেমন, এক পক্ষ বলিবে ঃ আমি এই স্বর্ণ, রৌপ্য বা বস্ত্র এক গাধার বোঝা পরিমাণ গমের পরিবর্তে দাদনী চুক্তিতে তোমাকে দিলাম। প্রচলিত প্রথা অনুসারে যেরূপ দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্তে বিনিময় হইতে পারে তন্মধ্যে কোন রকম গম পাওয়া উদ্দেশ্য, ইহার গুণ ইত্যাদি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা আবশ্যক যেন দ্বিতীয় পক্ষ পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া বলিতে পারে-আমি গ্রহণ করিলাম। দাদন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া

যদি বলে, আমি আমার এই দ্রব্যের বিনিময়ে তোমার নিকট হইতে এই গুণের দ্রব্য ক্রয় করিলাম, তবেও দুরস্ত হইবে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ অগ্রিম প্রদত্ত বস্তু হিসাব ব্যতীত দিবে না; বরং ইহার ওজন ও পরিমাণ ঠিক করিয়া দিবে যেন জানা থাকে যে, কি বস্তু ও কি পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে। ফলে আবশ্যক হইলে ফেরত লইতে কোন অসুবিধা হইবে না।

তৃতীয় শর্ত ঃ দাদনের চুক্তি যে স্থানে সম্পন্ন হইবে সেই স্থানেই পুঁজি, টাকা বা বস্তু দাদন গ্রহীতার হাতে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ যে সকল দ্রব্যের অবস্থা বা গুণ প্রকাশ্যে জানা যায় কেবল সে সকল দ্রব্যেই দাদনের কারবার চলিতে পারে। যেমন, শস্য, তূলা, পশম, রেশম, দুগ্ধ, গোশ্‌ত ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল বস্তু কয়েক প্রকার বস্তুর সমন্বয়ে প্রস্তুত এবং সেই মিশ্রণের পরিমাণ অজ্ঞাত হয় ইহাদের দাদন কারবার দুরস্ত নহে। যেমন, 'গালিয়া' নামক সুগন্ধি দ্রব্য যাহা বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে অথবা তুরস্ক দেশীয় ধনু যাহা বিভিন্ন প্রকার ধাতু দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিংবা বিভিন্ন প্রকার চর্মে প্রস্তুত জুতা ও বিভিন্ন প্রকার সূতায় প্রস্তুত মোজা বা চাঁছা-ছোলা তীর ইত্যাদি প্রকার দ্রব্যে দাদনী কারবার বৈধ নহে। কারণ এই সমস্তের সঠিক গুণ ও মিশ্রণের পরিমাণ জানা যায় না। কিন্তু লবণ পানি ইত্যাদি বস্তুর সমন্বয়ে প্রস্তুত হইলেও রুটির উপর দাদনী কারবার দুরস্ত আছে। কারণ রুটিতে যে পরিমাণ লবণ ও পানি ব্যবহৃত হয় তাহা উদ্দেশ্যও নহে এবং অজ্ঞাতও নহে।

পঞ্চম শর্ত ঃ দাদনী বস্তু দিবার প্রতিজ্ঞায় নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করিতে হইবে। 'শস্য পাকিলে দিব' এইরূপ বলিলে দাদন বৈধ হইবে না। কারণ শস্য সর্বদা এক সময়ে পাকে না। নববর্ষ দিবসে বা কোন নির্দিষ্ট মাসে দিবার প্রতিজ্ঞা করিলে দুরস্ত হইবে।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ কোন জিনিসের উপর দাদন করিলে এমন সময়ের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যখন উহা ভালরূপে প্রস্তুত হয়। ফল পাকিবার পূর্বে দাদন করিলে দুরস্ত হইবে না। কিন্তু অধিকাংশ ফল পাকিলে দুরস্ত হইবে। কোন দৈব কারণে দাদনী দ্রব্য প্রস্তুতে বিলম্ব ঘটিলে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সময় বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে বা দাদনের চুক্তি ভঙ্গ করত দাদনের দ্রব্য ফেরত লওয়া যাইতে পারে।

সপ্তম শর্ত ঃ দাদনের জিনিস শহরে কি গ্রামে যে স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া সম্ভব তাহাই নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে, যেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয় এবং পরে ইহা লইয়া বিবাদের সৃষ্টি না হয়।

অষ্টম শর্ত ঃ 'এই বাগানের আঙ্গুর' অথবা 'এই খেতের গম দিব' দাদনী দ্রব্যকে এইরূপ নির্ধারিত করত সীমাবদ্ধ করা বৈধ নহে। এইরূপে নির্দিষ্ট করিবে না।

নবম শর্ত ঃ বৃহৎ অতুলনীয় মুক্তা, অপূর্ব সুন্দরী দাসী, অতীব সুন্দর দাস ইত্যাদি নিতান্ত দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের উপর দাদনী কারবার সঙ্গত নহে।

দশম শর্ত ঃ খাদ্য-দ্রব্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে খাদ্য-দ্রব্য দাদনে দেওয়া সঙ্গত নহে; যেমন গম, যব, সাওয়ান, কাউন ইত্যাদি খাদ্য-শস্য দাদনে দেওয়া উচিত নহে।

ইজারা ঃ ইহার দুটি অংশ আছে-একটি পারিশ্রমিক ও অপরটি লাভ। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতা ও বিক্রেতাকে যেরূপ ক্রয়-বিক্রয়সূচক বাক্য উচ্চারণে কার্য সম্পাদন করিতে হয়, ইজারা কারবারেও তদ্রূপ স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণে ইজারার কাজ সমাধা করিতে হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যের ন্যায় ইজারার ক্ষেত্রেও পারিশ্রমিক বা ভাড়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবার চুক্তিতে ভাড়া দেওয়া দুরস্ত নহে। কারণ নির্মাণ কিরূপ হইবে তাহা অজ্ঞাত। টাকার অংশ নির্ধারিত করিয়াও যদি বলা হয়, যেমন দশ দিরহাম ব্যয়ে নির্মাণ করিতে হইবে তথাপি দুরস্ত হইবে না। কেননা নির্মাণ কার্য অজ্ঞাত। এইরূপে ছাগের চর্ম খসাইয়া দিলে কসাইকে পারিশ্রমিকরূপে চর্মটি প্রদান করা কিংবা আটা বা ময়দা পিষিবার পারিশ্রমিকস্বরূপ তুষ, ভুসি বা কিছু আটা-ময়দা প্রদান করাও দুরস্ত নহে। শ্রমিকগণ পরিশ্রম করিয়া যে দ্রব্য প্রস্তুত করিবে পারিশ্রমিকস্বরূপ উক্ত দ্রব্যের অংশবিশেষ তাহাদিগকে দেওয়া দুরস্ত নহে। 'মাসিক এক দিনার দিবে, এই শর্তে এই দোকানটি তোমাকে ইজারা দিলাম', এই প্রকার ইজারাও দুরস্ত নহে। কারণ ইহাতে ইজারার সময়ের পরিমাণ জানা গেল না। এক বৎসর কিংবা দুই বৎসরের জন্য সময় নির্ধারিত করিয়া ইজারা দিলে দুরস্ত হইবে।

ইজারার দ্বিতীয় অংশ লাভ। যে কার্য শরীয়তে সঙ্গত ও পরিজ্ঞাত এবং সম্পন্ন করিতে পরিশ্রমের প্রয়োজন ও যহাতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার সুযোগ আছে, এই প্রকার কার্যেই ইজারা দুরস্ত। ইজারাতে পাঁচটি শর্ত পালন করিতে হইবে।

প্রথম শর্ত ঃ কার্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারিত থাকা এবং উহা সমাধানে কষ্ট ও পরিশ্রম থাকা। সজ্জিত করিবার জন্য দোকান, শস্য কিংবা কাপড় শুকাইবার জন্য বৃক্ষ অথবা ঘ্রাণ লইবার জন্য ফল ইজারা লওয়া্া দুরস্ত নহে। কারণ এই সমস্তের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই এবং ইহা গমের একটি মাত্র বীজ বিক্রয়ের ন্যায় অকিঞ্চিতকর। যদি কোন সম্মানী, প্রভাবশালী ও বাক-চতুর ব্যক্তিকে মজুরি নির্ধারণপূর্বক দালাল নিযুক্ত করা হয় এবং তাহার এক কথায়ই মাল কাটতি হইয়া যায় তবে এই ইজারা ও তাহার এই দালালির মজুরি হারাম হইবে। কারণ এই কার্যে কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে আড়তদার বা দালালকে ক্রয়-বিক্রয়কালে অধিক কথাবার্তা বলিতে হয় এবং গ্রাহক সংগ্রহের জন্য দৌড়াদৌড়ি, কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় তাহার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত হইবে বটে কিন্তু তাহার পারিশ্রমিক

পরিশ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ওয়াজিব হইবে না। যে সকল দালাল বা আড়তদার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শতকরা পাঁচ টাকা বা মণকরা আট আনা অথবা এইরূপ হিসাবে কিছু গ্রহণ করে তাহা হারাম। কারণ ইহাতে মালের পরিমাণ অনুসারে প্রাপ্তি হিসাব করা হইয়া থাকে, পরিশ্রম অনুসারে ধরা হয় না। অতএব দালালি ও আড়তদারি ব্যবসায়ে লব্ধ অর্থ হারাম। কিন্তু দুইটি উপায়ে তাহারা হারামের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে ঃ (১) তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হয় তাহা বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করা। প্রাপ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে মাল বা মূল্যের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া বরং পরিশ্রমের পরিমাণ অনুসারে দাবি করা যাইবে পারে। (২) মাল বিক্রয় করিবার পূর্বেই এইরূপ চুক্তি করা যে, এই মাল বিক্রয় করিয়া পারিশ্রমিকস্বরূপ এত টাকা গ্রহণ করিব এবং অপর পক্ষও ইহাতে টাকা অথবা মালের উপর প্রতি মণে এত টাকা গ্রহণের চুক্তি দুরস্ত নহে। কারণ গ্রাহক কত মূল্যে কিনিবে তাহা অজ্ঞাত। সুতরাং পরিশ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক দেওয়া আবশ্যক নহে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ লাভের উপরই ইজারা কারবার দুরস্ত; মূল বস্তু ইজারার অন্তর্ভুক্ত নহে। ফলভোগের চুক্তিতে বাগান বা আঙ্গুর বৃক্ষ অথবা দুগ্ধ দোহন করিয়া দেওয়ার চুক্তিতে গাভী ইজারা লওয়া কিংবা অর্ধেক দুধ গ্রহণের চুক্তিতে গাভীর ঘাস খাওয়াইয়া লালন-পালন করা দুরস্ত নহে। কারণ ঘাস, দুগ্ধ, ইত্যাদির পরিমাণ অজ্ঞাত। কিন্তু সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইবার নিমিত্ত বেতন প্রদানে দুগ্ধবতী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা দুরস্ত আছে। কারণ এ স্থলে সন্তান প্রতিপালনই মূল উদ্দেশ্য এবং দুগ্ধ প্রদান ইহার অধীন ও আনুষঙ্গিক কার্যমাত্র। যেমন লেখকের কালি ও দরজির সুতার পরিমাণ অজ্ঞাত হইলেও উহা দরজি ও লেখকের শ্রমের অধীন ও আনুষঙ্গিক বলিয়া তাহাদের পারিশ্রমিক প্রদান করিলেই চলিবে, উক্ত অধীনস্থ বস্তুদ্বয়ের মূল্য পৃথকভাবে দেওয়া আবশ্যক নহে।

তৃতীয় শর্ত ঃ যে কার্য অন্যের উপর অর্পণ করা সম্ভব এবং দুরস্ত তেমন কার্য নির্বাহের জন্য বেতনের উপর লোক নিযুক্ত করা চলে। যে কঠিন কার্য কোন দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য, বেতনের উপর সে ব্যক্তিকে উক্ত কার্যে নিযুক্ত করা সঙ্গত নহে। ঋতুবতী স্ত্রীলোককে বেতন প্রদানে মসজিদ ঝাড়ু দেওয়ার কার্যে নিযুক্ত করা দুরস্ত নহে। কারণ ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা হারাম। এইরূপ পীড়াহীন দাঁত উঠাইয়া ফেলার জন্য, সুস্থ হস্ত কর্তনের জন্য এবং ছেলের নাকে বা কানে বালী পরাইবার উদ্দেশ্যে ছিদ্র করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা হারাম। কারণ এই সকল কার্য দুরস্ত নহে এবং এইরূপ শরীয়তে নিষিদ্ধ কার্যে বেতন গ্রহণ করাও হারাম। 'উলকি' বা 'গোদানী' ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। পুরুষের জন্য রেশমী টুপী বা রেশমী পোশাক সেলাই করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া হারাম। এইরূপে

'রশিবাজী' শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করাও হারাম এবং এই তামাশাও হারাম। যে ব্যক্তি এই তামাশা দেখাইয়া থাকে তাহার জীবন বিনাশের আশংকা রহিয়াছে। সুতরাং তামাশা দেখাইবারকালে কোন দুর্ঘটনায় যদি তাহার মৃত্যু ঘটে তবে তামাশা দর্শনকারীরাও তাহার খুনের অংশী হইবে। কারণ দর্শক না থাকিলে সে কখনও সেই মারাত্মক তামাশা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইত না এবং নিজের জীবনকে বিপন্ন করিত না। রশিবাজ, বাজিকর প্রভৃতি যাহাদের জীবন নাশের আশংকা আছে-এমন বিপজ্জনক কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাদিগকে তদ্রূপ কার্য প্রদর্শনের বিনিময়ে কিছু প্রদান করাও পাপের কাজ। এইরূপে ভাঁড়, গায়ক, অন্যের পরিবর্তে রোদনকারী এবং ব্যঙ্গ কবিকে পারিশ্রমিক দেওয়াও হারাম।

রায় প্রদানের বিনিময়ে বিচারককে এবং সাক্ষ্য প্রদানের বিনিময়ে সাক্ষীকে পারিশ্রমিক প্রদান করা হারাম। কিন্তু যে স্থলে অপরের জন্য বিচারকের রায় লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ নহে, সেক্ষেত্রে রায় লিখিয়া দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বিচারকের জন্য দুরস্ত আছে। কারণ রায় লিখিয়া দেওয়া বিচারকের প্রতি ওয়াজিব নহে। পক্ষান্তরে অন্যকে লিখিতে নিষেধ করতঃ বিচারক সামান্য সময়ে রায় লিখিয়া দিয়া ইহার বিনিময়ে দশ কিংবা এক দীনার দাবী করা হারাম। কিন্তু অপরের প্রতি লিখিবার অনুমতি থাকিলে বিচারক যদি বলে, আমি স্বহস্তে রায় লিখিয়া দিলে তৎবিনিময়ে দশ দীনার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিব, তবে দুরস্ত আছে। অপর কেহ রায় লিপিবদ্ধ করিলে কেবল তাহাতে স্বাক্ষর প্রদানের বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বিচারকের জন্য হারাম। কারণ এই সামান্য কাজটুকু যাহা দ্বারা লোকের হক দৃঢ় ও সুসাব্যস্ত হইয়া থাকে, বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দেওয়াই বিচারকের প্রতি ওয়াজিব। ওয়াজিব না হইলেও এই সামান্য কার্যের পারিশ্রমিক গমের একটি দানার মূল্যের ন্যায় নিতান্ত নগণ্য। তবে আইনের বিচারক বলিয়াই তাঁহার স্বাক্ষরের মর্যাদা ও মূল্য রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি পদমর্যাদাবলে বিচারক নিযুক্ত হয়, বিচার-কার্যের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা তাহার জন্য দুরস্ত নহে। বিচারক নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারক এবং বাদী-বিবাদীর দাবি ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসাকারী বলিয়া জানা থাকিলে অথবা তিনি পক্ষপাতমূলকভাবে কোন পক্ষের হক নষ্ট করেন বলিয়া জানা না থাকিলে এইরূপ বিচারকের উকিল মিথ্যাবাদী, শঠ ও সত্যগোপনেচ্ছু না হইয়া বরং মিথ্যা দমনে আগ্রহশীল এবং সত্য প্রকাশ হওয়ার পর নীরব থাকিলে, এমন উকিল উপরিউক্ত বিচারকের উকিল হইয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারে; অন্যথায় দুরস্ত নহে। কিন্তু যে বিষয় স্বীকার করিলে কোন হক বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা অস্বীকার করা দুরস্ত আছে।

বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করিয়া ইহার বিনিময়ে উভয় পক্ষ হইতে কিছু কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নহে। কারণ একই বিবাদে উভয় পক্ষের জয়

হইতে পারে না। কিন্তু হারাম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও দাগাবাজী এবং উভয় পক্ষে যাহা সত্য তাহা গোপন না করিয়া, আর যেহেতু সাধারণ সালিসীতে মীমাংসা হইবে না কিংবা প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলে মীমাংসার প্রতি বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার জন্য উভয় পক্ষকে অথবা না ধমকাইয়া এক পক্ষের জন্য পারিশ্রমিকের উপযোগী পরিশ্রম করতঃ উহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হালাল হইবে। বস্তুত অধিকাংশ সালিসী মিথ্যা, অবিচার ও ধোকাবাজী হইতে মুক্ত নহে বলিয়া সালিসীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম। এক পক্ষের যথার্থ হক নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াও চক্রান্ত করিয়া হকদারকে স্বীয় ন্যায্য দাবি ত্যাগে অল্পে তুষ্ট করতঃ মীমাংসায় সম্মত করানো সালিসের জন্য দুরস্ত নহে। তবে সালিস যদি বুঝিতে পারে যে, হক-পক্ষ জয়ী হইলে অপর পক্ষের উপর উৎপীড়ন চালাইবে, এমতাবস্থায় কোন প্রকার চক্রান্ত অবলম্বন ও ভীতি প্রদর্শনে তাহার সেই উৎপীড়ন-প্রবৃত্তি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলে সালিসের জন্য ইহা করার অনুমতি আছে। যে ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ এবং বিশ্বাস রাখে যে, ইহকালে যাহা বলা হইবে পরকালে তাহার নিকট হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহার হিসাব গ্রহণ করা হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে-কেন বলিয়াছিলে? কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলে? সত্য বলিয়াছিলে কি মিথ্যা বলিয়াছিলে? এই মোকদ্দমায় তোমার ইচ্ছা সৎ ছিল, না অসৎ ছিল? এমন সালিস, উকিল কিংবা বিচারক কখনও মিথ্যা ও ধোকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি কাহারও ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য উচ্চপদস্থ লোকদের নিকট চেষ্টা ও তদ্‌বীর করে এবং তজ্জন্য যদি পরিশ্রম করিয়া ইহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তবে ইহা তাহার জন্য দুরস্ত আছে। তবে ইহাতে শর্ত এই যে, সেক্ষেত্রে কষ্ট ও পরিশ্রমের পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক; কেবল আপন পদমর্যাদার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা দুরস্ত নহে। যে কার্যের জন্য চেষ্টা-তদবীর করা দুরস্ত, কেবল তদ্রূপ কার্যেই চেষ্টা-তদবীর করা যাইতে পারে। কোন অত্যাচারীর জয়, অবৈধ রোজগার কিংবা কোন হারাম কার্যের জন্য চেষ্টা-তদ্‌বীর করিলে অথবা সত্য সাক্ষ্য গোপন করিলে পাপী হইতে হইবে এবং এইরূপ কার্যের পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও হারাম।

ইজারা সম্পর্কে উপরিউক্ত বিধানাবলী অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, এইগুলির ব্যতিক্রম করিলে ইজারাদাতা ও ইজারা গ্রহণকারী উভয়কেই পাপী হইতে হইবে। ইজারার বিবরণ বহু বিস্তৃত। কিন্তু উল্লিখিত বর্ণনা হইতে অজ্ঞ ব্যক্তিও কোথায় জটিলতা আছে জানিতে পারিবে এবং কোন্ বিষয় আলিমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া আবশ্যক তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ যে কার্য সমাধার জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় তাহা ফরয-ওয়াজিব না হওয়া। কারণ, ফরয-ওয়াজিব কার্যে প্রতিনিধিত্ব চলে না।

ধর্মযোদ্ধাকে বেতনের বিনিময়ে জিহাদে নিযুক্ত করা দুরস্ত নহে কেননা যুদ্ধের সারিতে দণ্ডায়মান হইলেই তাহার নিজের উপর যুদ্ধ করা ওয়াজিব হইয়া পড়ে। এই একই কারণে বিচারক ও সাক্ষীকে পারিশ্রমিক দেওয়া দুরস্ত নহে। তদ্রূপ কাহারও পক্ষ হইতে নামায পড়িবে অথবা রোযা রাখিবে-এই উদ্দেশ্যে বেতন দিয়া অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করা দুরস্ত নহে। কারণ, এবংবিধ কার্যে প্রতিনিধিত্ব চলে না। কিন্তু মা'যূর ও রোগী যাহার স্বাস্থ্যলাভের আশা নাই, এমন অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হইতে হজ্জ করিবার জন্য বেতন লওয়া দুরস্ত আছে। কুরআন শরীফ ও ধর্মপথে সহায়ক বিদ্যা শিক্ষার জন্য পারিশ্রমিক প্রদানে শিক্ষক নিযুক্ত করাও দুরস্ত আছে। কবর খনন করা, মৃতকে গোসল দেওয়া এবং জানাযা বহন করিয়া কবরের দিকে নেওয়া ফরযে কিফায়া হইলেও এই সমস্ত কার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত আছে।

তারাবীহ-নামাযের ইমামতি ও মুয়াযযিনের কার্যের জন্য বেতন গ্রহণ করা সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে বটে; কিন্তু এই সকল কার্যের জন্য বেতন গ্রহণ করা একেবারে হারাম নহে। কারণ, নামায পড়ান ও আযানের বিনিময়ে তাঁহাদিগকে বেতন দেওয়া হয় না; বরং ঠিক সময়মত পরিশ্রম করিয়া নামাযের স্থানে যে তাঁহারা আগমন করিয়া থাকেন ইহার বিনিময়েই তাঁহাদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইয়া থাকে। মোটকথা, এই সমস্ত কার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম না হইলেও ইহা মাক্‌রূহ ও সন্দেহযুক্ত।[১]

পঞ্চম শর্ত ঃ পরিশ্রম কি পরিমাণ হইবে, পূর্বেই ইহা নির্ণয় করিয়া লওয়া। বোঝা বহনের জন্য বাহন-পশু ভাড়া করিতে হইলে বোঝার মালিক জন্তুটি এবং পশুর মালিক বোঝাটি দেখিয়া লইবে। পশুর মালিক আরও জানিয়া লইবে, বোঝার ওজন কত, প্রত্যহ কি পরিমাণ পথ অতিক্রম করিতে হইবে এবং পশুর পৃষ্ঠে কখন বোঝা উঠান হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রচলিত প্রথা সকলের জানা থাকিলে তত বুঝা-পড়া না করিলেও চলিবে।

ভূমি ইজারা লইবার সময় ইহাতে কি শস্য বপন করিবে তাহাও বলিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, চিনা-কাউন বপন করিলে উহা গম অপেক্ষা জমির উর্বরতা অধিক হ্রাস করে। কিন্তু দেশে সচরাচর যে শস্য বপন করা হইয়া থাকে সেই প্রচলিত প্রথা সর্বজনবিদিত থাকিলে শস্যবিশেষের বপন-চুক্তি না করিলেও চলিতে পারে।

মোটকথা, প্রত্যেক প্রকার ইজারা কার্যের চুক্তি উভয় পক্ষের নিকট পরিষ্কাররূপে বোধগম্য ও বিদিত হওয়া আবশ্যক যেন ভবিষ্যতে ইহা লইয়া পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন

১. হানাফী মাযহাব মতে একান্ত জরুরী অবস্থায় মুয়ায্যিন পারিশ্রমিক লইতে পারেন। তারাবীহ নামাযে কুরআন শরীফ শুনাইবার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা হাফিযগণের জন্য দুরস্ত নহে। বিনা বেতনে হাফিয না পাওয়া গেলে ছোট ছোট সূরা দিয়া নামায পড়াই উত্তম।

প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদের আশংকা না থাকে। যে ইজারা চুক্তি অস্পষ্ট থাকার দরুন ভবিষ্যতে বিবাদ ঘটিবার আশংকা থাকে, এইরূপ ইজারা সিদ্ধ নহে।

কুরায অর্থাৎ পূঁজি দিয়া অপর কর্তৃক কারবার চালান। ইহার তিনটি অংশ আছে-(ক) পূঁজি, (খ) লাভ ও (গ) কারবারের শ্রেণী।

(ক) পূঁজি নগদ হওয়া আবশ্যক; যেমনঃ স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি প্রচলিত মুদ্রা। রৌপ্যের পাত, বস্ত্র অথবা অপর জিনিস-পত্র পূঁজিস্বরূপ দেওয়া উচিত নহে। পূঁজির ওজন ও পরিমাণ পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক এবং যে ব্যক্তিকে কারবার চালাইবার জন্য নিযুক্ত করা হয় তাহার হাতে পূঁজি দিয়া দিতে হইবে। মূলধনের মালিক নিজের নিকট পূঁজি রাখিবার শর্ত করিলে দুরস্ত হইবে না।

(খ) কুরায কারবারে যাহা লাভ হইবে ইহার কত অংশ পুঁজিপতি পাইবে এবং কত অংশ কার্যকারক পাইবে তাহা পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। যথা ঃ আধাআধি, এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, লাভের টাকা হইতে পূঁজিপতি বা কার্যকারক এত টাকা অগ্রে উঠাইয়া লইয়া পরে অবশিষ্ট টাকা তাহাদের মধ্যে অংশ অনুপাতে ভাগ করা হইবে, তবে কারবার দুরস্ত হইবে না।

(গ) কুরায কারবার কোন প্রকার বাণিজ্য অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক; কোন প্রকার হস্ত শিল্প হইলে চলিবে না। রুটি-ব্যবসায়ীকে গম মূলধনস্বরূপ দিয়া যদি বলা হয়, "তুমি ইহাদ্বারা রুটি প্রস্তুত কর, যাহা লাভ হইবে তাহা আমরা নির্দিষ্ট হারে ভাগ করিয়া লইব"-তবে এরূপ কারবার দুরস্ত নহে। অনুরূপ চুক্তিতে তেলীকে তিল বা সরিষা প্রদান করাও দুরস্ত নহে। কারবারে এইরূপ শর্ত আরোপ করাও দুরস্ত নহে যে, অমুক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে বা অমুক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারিবে না। যে শর্ত ব্যবসায়কে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ শর্ত আরোপ করা দুরস্ত নহে।

ব্যবসায়ের জন্য অপরকে পুঁজি প্রদানের নিয়ম এই যে, পুঁজিপতি বলিবে ঃ "ব্যবসায়ের জন্য আমি তোমাকে এই মূলধন দিলাম; লভ্যাংশ আমরা আধাআধি বন্টন করিয়া লইব।" উত্তরে ব্যবসায়ী বলিবে ঃ "আমি শর্ত স্বীকার করিলাম।" ব্যবসায়ী এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সে পুঁজিপতির প্রতিনিধি হইল। যখন ইচ্ছা তখনই পুঁজিপতি কারবার ভঙ্গ করিতে পারে। পুঁজিপতি কারবার ভঙ্গ করিবার সময় লভ্যাংশসহ সমস্ত মাল নগদ থাকিলে লভ্যাংশ বন্টন করিয়া লইবে। কিন্তু মাল পণ্যদ্রব্য হইলে ও ইহাতে কোন লাভ না হইলে ব্যবসায়ী সমস্ত মাল পুঁজিপতিকে দিয়া দিবে এবং এই পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা ব্যবসায়ীর কর্তব্য নহে। বিক্রয় করিতে চাহিলেও ইহাতে নিষেধ করা পুঁজিপতির জন্য দুরস্ত আছে। তবে তখন যদি এমন কোন খরিদ্দার পাওয়া যায়, যে লাভ দিয়া সমস্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে, তবে পুঁজিপতি উক্ত দ্রব্য বিক্রয়ে বাধা প্রদান করিতে পারে না। মাল পণ্যদ্রব্য

হইলে এবং লাভ দাঁড়াইলে মূলধনের পরিমাণ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলা ব্যবসায়ীর প্রতি ওয়াজিব। তদতিরিক্ত বিক্রয় করা উচিত নহে। মাল বিক্রয় করতঃ মূলধন উদ্ধারপূর্বক লভ্যাংশের পণ্যদ্রব্য উভয়ে ভাগ করিয়া লইবে। এই লভ্যাংশের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ব্যবসায়ীর প্রতি ওয়াজিন নহে।

পণ্যদ্রব্যের উপর এক বৎসরকাল অতীত হইয়া গেলে যাকাত প্রদানের জন্য সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা কর্তব্য। ব্যবসায়ীর নিজ অংশের যাকাত প্রদান করা তাহার উপরই ওয়াজিব।

পুঁজিপতির অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়ী কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া কোথাও সফরে যাইতে পারিবে না। গেলে ইহাতে কারবারে যে ক্ষতি হইবে ব্যবসায়ীকে এই ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। কিন্তু পুঁজিপতির অনুমতি লইয়া সফর করিলে ওজন ও ঢোলাই খরচ, কারবারদারীর ব্যয় এবং দোকানের ভাড়া যেমন কারবারের তহবিল হইতে লওয়া হয়; তদ্রূপ পথ খরচও কারবারের তহবিল হইতে লওয়া যাইবে। সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে দস্তরখান, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি যাহা কিছু ব্যবসায়ের মাল হইতে খরিদ করা হইয়াছিল তৎসমূদয়ই কারবারের মালের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

শরীকি কারবার ঃ পুঁজির অংশ দিয়া ভাগে করবার করা। যে কারবারে দুই ব্যক্তির মূলধন থাকে, সেখানে উভয় অংশীদারের একজন অপরজনকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া থাকে। উভয়ের মূলধন সমান সমান হইলে লভ্যাংশ উভয়ে সমান সমান ভাগ করিয়া লইবে। মূলধন কমবেশী হইলে মূলধনের অংশ হিসাবে লভ্যাংশ ভাগ করিতে হইবে। মূলধন ফিরাইয়া লওয়ার শর্ত করা দুরস্ত নহে। অধিক পরিশ্রমের জন্য অধিক লভ্যাংশ পাওয়ার শর্ত করাও দুরস্ত আছে। এতদ্ভিন্ন আরও তিন প্রকার শরীকি কারবার দেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু এইগুলি দুরস্ত নহে; যেমন ঃ

প্রথম প্রকার ঃ শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের শরীকি কারবার। শ্রমিক ও ব্যবসায়ী যদি এইরূপ চুক্তি করে-'আমরা একত্রে যাহা উপার্জন করিব তাহা সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইব'-তবে এইরূপ চুক্তি জায়েয নহে। কারণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রমলব্ধ অর্থের মালিক।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ মুফাওয়াযা অর্থাৎ দুই ব্যক্তি তাহাদের নিজ নিজ সম্বল যাহা কিছু আছে সম্মুখে উপস্থিত করত ঃ মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ ব্যতীত যদি এইরূপ চুক্তি করে-'যাহা কিছু লাভ-লোকসান হয় আমরা উভয়ে তাহা সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইব'-তবে এইরূপ চুক্তিও জায়েয নহে।

তৃতীয় প্রকার ঃ দুইজনের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থশালী এবং অপর ব্যক্তি পদমর্যাদার অধিকারী। অর্থশালী ব্যক্তি পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির কথায় বিক্রয় করিলে যে লাভ হইবে সেই লাভের টাকা উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইবে; এইরূপ চুক্তিও দুরস্ত নহে।

ব্যবসায় সম্পর্কে উপরে যাহা বর্ণিত হইল এই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব। কারণ, সচরাচর উহার দরকার পড়ে। উপরিউক্ত কারবারসমূহ ব্যতীত অন্য প্রকার কারবারও আছে; তবে উহা সচরাচর দেখা যায় না। উল্লিখিত পরিমাণ জ্ঞানার্জন হইলে কারবারে অন্য অবস্থা যখন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন আলিমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া যাইবে। আর উক্ত পরিমাণ জ্ঞানার্জন না করিলে হারামে পতিত হইতে হইবে; অথচ ব্যবসায়ী জানিতে পারিবে না যে, সে হারামে পতিত রহিয়াছে। পরকালে অজ্ঞতার ওযর পেশ করিলে কোনই উপকার হইবে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ব্যবসায়ে (মু আমলায়) ন্যায়নীতি সুবিচার সংরক্ষণ ঃ উপরে প্রকাশ্য শরীয়ত অনুযায়ী কায়-কারবার দুরস্ত হওয়ার শর্তাবলী বর্ণিত হইয়াছে। এমন বহু কারবার আছে যাহা বাহ্যভাবে জায়েয আছে বলিয়া ফত্ওয়া দেওয়া হয় বটে; কিন্তু ঐ সকল ব্যবসায়ী আল্লাহ্র নিকট অভিশপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল কারবারে মুসলমানগণের দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতি হয়, উহাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর করবার দুই ভাগে বিভক্ত; ব্যাপক (আম) ও সীমাবদ্ধ (খাস)। ব্যাপকগুলি আবার দুই প্রকার; যথাঃ মজুদদারী ও অচল বা মেকী মুদ্রার প্রচলন।

মওজুদদারী ঃ ইহা হইল খাদ্যশস্য ক্রয় করতঃ মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে মজুদ করিয়া রাখা। যে ব্যক্তি ইহা করে তাহাকে 'মুহতাকীর' বলে এবং মুহতাকীর অভিশপ্ত।

হাদীসে মজুদদারীর নিন্দা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ খাদ্যশস্য দুর্মূল্য হইলে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন উহা আটকাইয়া রাখে সে সেই সমস্ত খাদ্যশস্য গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেও এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখে আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং সে আল্লাহ্র প্রতি অসন্তুষ্ট।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য চল্লিশ দিন গোলাজাত করিয়া রাখিবে তাহার হৃদয় অন্ধকার হইয়া যাইবে। একবার এক মজুদদার সম্বন্ধে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি বলেন ঃ ইহাতে আগুন লাগাইয়া দাও।

হাদীসে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের ফযীলত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করতঃ অন্যত্র নিয়া তথাকার বাজার দরে বিক্রয় করে সে যেন একটি কৃতদাসী বা কৃতদাসকে আযাদ করিয়া দিল।

কাহিনী ঃ পূর্বকালীন জনৈক বুযর্গ তাঁহার এক প্রতিনিধিকে বিক্রয়ের জন্য কিছু খাদ্যশস্য দিয়া বসরায় প্রেরণ করেন। সে তথায় পৌছিয়া দেখিল সেখানে খাদ্যশস্য খুব সস্তা। তাই সে সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়া দ্বিগুণ মূল্যে উহা বিক্রয় করিল এবং এই সংবাদ পত্র দিয়া উক্ত বুযর্গকে জানাইল। উত্তরে তিনি জানাইলেন ঃ ধর্ম রক্ষা করিয়া যে সামান্য লাভ হয় তাহাতেই আমি পরিতুষ্ট। অধিক লাভের বিনিময়ে তুমি ধর্ম খোয়াইয়া দিলে ইহা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই। তুমি বড় গুনাহের কাজ করিলে। এখন সমস্ত অর্থ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা তোমার উচিত। তবুও বোধ হয় তজ্জন্য পরকালে আমাদের উভয়কেই লজ্জিত হইতে হইবে।

মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ঃ মজুদদারী হারাম হওয়ার কারণ এই যে, ইহাতে আল্লাহ্র বান্দাগণের কষ্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। কেননা খাদ্যদ্রব্য হইতেই মানুষ জীবনীশক্তি লাভ করিয়া থাকে। লোকে বিক্রয় করিলে সকলেই ইহা খরিদ করিতে পারে। এক ব্যক্তি সমস্ত শস্য ক্রয়পূর্বক আটক করিয়া রাখিলে অবশিষ্ট সকলেই ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। ইহা সর্বসাধারণের ভোগাধিকারের পানি আটক রাখিয়া লোকজনকে পিপাসায় কাতর করতঃ তৎপর এই পানি অধিক মূল্যে ক্রয়ে বাধ্য করার তুল্য। এই উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য খরিদ করিয়া রাখা পাপ। কিন্তু কৃষক নিজের ক্ষেতের শস্য যখন ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে; শীঘ্র বিক্রয় করা তাহার উপর ওয়াজিব নহে। তবে বিলম্ব না করাই উত্তম। কিন্তু কৃষক যদি অন্তরে এইরূপ আশা পোষণ করে যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি হউক. তবে তাহার এইরূপ অভিপ্রায় অবশ্যই নিন্দনীয়।

ঔষধ-পত্র ও অন্যান্য জিনিস যাহা খাদ্য নহে এবং সচরাচর যাহা প্রয়োজন হয় না, উহা অধিক মূল্যের সময় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখিয়া দেওয়া হারাম নহে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য মজুদ করিয়া রাখা হারাম। ঘৃত, তৈল, গোশ্ত ইত্যাদি যে সকল জিনিস আবশ্যকতার দিক দিয়া খাদ্যশস্যের প্রায় নিকটবর্তী, উহা উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা সম্বন্ধে আলিমগণের মতভেদ আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, তাহাও দোষমুক্ত নহে। তবে উহা খাদ্যশস্য মজুদ রাখা তুল্য নহে।

খাদ্যশস্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিলেই উহা মজুদ করিয়া রাখা হারাম। কিন্তু যেখানে সকলেই সহজে খাদ্যশস্য পাইতে পারে সেখানে মজুদ করা হারাম নহে। কারণ, তখন মওজুদ করিলে কাহারও কোন অনিষ্ট হয় না। কোন কোন আলিম তখনও খাদ্যশস্য মজুদ করিয়া রাখা হারাম বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ মত এই যে, তদ্রূপ অবস্থাও খাদ্যশস্য মওজুদ করিয়া রাখা মাকরূহ। কেননা এমতাবস্থায়ও মজুদ করিয়া অন্তরে

মূল্য বৃদ্ধির কিছু না কিছু আশা লুক্কায়িত থাকে এবং মানবের দুঃখ-কষ্টের প্রতীক্ষায় থাকা নিন্দনীয়।

দুই প্রকার ব্যবসায়কে পূর্বকালীন বুযর্গগণ মাকরূহ বলিয়া মনে করিতেন। ইহাদের একটি খাদ্যশস্যের ব্যবসায় ও অপরটি কাফন বিক্রয়। কারণ, লোকের কষ্ট ও মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকা নিন্দনীয়। আরও দুই প্রকার ব্যবসায়কে তাঁহারা মন্দ জানিতেন। ইহাদের একটি কসাইয়ের ব্যবসায়। ইহা হৃদয়কে কঠিন করিয়া তোলে। অপরটি স্বর্ণকারের ব্যবসায়। কারণ, ইহাতে দুনিয়ার সাজসজ্জা রহিয়াছে।

মেকী-মুদ্রার প্রচলন ঃ লেনদেনে মেকী মুদ্রা প্রদান করিলে জনসাধারণের কষ্ট হইয়া থাকে। মেকী মুদ্রা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিকে মেকী মুদ্রা দিলে তাহার উপর অত্যাচার করা হয়। পক্ষান্তরে চিনিয়া মেকী মুদ্রা গ্রহণ করিলে সম্ভব যে, সে অপরকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহা গ্রহণ করিয়াছে। পরবর্তী ব্যক্তি আবার অপর ব্যক্তির সহিত প্রতারণা করিবে এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রতারণা চলিতে থাকিবে। মেকী মুদ্রা ব্যবহার করিয়া যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম অপরকে প্রতারিত করিবার সূত্রপাত করিয়াছে, পরবর্তীকালের সকল প্রতারণার পাপ সেই মেকী মুদ্রা ব্যবহারকারীর উপর বর্তিবে। এইজন্যই জনৈক বুযর্গ বলেন ঃ একটি মেকী টাকা অপরকে দেওয়া একশত টাকা চুরি করা অপেক্ষা মন্দ। কারণ, চুরির পাপ চুরির সময়েই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু মেকী প্রচলনের পাপ ইহা প্রচলনকারীর মৃত্যুর পরও যাহার পাপ-স্রোত বন্ধ হয় না-সে বড়ই দুর্ভাগ্য। মেকী মুদ্রা প্রবর্তনের পাপ শত শত বৎসর ধরিয়া চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং এই মেকী মুদ্রা যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়াছিল মৃত্যুর পরেও কবরে ইহার শাস্তি তাহার উপর বর্তিতে থাকিবে।

মেকী মুদ্রা সম্বন্ধে চারিটি অবশ্য কর্তব্য বিষয় ঃ

১. মেকী মুদ্রা হস্তগত হওয়ামাত্র ইহা কূপে নিক্ষেপ করিবে। মেকী বলিয়া জানাইয়া দিয়াও ইহা কাহাকেও দিবে না। কারণ, সে হয়ত অপরকে ঠকাইতে পারে।

২. মুদ্রা যাঁচাইয়ের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়কারীর উপর ওয়াজিব। মেকী মুদ্রা গ্রহণে বিরত থাকিবার উদ্দেশ্যে এই জ্ঞানার্জন ওয়াজিব নহে; বরং মেকী মুদ্রা অজ্ঞাতসারে তাহার হাতে পড়িলে অপরে প্রতারিত হইতে পারে এবং অপর মুসলমানের হক নষ্ট হইতে পারে, এই জন্যই এই জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব। মুদ্রা যাঁচাইয়ের স্থানের অভাবে অচল মুদ্রা তাহার হাত হইতে অপরের হাতে চলিয়া গেলে সে পাপী হইবে। কারণ, যে ব্যক্তি যে ব্যবসায় অবলম্বন করে তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞানার্জন করা তাহার উপর ওয়াজিব।

৩. লেনদেন সহজ করিবার উদ্দেশ্যে মেকী মুদ্রা গ্রহণ ভাল কাজ বটে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ اَمْرًا سَهَّلَ الْقَضَاءَ وَسَهَّلَ الْاِقْتِضَاءَ-

যে ব্যক্তি লেনদেন সহজ করিয়া থাকে আল্লাহ্ তাহার উপর দয়া করুন।

কিন্তু কূপে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যেই মেকী মুদ্রা গ্রহণ করিতে হইবে। মেকী মুদ্রা গ্রহণকারীর মনে যদি এই আশংকা থাকে যে, গ্রহণ করিলে খরচ করিয়া ফেলিবে (বা অন্যকে প্রদান করিবে) তবে মেকী মুদ্রা প্রদানকারী 'অচল' বলিয়া পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিলেও ইহা গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।

৪. যে মুদ্রায় স্বর্ণ-রৌপ্যের লেশমাত্রও নাই তৎসম্পর্কেই উপরিউক্ত বিধান প্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু যে মুদ্রায় অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য রহিয়াছে তাহা কূপে নিক্ষেপ করা ওয়াজিব নহে। যে মুদ্রায় অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য রাহিয়াছে তাহা লেনদেনে ব্যবহার করিলে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব। (ক) ইহা যে মেকী মুদ্রা তাহা পরিষ্কাররূপে অপরকে জানাইয়া দিতে হইবে, গোপন করা যাইবে না। (খ) যাহার বিশ্বস্ততায় পূর্ণ আস্থা আছে কেবল তাহাকেই মেকী মুদ্রা দিবে যেন সে অপরের সহিত প্রতারণা না করে। যদি জানা যায় যে, যাহাকে মেকী মুদ্রা দেওয়া হইতেছে সে অপরকে দেওয়ার সময় এই কথা জানাইবে না, তবে তাহাকে এইরূপ মুদ্রা দেওয়া আর জ্ঞাতসারে মদ্য প্রস্তুতকারকের নিকট আঙ্গুর এবং ডাকাতের নিকট অস্ত্র বিক্রয় করা সমান কথা। এই সমস্ত কার্যই হারাম। কারবারে বিশ্বস্ততা রক্ষা করা কঠিন বলিয়া পূর্বকালীন বুযর্গগণ বলেন ঃ বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আবিদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সীমাবদ্ধ ক্ষতি ঃ যাহার সহিত কারবার করা হয় এই ক্ষতি কেবল তাহার সহিতই সীমাবদ্ধ। যে কারবারে কোন প্রকার ক্ষতি করা হয় ইহাই যুলুম (অত্যাচার) এবং যুলুমমাত্রই হারাম। মোটকথা, তুমি অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পছন্দ কর না তদ্রূপ ব্যবহার অপর মুসলমানের প্রতিও করিও না। যে ব্যক্তি যে কাজ নিজের জন্য পছন্দ করে না সে অপর মুসলমানের জন্য ইহা পছন্দ করিলে তাহার ঈমান অসম্পূর্ণ। চারি প্রকার আচরণে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম আচরণ ঃ নিজ পণ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিবে না। এইরূপ প্রশংসা করিলেই মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ এবং অত্যাচার করা হইয়া থাকে। ক্রেতা পূর্ব হইতেই অবগত থাকিলে দ্রব্য সম্বন্ধে সত্য প্রশংসাও করিবে না, কারণ ইহা অনর্থক। আল্লাহ বলেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ-

মানুষ যে কথাই বলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কেন বলিয়াছিলে ?

অনর্থক কথা বলিয়া থাকিলে এ সম্পর্কে কোন ওযর-আপত্তিই গ্রাহ্য হইবে না। মিথ্যা শপথ করা কবিরা গুণাহ্। শপথ সত্য হইলেও সামান্য ব্যাপারে আল্লাহ্র নাম

লইয়া শপথ করা বেআদবী। হাদীস শরীফে আছে ঃ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ– (আল্লাহ্‌র কসম, ইহা ঠিক নহে এবং আল্লাহ্‌র কসম ইহাই ঠিক বলিয়া কসম করার দরুন ব্যবসায়ীদের জন্য আফ্‌সোস) আর শিল্পী ও কারিগরদের জন্য এই কারণে আফ্‌সোস যে, তাহারা আজ নয়, কাল নয় পরশু' বলিয়া টাল-বাহানা করে। হাদীস শরীফে উক্তি আছে ঃ যে ব্যক্তি কসম খাইয়া নিজের দ্রব্য বিক্রয় করে, কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।

কথিত আছে, ইউনুস ইব্‌ন উবাইদ রেশমের ব্যবসা করিতেন এবং তিনি কখনও ইহার প্রশংসা করিতেন না। একদিন তিনি রেশম বাহির করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার এক শিষ্য ক্রেতার সম্মুখে বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে বেহেশ্‌তের পোশাক দান করিও। ইহা শুনিয়া ইউনুস ইব্‌ন উবাইদ আর রেশম বাহির করিলেন না এবং রেশমের গাঠরী নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মোটকথা, রেশম বিক্রয় করিলেন না। তিনি আশংকা করিলেন, পাছে শিষ্যের উক্ত বাক্য তাঁহার পণ্যের প্রশংসা বলিয়া গণ্য হয়।

দ্বিতীয় আচরণ ঃ নিজ পণ্যের দোষ-ত্রুটি ক্রেতার নিকট গোপন করিবে না, প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দিবে। দোষ গোপন করিলে প্রতারক, উপদেশ-বিমুখ, অত্যাচারী ও পাপী হইবে। ভাঁজকরা কাপড়ের কেবল মুখপাত দেখাইলে অথবা ভাল বিবেচিত হওয়ার জন্য অন্ধকারে কাপড় দেখাইলে কিংবা জুতা ও মোজার ভাল পাটখানা দেখাইলেও অত্যাচারী ও প্রতারক বলিয়া গণ্য হইবে।

একদা এক গম ব্যবসায়ীর দোকানের নিকট দিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) যাইতেছিলেন। তিনি স্তূপে তাঁহার পবিত্র হস্ত ঢুকাইয়া দিয়া সিক্ততা উপলব্ধি করিলেন। তিনি ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহা কি? ব্যবসায়ী নিবেদন করিলেন ঃ 'ভিজা গম।' রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উহা বাহির করিয়া ফেল নাই কেন? مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا– যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

এক ব্যক্তি তিনশত দিরহাম মূল্যে একটি উট বিক্রয় করিল। উটটির পায়ে কিছু দোষ ছিল। হযরত ওয়াসেলা ইব্‌ন আস্‌কা (রা) নামক জনৈক সাহাবী নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রথমে তিনি তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি মনোযোগ দেন নাই। পরে তিনি জানিতে পারিয়া ক্রেতার পশ্চাতে ছুটিলেন এবং বলিলেন ঃ উটের পায়ে দোষ আছে। ক্রেতা ফিরিয়া আসিল এবং তিনশত দিরহাম বিক্রেতার নিকট হইতে ফেরত লইয়া তাহাকে উটটি দিয়া দিল। বিক্রেতা হযরত ওয়াসেলা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি এই কারবার কেন বিনষ্ট করিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, কোন দ্রব্যের দোষ গোপন করিয়া বিক্রয়

করা জায়েয নহে এবং অপর কেহ (উক্ত দোষ) জানিতে পারিয়া (ক্রেতাকে) না জানানও জায়েয নহে। উক্ত সাহাবী (রা) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন যে, আমরা মুসলামানদিগকে উপদেশ প্রদান করি এবং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখি; কিন্তু দোষ গোপন রাখা উপদেশ নহে।

এই জাতীয় কারবার বড় কঠিন ও অসাধারণ ব্যাপার। কিন্তু দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে উহা সহজ হইয়া পড়ে।

১. দোষযুক্ত জিনিস খরিদ করিবে না। কিন্তু খরিদ করা হইয়া থাকিলে ইহা বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ইহার দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জানাইয়া দিবার ইচ্ছা রাখিবে। কেহ তোমাকে ঠকাইয়া থাকিলে মনে করিবে এই ক্ষতি তোমার নিজের। এই ক্ষতি অন্যের উপর চাপাইবার ইচ্ছা করিবে না। নিজে যখন প্রতারকের উপর অভিশাপ প্রদান করিয়া থাক তখন নিজে আবার অপরের অভিশাপের পাত্র হইও না। মোটকথা, জানিয়া রাখ যে, প্রতারণা দ্বারা রুযী বৃদ্ধি পায় না; বরং মালের বরকত চলিয়া যায় এবং কারবারের উন্নতি রুদ্ধ হয়। প্রবঞ্চনা দ্বারা ক্রমান্বয়ে যাহা কিছু হস্তগত হয়, অকস্মাৎ এমন কোন ঘটনা ঘটে যে, ইহাতে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। কেবল প্রতারণা দ্বারা অর্জিত পাপের বোঝা মাথার উপর থাকিয়া যায়। এই ব্যক্তির অবস্থা সেই দুধওয়ালার ন্যায় যে প্রত্যহ পানি মিশাইয়া দুধ বিক্রয় করিত। অবশেষে একদিন প্রবল বন্যা আসিয়া তাহার গাভীটিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। ইহা দেখিয়া দুধওয়ালার পুত্র বলিল ঃ প্রত্যহ দুধের সহিত যে পানি মিশান হইত তাহা একত্রিত হইয়া আজ বন্যারূপে আসিয়া গাভীটিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, কারবারে অসততা প্রবেশ করিলে বরকত থাকে না। অল্প মাল হইতেই ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাওয়া বহু লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হওয়া এবং তদ্বারা অধিক মঙ্গল সাধিত হওয়াকেই বরকত বলে। এমন লোকও আছে, যে প্রচুর ধনের অধিকারী; কিন্তু এই ধনই তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে এবং এই ধনে সে মোটেই ভাগ্যবান হইয়া উঠে না। অতএব বরকত অন্বেষণ করা উচিত। ধন-বৃদ্ধি ও বরকত বিশ্বস্ততার দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে। বিশ্বস্ততার দরুন ধন-বৃদ্ধি হওয়ার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে, প্রত্যেকেই তাহার সহিত কারবার করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকে। ইহাতেই তাহার কারবারে খুব উন্নতি হইতে থাকে। আর যে ব্যক্তি প্রতারক বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, কেহই তাহার সহিত কারবার করিতে চাহে না।

২. গভীরভাবে চিন্তা করিবে-আমি একশত বৎসরের অধিক বাঁচিব না এবং পরকালের জীবন অসীম। অতএব, এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে ধন-দৌলত বৃদ্ধির লালসায় কেন পরকালের অনন্ত জীবন ধ্বংস করিব? এই চিন্তা সর্বদা জাগ্রত রাখিলে

প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্র ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। (কিন্তু) মানব ধর্মের উপর দুনিয়াকে প্রধান্য দিয়া থাকে, আর মুখে এই কলেমা উচ্চারণ করিয়া থাকে তখন আল্লাহ্ বলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। এই উক্তিতে তুমি সত্যবাদী নও।

প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা না করা শুধু ক্রয়-বিক্রয়েই ফরয নহে; বরং প্রত্যেক কায়-কারবার এবং শিল্পক্ষেত্রেই ফরয। মোটকথা, ধোকাবাজি সর্বক্ষণে ও সর্বস্থলে হারাম। নিজ তৈয়ারী দ্রব্যের দোষ গোপন করা কোন শিল্পীরই উচিত নহে। হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-কে রিফু (ছেঁড়া বস্ত্রের সংস্কার কার্য) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ রিফু কার্য করা উচিত নহে। তবে নিজ ব্যবহারের কাপড় রিফু করিতে পারে; বিক্রয়ের জন্য করা দুরস্ত নহে। যে ব্যক্তি ধোকা দেওয়ার জন্য রিফু করে সে পাপী হইবে এবং তাহার পারিশ্রমিক হারাম হইবে।

তৃতীয় আরচণ ঃ মাপ ও ওজনে থোকাবাজি না করা এবং ঠিকমত ওজন করা। আল্লাহ বলেন ঃ – وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ

যাহারা অপরকে দেওয়ার বেলায় কম মাপিয়া দেয় এবং নিজে গ্রহণ করিবার সময় বেশী মাপিয়া লয় তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

পূর্বকালীন বুযর্গগণের এই অভ্যাস ছিল যে, অপরের নিকট হইতে কিছু লওয়ার সময় তাঁহারা কিছু কম লইতেন ও অপরকে দেওয়ার সময় কিছু বেশী দিতেন এবং বলিতেন ঃ 'এই সামান্য পরিমাণ দ্রব্য আমাদের ও দোযখের মধ্যে আড়াল হইবে।' কারণ তাঁহারা ভয় করিতেন যে, পূরাপুরি ওজন করা সম্ভব নহে। তাঁহারা আরও বলিতেন ঃ আস্‌মান-যমীনের প্রশস্ততার ন্যায় বিরাট বেহেশ্ত যে ব্যক্তি অতি সামান্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে নিতান্ত বোকা। আর যে ব্যক্তি সামান্য বস্তুর বিনিময়ে ভালকে মন্দে পরিণত করে, সে অত্যন্ত মূর্খ।

রাসূলুল্লাহ (সা) খরিদের সময় বলিতেন ঃ মূল্য পরিমাণে ওজন করিও এবং একটু বেশী করিয়া মাপিয়া দিও। হযরত ফুযাইল (র) স্বীয় পুত্রকে একটি স্বর্ণমুদ্রা ওজন করত ঃ এক ব্যক্তিকে দিবার পূর্বে উহার কারুকার্যের মধ্যস্থিত ময়লা ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ বৎস! তোমার এই কাজ দুই হজ্জ ও দুই উমরা হইতে উৎকৃষ্ট। পূর্বকালীন বুযর্গগণ বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি অপরকে মাপিয়া দেওয়ার জন্য এক প্রকার এবং নিজে মাপিয়া লওয়ার জন্য অন্য প্রকার বাট্‌খারা ব্যবহার করে সে সর্বপ্রকার ফাসিক অপেক্ষা অধিক মন্দ। যে বস্ত্র ব্যবসায়ী খরিদ করিবার সময় ঢিলা এবং বিক্রয় করিবার সময় টানাটানি করিয়া মাপে তাহার অবস্থাও তদ্রূপ। যে হাড় গোশ্‌তের সহিত মাপিয়া দেওয়ার রীতি নাই, যে কসাই উহা গোশ্‌তের সহিত মাপিয়া

দেয় তাহার অবস্থাও সেই প্রকার। শস্যের সহিত স্বভাবতঃ যে পরিমাণ ধূলিবালি থাকে তদপেক্ষা অধিক ধূলিবালি মিশাইয়া যে ব্যক্তি শস্য বিক্রয় করে, সেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রকার সমস্ত কাজই হারাম।

কায়-কারবারে সকলের সহিত ইনসাফ করা ওয়াজিব। যেরূপ উক্তি নিজে শুনিলে মনে কষ্ট হয় তদ্রূপ উক্তি অন্যের প্রতি যে ব্যক্তি প্রয়োগ করে সে যেন কায়-কারবারে নিজের ও পরের মধ্যে তারতম্য করিল। মানুষ এই প্রকার পাপ হইতে তখনই পরিত্রাণ পাইবে, যখন কাজ-কারবারে স্বীয় ধর্ম-ভ্রাতার স্বার্থের উপর নিজ স্বার্থকে প্রধান্য না দিবে। ইহা কঠিন কাজ। এই জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا–

দোযখের উপর দিয়া অতিক্রম করিবে না, তোমাদের মধ্যে এরূপ কেহই নাই, ইহা তোমার প্রভুর সুনিশ্চিত বিধান। কিন্তু যাহারা পরহেযগারীর অধিক নিকটবর্তী তাহারা তাড়াতাড়ি মুক্তি পাইবে।

চতুর্থ আচরণ ঃ পণ্যদ্রব্যের দর-দস্তুর সম্বন্ধে কোন প্রকার ধোকাবাজী করিবে না এবং দর গোপন করিবে না। ব্যবসায়ীদের কাফেলা বাজারে পৌছিবার পূর্বে তাহাদের নিকট যাইয়া সস্তা দরে খরিদের উদ্দেশ্যে বাজার দর গোপন রাখিতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করিয়াছেন। কেহ এইরূপে খরিদ করিলে বিক্রেতা বিক্রয় বাতিল করিতে পারে। কোন বিদেশী ব্যবসায়ী যদি পণ্যদ্রব্য লইয়া বাজারে আগমনপূর্বক ইহার দর সস্তা দেখিতে পায় তখন যদি কেহ তাহাকে বলে যে, আমার নিকট মাল রাখিয়া যাও, উচ্চদরে বিক্রয় করিয়া দিব, তবে তাহাকে এইরূপ প্রলোভন দেখান সঙ্গত নহে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা নিষেধ করিয়াছেন। অপর লোকেও যেন তাহার দেখাদেখি তাহাকে সত্য ক্রেতা মনে করিয়া অধিক মূল্যে খরিদ করে, এই উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য বাজার দরের উর্ধ্ব মূল্যে বাহ্যতঃ খরিদ করিতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করিয়াছেন। ব্যবসায়ীর সহযোগে প্রথম ক্রেতার এই অপকৌশল প্রকাশিত হইয়া পড়িলে ক্রেতাগণ ক্রয় বাতিল করিতে পারে।

মাল বাজারে উপস্থিত করিলে এরূপ রীতি আছে যে, যাহারা প্রকৃত খরিদদার নহে তাহারা দর বাড়াইয়া দেয়। এইরূপ করা হারাম। তদ্রূপ যে সরলপ্রাণ ব্যক্তি বাজার দর সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ সস্তামূল্যে আপন মাল বিক্রয় করিতে উদ্যত হয়, তাহার নিকট হইতে মাল খরিদ করা দুরস্ত নহে। আর যে সরলপ্রাণ ব্যক্তি বাজার দর না জানিয়া অধিক মূল্যে খরিদ করিতে উদ্যত হয়, তাহার নিকট কিছু বিক্রয় করাও জায়েয নহে। এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় বাহ্যতঃ জায়েয বলিয়া ফত্‌ওয়া দেওয়া গেলেও প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ গুনাহগার হইবে।

সততার কাহিনী ঃ বস্‌রা নগরে এক সওদাগর ছিলেন। সুখনগর হইতে তাঁহার কর্মচারী তাহাকে পত্র লিখিল ঃ "ইক্ষু চাষ এবার দুর্দশাগ্রস্থ। অতএব অপর লোক এই সংবাদ পাওয়ার পূর্বে প্রচুর পরিমাণে চিনি কিনিয়া রাখুন।" উক্ত সওদাগর তদনুযায়ী অনেক চিনি খরিদ করিয়া রাখিয়া যথাসময়ে বিক্রয় করতঃ ত্রিশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা লাভ করিলেন। সেই সওদাগর ভাবিতে লাগিলেন ঃ একজন মুসলমানের সহিত ধোকাবাজি করিয়াছি এবং ইক্ষু চাষ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা তাহার নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছি। এইরূপ কাজ কিরূপে দুরস্ত হইবে? তৎপর উক্ত ত্রিশ হাজার মুদ্রা লইয়া তিনি চিনিওয়ালার নিকট গমন করতঃ বলিলেন ঃ এই ত্রিশ হাজার মুদ্রা আপনার। চিনিওয়ালা ইহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিলেন। চিনিওয়ালা বলিলেন ঃ ইহা আপনার জন্য হালাল করিয়া দিলাম। সওদাগর গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক রাত্রে চিন্তা করিলেন ঃ হয়ত চক্ষুলজ্জায় তিনি উহা বলিয়াছেন; আমি তো সত্যই তাঁহার সহিত দাগাবাজি করিয়াছি। পরদিবস তিনি পুনরায় ত্রিশ হাজার মুদ্রাসহ চিনিওয়ালার নিকট গমন করিলেন এবং বহু অনুনয়বিনয় করতঃ তাহাকে ইহা গ্রহণে বাধ্য করিলেন।

কেহ আসল খরিদমূল্য জানিতে চাহিলে তাহাকে সত্য কথা বলিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে ধোকা দেওয়া উচিত নহে। মালে দোষ-ত্রুটি থাকিলে তাহাও বলিয়া দিবে। কোন বন্ধুর নিকট হইতে বন্ধুত্বের খাতিরে তাহার পণ্য অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকিলে আসল মূল্য বলিবার সময় তাহাও বলিয়া দিবে। কোন জিনিসের মূল্য দশ দীনার বলিয়া ইহার পরিবর্তে কোন দ্রব্য দিলে এই দ্রব্য দশ দীনার মূল্যে বিক্রয় করা না গেলে ইহার খরিদ মূল্য দশ দীনার বলা উচিত নহে। সস্তায় মাল খরিদ করার পর দর বৃদ্ধি পাইলে পূর্ব মূল্য বলিয়া দিবে।

এই বিষয়ে বিবরণ অতি বিস্তৃত। ব্যবসায়িগণ ইহার বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে, অথচ ইহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করে না। মোটকথা, মানুষ নিজের জন্য যে প্রতারণা পছন্দ করে না, তদ্রূপ প্রতারণা অপরের জন্যও পছন্দ করা সঙ্গত নহে। নিজের কারবারী জীবনে এই কথাটিকে কষ্টি পাথরস্বরূপ করিয়া লইবে। আসল দাম অবগত হইয়া খরিদ করিলে লোকে এই মনে করিয়াই খরিদ করে যে, সে খুব যাঁচাই করিয়া খরিদ করিয়াছে। কিন্তু আসল দাম বলার মধ্যে দাগাবাজী করিলে ক্রেতা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। সুতরাং আসল দাম ঠিকমত না বলা দাগাবাজী বটে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

কারবারে পরোপকার ও মঙ্গল সাধন ঃ আল্লাহ যেমন ন্যায় বিচার করিতে আদেশ দিয়াছেন তদ্রূপ পরোপকার করিতেও নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ-

অবশ্যই আল্লাহ ন্যায় বিচার ও পরোপকার করিতে আদেশ করিয়াছেন।

পূর্ব অনুচ্ছেদে ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যেন লোকে অত্যাচার করা হইতে বিরত থাকে। অত্র অনুচ্ছেদে পরোপকার সম্বন্ধে বর্ণিত হইবে।

আল্লাহ বলেন ঃ– إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ-

অবশ্যই আল্লাহ্‌র রহমত পরোপকারিগণের নিকটবর্তী।

যে ব্যক্তি কেবল ন্যায়বিচার করিয়াছে সে ধর্মের মূলধন রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু কারবারের প্রকৃত লাভ রহিয়াছে পরোপকারে। যে ব্যক্তি কোন কারবারে পারলৌকিক মঙ্গললাভে বিরত থাকে না, সেই বুদ্ধিমান। এমন মঙ্গল সাধনকেই পরোপকার বলে যাহাতে প্রতিপক্ষ উপকৃত হয়। ইহা তোমার উপর ওয়াজিব নহে কিন্তু পুণ্যকাজ। ছয় প্রকারে ইহ্‌সান অর্থাৎ পরোপকারের সোপানে উন্নীত হওয়া যায়।

প্রথম ঃ ক্রেতা প্রয়োজনবশতঃ অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে সম্মত হইলেও বেশি লাভ করা সঙ্গত মনে করিবে না। হযরত সির্রী সাকতী (র) ব্যবসা করিতেন। তিনি শতকরা পাঁচের অধিক লাভ করা সঙ্গত মনে করিতেন না। একবার তিনি ষাট দীনার মূল্যের বাদাম খরিদ করেন। তৎপর বাদামের মূল্য বৃদ্ধি পাইল। এক দালাল বাদামগুলি বিক্রয় করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন ঃ তেষট্টি দীনারে বিক্রয় করিবে। দালাল বলিলঃ বাজার দরে বাদামগুলির দাম বর্তমানে নব্বই দীনার। তিনি বলিলেন ঃ আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করিয়া লইয়াছি যে, শতকরা পাঁচের অধিক লাভ করিব না এবং এই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করা আমি সঙ্গত মনে করি না। দালাল বলিল ঃ আমি আপনার মাল বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করা সঙ্গত মনে করি না। মোটকথা, দালালও বিক্রয় করিল না এবং হযরত সির্রী সাকতী (র)-ও অধিক মূল্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না। ইহ্‌সানের দরজা এইরূপই হইয়া থাকে।

হযরত মুহম্মদ ইব্‌নে মুকান্দর (র) নামক এক বুযর্গ কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। তাঁহার নিকট কয়েক থান কাপড় ছিল। কোন থানের মূল্য ছিল দশ দীনার, আবার কোন থানের মূল্য পাঁচ দীনার। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার এক শাগরেদ পাঁচ দীনার মূল্যের একটি থান জনৈক বেদুঈনের নিকট দশ দীনার মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। ফিরিয়া আসিয়া ইহা অবগত হইলে তিনি সমস্ত দিন উক্ত বেদুঈনের অন্বেষণে ফিরিলেন। অবশেষে তাঁহাকে পাইয়া বলিলেন ঃ তুমি যে থানটি কিনিয়াছ ইহার মূল্য পাঁচ দীনারের অধিক নহে। বেদুঈন বলিল ঃ আমি সন্তোষের সহিতই ইহা দশ দীনারে খরিদ করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ আমি নিজের জন্য যে কাজ পছন্দ করি না তাহা

অপর মুসলমানের জন্য পছন্দ করিতে পারি না। হয় থানটি ফিরাইয়া দিয়া মূল্য ফেরত লও, না হয় পাঁচ দীনার ফেরত লও অথবা আমার সঙ্গে আস এবং দশ দীনারের উপযুক্ত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট থান গ্রহণ কর। শেষ পর্যন্ত বেদুঈন পাঁচ দীনার ফেরত নিতে বাধ্য হইল এবং তৎপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ঃ এই মহাপুরুষ কে ? সেই ব্যক্তি বলিল ঃ ইব্‌নে মুকান্দর। বেদুঈন বলিতে লাগিল ঃ সুবহানাল্লাহ, তিনিই কি সেই মহাপুরুষ, অনাবৃষ্টির সময় ইস্তিস্‌কা নামাযের জন্য ময়দানে না যাইয়া যাঁহার নাম লইলে বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হয়!

কম লাভে অধিক বেচাকেনা করা পূর্বকালীন বুযর্গগণের রীতি ছিল। বেশি হারে লাভ করা অপেক্ষা ইহাকেই তাঁহারা অধিক মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিতেন। হযরত আলী (রা) কূফার বাজারে হাঁটিয়া ঘোষণা করিতেন ঃ হে লোকগণ! অল্প লাভ প্রত্যাখ্যান করিয়া অধিক লাভে বঞ্চিত হইও না। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার অতুল ঐশ্বর্যের কারণ কি ? তিনি বলিলেন ঃ আমি অল্প লাভ প্রত্যাখ্যান করি নাই। কেহ আমার নিকট হইতে একটি প্রাণী ক্রয় করিতে চাহিলেও আমি তাহা অস্বীকার করি নাই; বরং বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। একদিন আমি এক হাজার উট আসল দামে বিক্রয় করিয়াছি এবং তাহাতে এক হাজার রজ্জু ব্যতীত আর কিছুই লাভ করি নাই। এক একটি রজ্জু এক-এক দিরহামে বিক্রয় করিয়াছি এবং উটগুলির সেই দিনের খাদ্য খরচের এক হাজার দিরহামের দায় হইতে আমি অব্যাহতি পাইয়াছি। সুতরাং দুই হাজার দিরহাম লাভ হইয়াছে।

দ্বিতীয় ঃ অভাবগ্রস্তদিগকে আনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের মাল চড়া দরে ক্রয় করিবে, যেমন বিধবাদের সূতা, শিশু ও ফকিরদের হাত হইতে বাজার ফেরত ফল ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে মূল্য না জানার ভান করিয়া দাম চড়াইয়া দেওয়া সদ্‌কা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ লাভ করিবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً سَهَّلَ الْبَيْعَ وَسَهَّلَ الشِّرٰى-

আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহমত করুন যে বিক্রয়কে সহজ করে এবং ক্রয়কে সহজ করিয়া দেয়।

কিন্তু ধনীদের নিকট হইতে অধিক মূল্যে খরিদ করিলে সওয়াবও হয় না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পায় না; বরং ইহাতে নিজের পয়সা নষ্ট করা হয়। দর কষাকষি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সস্তায় ক্রয় করা উত্তম।

হযরত ইমাম হাসান (রা) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রা) কোন দ্রব্য ক্রয়ের সময় খুব যাচাই করিতেন এবং সস্তায় ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেন। লোকে নিবেদন করিল ঃ আপনারা প্রত্যহ হাজার হাজার দিরহাম দীন-দুঃখীদিগকে দান করিয়া

থাকেন। এত সামান্যের জন্য আপনারা এত দরাদরি করেন কেন? তাঁহারা বলেন ঃ আমরা যাহা দান করি তাহা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দান করিয়া থাকি। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যত অধিকই দান করা হউক না কেন, তাহা নিতান্ত কম। কিন্তু বেচা-কেনায় ধোকা খাওয়া অর্থনাশ ও মূর্খতার কারণ হইয়া থাকে।

তৃতীয় ঃ মূল্য গ্রহণের সময় তিন প্রকারের পরোপকার হইতে পারে ঃ (১) মূল্য কিছু কম লওয়া, (২) ভাঙ্গা ও মেকী মুদ্রা গ্রহণ করা এবং (৩) মূল্য দেওয়ার জন্য কিছুকাল অবকাশ দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়কে সহজসাধ্য করিয়া থাকে, আল্লাহ্ তাহার উপর রহমত করুন। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি অপরের দেনা সহজ করিয়া থাকে আল্লাহ তাহার কার্যাবলী সহজ করিয়া থাকেন।

আদান-প্রদানে অভাবগ্রস্তকে সময় দেওয়ার অপেক্ষা অধিক উপকার আর কিছুই হইতে পারে না। সে রিক্তহস্ত হইলে তাহাকে সময় দেওয়া ওয়াজিব। ইহাকে ইহসান বলা চলে না; বরং ইহা ন্যায়-নীতির অন্তর্ভুক্ত। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি একেবারে রিক্তহস্ত না হইলেও তৎক্ষণাৎ মূল্য দিতে হইলে কোন দ্রব্য ঘাটতি মূল্যে বিক্রয় করা ব্যতীত অথবা নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় কোন জিনিস বিক্রয় ব্যতীত সম্ভব না হইলে তাহাকে সময় দিলে তৎপ্রতি ইহ্‌সান করা হয় এবং তৎসঙ্গে সদ্‌কার সওয়াবও পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামত দিবস এক ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হইবে। সে ধর্মের ব্যাপারে নিজের উপর অত্যাচার করিয়া থাকিবে এবং তাহার আমলনামায় কোন নেকী থাকিবে না। তাহাকে বলা হইবে, তুমি কখনই কোন নেকী কর নাই। সে বলিবে, হ্যাঁ, আমি করি নাই। কিন্তু আমার কর্মচারী ও গোমস্তাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, আমার নিকট ঋণী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হইলে সময় দিও এবং তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিও না। তখন করুণাসাগরে ঢেউ উঠিবে এবং করুণাময় আল্লাহ্ তাহাকে বলিবেন, অদ্য তুমি রিক্ত হস্ত এবং নিঃস্ব। তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করা আমার উচিত। এবং আল্লাহ্ তাহাকে মুক্তি দিবেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে (পরিশোধের) প্রতিশ্রুতিতে কাহাকেও কর্জ দেয়, তবে যত দিন অতিবাহিত হইতে থাকে, তত দিন সে সেই ব্যক্তিকে সদ্‌কা প্রদানের সওয়াব পাইতে থাকে। আর প্রতিশ্রুত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাকে সময় দিলে প্রত্যহ সে এত সওয়াব পাইতে থাকিবে যে, যেন সে কর্জের সমস্ত ধন সদ্‌কা করিয়া দিল।

পূর্বকালীন কতিপয় বুযর্গ ফেরত পাওয়ার আশা না করিয়া কর্জ দিতেন। কারণ, কর্জের পরিমাণ ধন সদ্‌কা করিলে যে সওয়াব পাওয়া যাইত সেই পরিমাণ সওয়াব যেন প্রত্যহ তাঁহাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বেহেশতের দরজায় লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি যে, সদ্কার প্রতিটি দিরহাম দশ দিরহামের সমান এবং কর্জের প্রতি দিরহাম আঠার দিরহামের সমান। ইহার কারণ এই যে, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই কর্জ লইয়া থাকে এবং সদ্কা হয়ত প্রকৃত অভাবগ্রস্থদের হাতে নাও পড়িতে পারে।

চতুর্থ ঃ কর্জ পরিশোধের সময় এইরূপে ইহসান হইতে পারে- বিনা তাগাদায় শীঘ্র পরিশোধ করিবে, নিখুঁত মুদ্রা পাওনাদারের বাড়িতে যাইয়া নিজ হাতে দিবে এবং তাহাকে তোমার বাড়িতে ডাকিয়া আনিবে না।

হাদীস শরীফে আছে ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে কর্জ পরিশোধ করে। হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে পরিশোধের নিয়্যতে কর্জ গ্রহণ করে আল্লাহ (তাহার জন্য) কতিপয় ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তাহারা তাহার হিফাযত করিয়া থাকে এবং তাহার কর্জ পরিশোধ হইয়া যাওয়ার জন্য দু'আ করিতে থাকে।

করযদার ক্ষমতা সত্ত্বেও পাওনাদারের সম্মতি ব্যতীত পরিশোধে একঘন্টাকাল বিলম্ব করিলেও সে অত্যাচারী ও পাপী হইবে। রোযায়, নামাযে, নিদ্রায় যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তাহার উপর আল্লাহ্র লা'নত পড়িতে থাকিবে। ইহা এমন পাপ যে, নিদ্রিত অবস্থায়ও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে না। কর্জ পরিশোধের ক্ষমতা থাকার অর্থ কেবল নগদ টাকা-পয়সা থাকাই নহে; বরং যদি এমন কোন জিনিস থাকে যাহা বিক্রয় করত ঃ কর্জ পরিশোধ করা যায়, তাহা বিক্রয় করিয়া পরিশোধ না করিলেও পাপী হইবে। খারাপ মুদ্রা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিলে পাওনাদার যদি অসন্তোষের সহিত গ্রহণ করে তবেও পাপী হইবে। তাহাকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত করযদার এই অত্যাচারের পাপ হইতে অব্যাহতি পাইবে না। ইহা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। লোকে ইহাকে নগণ্য বলিয়া মনে করে।

পঞ্চম ঃ কায়-কারবার করিয়া যে ব্যক্তি অনুশোচনা করে, তাহার সহিত কারবার ভঙ্গ করিয়া তাহার দ্রব্য ফিরাইয়া দিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুশোচনার কারণে) বেচাকেনা ভঙ্গ করে এবং মনে করে যে, আমি বেচাকেনাই করি নাই, আল্লাহ্ তাহার পাপকে এইরূপ মনে করিবেন যেন সে পাপই করে নাই।

এইরূপ স্থলে বেচাকেনা ভঙ্গ করা ওয়াজিব নহে। কিন্তু ইহা বড়ই সওয়াবের কাজ এবং ইহসানের অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ ঃ অতি সামান্য জিনিস হইলেও এই নিয়মে অভাবগ্রস্তের নিকট ধারে বিক্রয় করিবে যে, মূল্য পরিশোধের ক্ষমতা না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিকট চাহিবে না এবং অভাবগ্রস্ত অবস্থাই তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে মাফ করিয়া দিবে। পূর্বকালে কতক

লোক পাওনা টাকার স্মরণার্থে দুইটি খাতা রাখিতেন। একটি ছিল কেবল দরিদ্রের জন্য। ইহাতে তাহাদের কল্পিত নাম লিখিয়া রাখা হইত। আবার কতক লোক এইরূপ ছিলেন যাঁহারা দরিদ্রগণের নাম লিপিবদ্ধই করিতেন না। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহাদের মৃত্যুর পর যেন দরিদ্রের নিকট কেহই কিছু দাবী করিতে না পারে। প্রথমোক্ত লোকগণ উত্তম শ্রেণীর লোকের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেন না; বরং যাঁহারা দরিদ্রের নামের তালিকাই রাখিতেন না, তাঁহারা উত্তম শ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হইতেন। দরিদ্রগণ দিয়া দিলে গ্রহণ করিতেন। অন্যথায় তাহাদের নিকট হইতে পাওয়ার আশা রাখিতেন না। ধর্মপরায়ণ লোকদের কায়-কারবার এইরূপই হইয়া থাকে।

পার্থিব কায়-কারবারেই ধর্মপরায়ণ লোকগণকে তাঁহারা কোন স্তরে আছেন বুঝা যায়। আর ধর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত তাঁহারাই, যাঁহারা ধর্মের খাতিরে সন্দেহজনক একটি দিরহামের উপরও পদাঘাত করেন।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

পার্থিব ব্যাপারে ধর্মশক্তি ঃ পার্থিব কায়-কারবার যাহাকে পরকালের বিষয় হইতে উদাসীন করিয়া রাখে সে নিতান্ত হতভাগ্য। যে ব্যক্তি স্বর্ণ-পাত্রের বিনিময়ে মৃৎপাত্র গ্রহণ করে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে? দুনিয়া মৃৎপাত্রের ন্যায় মন্দ ও ক্ষণভঙ্গুর। পরকাল স্বর্ণ-পাত্রের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী, বরং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ব্যবসায় পরকালের পাথেয় হওয়ার উপযোগী নহে; বরং দুনিয়ার ব্যবসায় অবলম্বন করিলে দোযখের পথ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সকল চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হয়। ধর্ম ও পরকালই মানবের একমাত্র মূলধন। ইহা ভুলিয়া থাকা, ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া এবং কায়মনে ব্যবসায় ও কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত নহে। সাতটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে মানুষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।

প্রথম ঃ প্রত্যহ প্রাতে নেক নিয়্যত অন্তরে সম্বল করিয়া লইবে। এইরূপ নিয়্যত করিবে-নিজেকে ও নিজের পরিবারবর্গকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া না রাখার উদ্দেশ্যে উপার্জন করিবার জন্য আমি বাজারে যাইতেছি আর তাহাদের যেন লোভ না থাকে, শুধু এই পরিমাণ জীবিকা উপার্জনের ইচ্ছা করি। যেন, নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকিতে ও পরকালের পথে চলিতে পারি। আরও নিয়্যত করিবে- অদ্য আমি আল্লাহ্র বান্দাগণের সহিত সদয় ব্যবহার ও তাহাদের হিতসাধন করিব এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া চলিব। তৎসঙ্গে সৎকর্মে আদেশ এবং অসৎকর্মে প্রতিরোধের নিয়্যতও করিবে। তদুপরি এইরূপ নিয়্যতও করিবে যে, কেহ কোন পাপ করিলে

তাহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং উক্ত পাপ কার্যে তুমি সম্মত থাকিবে না। এই সমস্ত নিয়্যত পরকালের কার্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ধর্ম-কর্মে যে মুনাফা হইল তাহাই নগদ। তৎসঙ্গে পার্থিব যে লাভ হইল ইহাকে অতিরিক্ত লাভ মনে করিবে।

দ্বিতীয় ঃ অন্ততপক্ষে হাজার লোকের মধ্যে প্রত্যেকে তাহাদের কোন না কোন একটি জরুরী কার্য অবলম্বন না করিলে জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ, রুটি প্রস্তুতকারক, কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমার এবং অন্যান্য শিল্পী সকলেই নিজ নিজ কাজ করে বটে। কিন্তু প্রত্যেকের জরুরী অভাব পূরণের জন্য তাহাদের প্রত্যেকেই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সকলেই তাহার কাজ করুক, সকলের দ্বারাই তাহার উপকার হউক এবং অপর কেহই তাহার দ্বারা উপকৃত না হউক, এইরূপ মনোভাব সঙ্গত নহে। এই দুনিয়াতে সকলেই মুসাফিরের ন্যায় এবং একে অন্যের সাহায্য করা প্রত্যেক মুসাফিরের কর্তব্য। আর এইরূপ নিয়্যত করিবে ঃ আমি এই জন্য বাজারে যাই যে, অপর মুসলমান ব্যবসায়ী, তাঁতী, কৃষক, শিল্পী প্রভৃতির কাজ দ্বারা যেমন আমি উপকৃত হই, আমিও তদ্রূপ কোন না কোন কাজ করিব যদ্দারা অপর মুসলমান উপকৃত হয় এবং আরাম পায়। কারণ, সকল জরুরী পেশাই ফরযে কিফায়া (অর্থাৎ সকলের উপর ফরয; কিন্তু কেহ পালন করিলেই সকলে এই কর্তব্যের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পায়)। আর এই ফরযে কিফায়ার কোন না কোন একটি প্রতিপালন করিবার নিয়্যত করিবে। মানব জাতির যাহার আবশ্যকতা রহিয়াছে এবং যাহা না হইলে মানুষের কার্যে বিঘ্ন ঘটে, এমন কোন পেশা অবলম্বন করিলেই এই নিয়্যতের সততা প্রকাশ পায়। স্বর্ণকার, চিত্রকর, চূর্ণচিত্রকর এবংবিধ কোন শিল্পীর কাজ অবলম্বন করিলে উক্ত নিয়্যতের সততা প্রকাশ পায় না। কারণ, এই সমস্ত কার্যে দুনিয়ার সাজ-সজ্জা বৃদ্ধি পায় মাত্র, এইগুলির কোন আবশ্যকতা নাই। এই শ্রেণীর কার্য জায়েয হইলেও অবলম্বন না করাই ভাল, পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক ও স্বর্ণের অলঙ্কার তৈয়ার করাও হারাম।

নিম্নলিখিত পেশাসমূহকে পূর্বকালীন বুযর্গগণ মাকরূহ (ঘৃণ্য) বলিয়া মনে করিতেন। যথা ঃ (১) খাদ্য-শস্য বিক্রয়, (২) কাফন বিক্রয়, (৩) কসাইয়ের ব্যবসা, (৪) পয়সা লইয়া মুদ্রা ভাঙ্গাইবার কাজ; ইহাতে সুদ হইতে আত্মরক্ষা দুষ্কর, (৫) অস্ত্র চিকিৎসা, সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া অস্ত্রপচার করা হয়। ইহাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইজন্যই ইহা মাকরূহ, (৬) ঝাড়ুদাড়ি, (৭) প্রাণীর চর্ম পরিষ্কার করা; এই দুই কার্যে বস্ত্র পবিত্র রাখা কঠিন এবং ইহাতে মনের নীচতা প্রমাণিত হয়। (৮) রাখালী ও সহিস; ইহাও তদ্রূপ, (৯) দালালী, ইহার অবস্থাও তদ্রূপ। কারণ ইহা করিলে বেহুদা কথা হইতে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

হাদীস শরীফে আছে ঃ বস্ত্র-ব্যবসায় সর্বোৎকৃষ্ট তেজারত এবং সর্বোৎকৃষ্ট শিল্প সেলাই-কার্য অর্থাৎ চর্মের পোশাক সেলাই করা। হাদীস শরীফে উক্তি আছে ঃ বেহেশতে কোন ব্যবসায় থাকিলে বস্ত্র-ব্যবসায় থাকিত এবং দোযখে কোন ব্যবসা থাকিলে সররাফী অর্থাৎ পয়সা লইয়া মুদ্রা ভাঙ্গাইবার ব্যবসায় থাকিত।

চারিটি কাজকে লোকে নিচু বলিয়া মনে করে। যথা ঃ (১) বস্ত্রবয়ন, (২) তুলা বিক্রয়, (৩) সূতা কাটা ও (৪) শিক্ষকতা। শেষোক্ত কার্যটি নিচ বিবেচনা করার কারণ এই যে, শিক্ষকদিগকে সাধারণত ঃ অল্পবুদ্ধি ছাত্র-ছাত্রী লইয়া কাজ করিতে হয় এবং যে ব্যক্তি অল্পবুদ্ধি লোকদের সহিত মেলামেশা করে, তাহার বুদ্ধিও কমিয়া যায়।

তৃতীয় ঃ দুনিয়ার বাজার যেন আখিরাতের বাজার হইতে বিরত না রাখে। মসজিদই আখিরাতের বাজার। আল্লাহ বলেন ঃ

لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ –

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে বিরত রাখে না।

পার্থিব কার্যে লিপ্ত হইয়া আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া বড়ই ক্ষতির কারণ।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ হে ব্যবসায়িগণ! দিনের প্রথম অংশ পরকালের কাজের জন্য এবং শেষ অংশকে সাংসারিক কাজের জন্য নির্ধারিত করিয়া লও। পূর্বকালীন বুযর্গগণ সকাল-সন্ধ্যায় পরকালের কার্যে রত থাকিতেন, মসজিদে আল্লাহ্র যিকির ও ওজীফায় মগ্ন থাকিতেন অথবা ইলমের জলসায় উপস্থিত থাকিতেন। এই সময় লোকে মসজিদে উপস্থিত থাকিত বলিয়া বালক ও অমুসলমানগণ হারিসা ও খরভাজা বিক্রয় করিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ফেরেশতাগণ যে আমলনামা আসমানে লইয়া যায়, তাহাতে দিবসের প্রথমভাগে ও শেষভাগে কৃত মানবের নেক কাজ লিপিবদ্ধ থাকিলে ইহার মধ্যভাগে কৃত পাপ আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন। হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, দিবা-রাত্রির ফেরেশতা সকাল ও সন্ধ্যায় পরস্পর সাক্ষাত করিয়া প্রস্থান করে। আল্লাহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা আমার বান্দাকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিলে? তখন যদি তাহারা বলে, হে আল্লাহ! আসিবার সময় তাহাকে নামাযে রত দেখিয়াছি এবং যাইয়াও তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি, তবে আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম। সুতরাং আযান শোনামাত্র হাতের কাজ পরিত্যাগপূর্বক তৎক্ষণাৎ মসজিদে চলিয়া যাওয়া উচিত।

তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াতে যাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কর্মকারের ব্যবসা করিতেন, তিনি তপ্ত লৌহে আঘাত করিবার জন্য

হাতুড়ী উত্তোলন করিয়াছেন এমন সময় আযানের শব্দ শোনামাত্র আঘাত না করিয়া নামাযের জন্য ধাবিত হইতেন এবং চর্মকার চর্মের মধ্যে সূচ প্রবেশ করাইয়াছেন এমতাবস্থায় আযানের শব্দ শোনামাত্র সূচ বাহির না করিয়াই নামাযের জন্য ছুটিয়া যাইতেন।

চতুর্থ ঃ বাজারে অবস্থানকালেও আল্লাহ্‌র যিকির ও তাস্‌বীহ হইতে উদাসীন থাকিবে না এবং যথাসম্ভব হৃদয় ও মুখকে বেকার না রাখিয়া আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত রাখিবে। আর ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে যে, ক্ষণিকের জন্য আল্লাহ্‌র যিকির হইতে অমনোযোগী হইয়া যে লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে, সমগ্র পৃথিবীও ইহার তুলনায় অতি নগণ্য এবং গাফিলদের মধ্যে আল্লাহ্‌র যে যিকির হইয়া থাকে ইহার সওয়াব অত্যন্ত অধিক।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ গাফিলদের (অমনোযোগীদের) মধ্যে থাকিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী শুষ্ক বৃক্ষরাজির মধ্যে জীবন্ত সবুজ বৃক্ষ সদৃশ এবং মৃত লোকদের মধ্যে জীবিত ও যুদ্ধ পলাতক সৈন্যদের মধ্যে রণবিজয়ী বীর সৈন্য তুল্য। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে যাইয়া পড়ে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি একক; তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহারই সর্বব্যাপী আধিপত্য, সর্বপ্রকার প্রশংসা তাঁহারই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি চিরঞ্জীব, কখনই মরিবেন না। তাঁহারই হাতে যাবতীয় মঙ্গল এবং তিনিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।

- তাহার আমলনামায় হাজার হাজার সওয়াব লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে।

হযরত যুনাইদ বোগদাদী (র) বলেন ঃ বাজারে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা সূফীদিগকে কানে ধরিয়া উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের আসনে বসিবার উপযুক্ত। তিনি আরও বলেন ঃ আমি এমন ব্যক্তিকে চিনি যিনি বাজারে থাকিয়াও প্রত্যহ তিনশত রাকাত নফল নামায ও ত্রিশ হাজার তস্‌বীহ পড়িয়া থাকেন। আলিমদের মতে এই বাক্যে তিনি নিজেকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মোটকথা, যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তাড়না হইতে নির্মুক্ত থাকিয়া ধর্ম-কর্মে লিপ্ত থাকার উদ্দেশ্যে জীবিকা অর্জনের জন্য বাজারে গমন করেন, তিনি এইরূপই হইয়া থাকেন এবং জীবনের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র ইবাদত কখনই ভুলিয়া থাকেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য বাজারে যায়, তদ্দ্বারা এই মহান কার্য সম্পন্ন

হইতে পারে না; বরং সে মসজিদে নামায পড়িতে থাকিলেও তাহার মন পেরেশান এবং দোকানের হিসাব-নিকাশেই মশগুল থাকে।

পঞ্চম ঃ বাজারে অধিকক্ষণ থাকিবার ইচ্ছা করিবে না। সকলের আগে যাইয়া সকলের শেষে ফিরিয়া আসার নামই অধিকক্ষণ থাকা। দূর-দূরান্ত সফর বা সমুদ্রযাত্রা করিবে না। চরম লোভের বশবর্তী হইয়াই ব্যবসায় উপলক্ষে লোকে এই প্রকার সফর করিয়া থাকে। হযরত মু'আয ইব্‌ন যাবাল (রা) বলেন ঃ ইব্‌লীসের যলম্বুর নামক এক পুত্র আছে। পিতার প্রতিনিধিরূপে সে বাজারে বাজারে থাকে। ইব্‌লীস তাকে শিক্ষা দেয়, তুই বাজারে যাইয়া মানুষকে মিথ্যা, প্রতারণা, ফন্দি, দাগাবাজি ও কসম খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করিতে থাকিবি এবং যে ব্যক্তি সকলের আগে বাজারে যায় ও সকলের পরে ফিরিয়া আসে তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিবি।

হাদীস শরীফে আছে ঃ নিকৃষ্টতম স্থান বাজার এবং বাজারীদের মধ্যে যে সর্বাগ্রে বাজারে যায় ও সর্বশেষে তথা হইতে ফিরিয়া আসে সেই নিকৃষ্টতম। সুতরাং দোকানদারের নিজেদের উপর অবশ্য কর্তব্য করিয়া লওয়া উচিত যে, ইলমের মজলিস, প্রত্যুষের ওজীফা ও নামায সমাধার পূর্বে যেন তাহারা বাজারে না যায়। আর সেই দিনের ব্যয় নির্বাহপোযোগী লাভ হইলেই বাজার হইতে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। তৎপর পরকালের সম্বল সংগ্রহের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। কারণ পরকালের জীবন অতি দীর্ঘ ও ইহার সম্বলের আবশ্যকতাও অত্যাধিক এবং মানুষ পরকালের সম্বলে নিতান্ত রিক্তহস্ত ও নিঃস্ব।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র উস্তাদ হযরত হাম্মাদ ইব্‌ন সাল্‌মা (র) চাদরের ব্যবসা করিতেন। দুই হাব্বা পরিমাণ লাভ হইলেই তিনি দোকান- পাট বন্ধ করত ঃ গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। হযরত ইবরাহীম ইব্‌ন বিশার (র) হযরত ইবরাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম (র)-কে বলিলেন ঃ আমি অদ্য মাটির কাজে যাইতেছি। তিনি বলিলেন ঃ হে ইব্‌ন বিশার! তুমি জীবিকা অন্বেষণ কর, আর মৃত্যু তোমাকে অন্বেষণ করে। যে তোমাকে অন্বেষণ করে তাহার কবল হইতে তুমি রক্ষা পাইবে না। কিন্তু তুমি যাহা অন্বেষণ কর তাহা তুমি না-ও পাইতে পার। তবে তুমি হয়ত দেখিয়া থাকিবে যে, সচেষ্ট ব্যক্তি বঞ্চিত থাকে না এবং অলস ব্যক্তি জীবিকাপ্রাপ্ত হয় না। ইব্‌ন বিশার (র) বলেন ঃ আমি মাত্র এক দাঙ্গের মালিক। ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই। ইহাও আবার এক দোকানদারকে ধার দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম (র) বলেন ঃ তোমার ঈমানদারীর প্রতি আফসোস্‌। এক দাঙ্গের অধিকারী হইয়াও মাটির কাজে যাইতেছ! (আরব দেশীয় 'হাব্বা' এবং পারস্য দেশীয় 'দাঙ্গ' আমাদের দেশের পয়সার ন্যায় নিম্নতম মূল্যের মুদ্রা)।

পূর্বকালীন বুযর্গগণের কেহ কেহ উপার্জনের জন্য সপ্তাহে দুই দিনের অধিক বাজারে যাইতেন না। আবার কেহ কেহ প্রত্যহ যাইতেন বটে, কিন্তু জুহরের নামাযের সময় দোকান-পাট বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিতেন। আবার কেহ কেহ আসরের নামায পর্যন্ত বাজারে থাকিতেন। কিন্তু সকলেই দৈনিক জীবিকা নির্বাহোপযোগী উপার্জন হওয়ামাত্র বেচাকেনা বন্ধ করিয়া মসজিদে চলিয়া যাইতেন।

ষষ্ঠ ঃ সন্দেহযুক্ত মাল হইতে দূরে থাকিবে। হারাম মাল গ্রহণের ইচ্ছা করিলে ফাসিক ও গুনাহগার হইবে। কোন জিনিসে সন্দেহ জাগিলে তৎসম্বন্ধে অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ অন্তরের নিকট ফতওয়া চাহিবে, মুফতীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে না। তবে এইরূপ অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক অতি বিরল। অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তর যাহা গ্রহণে ইতস্ততঃ করে তাহা ক্রয় করিবে না। অত্যাচারী ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকের সহিত বেচাকেনা করিবে না। অত্যাচারীর নিকট বাকীতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। কারণ, অত্যাচারী ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ না করিয়া মরিয়া গেলে পাওনাদারের মনে কষ্ট হইবে। কিন্তু অত্যাচারী ব্যক্তির মৃত্যুতে দুঃখিত ও তাহার ঐশ্বর্যে আনন্দিত হওয়া সঙ্গত নহে। যে জিনিস অত্যাচারীর হস্তগত হইলে অত্যাচার কার্যে সহায়তা হইবে বলিয়া জানা যায়, তাহা তাহার নিকট বিক্রয় করিবে না। বিক্রয় করিলে বিক্রেতাও অত্যাচারে শরীক বলিয়া গণ্য হইবে। যেমন, অত্যাচারীর নিকট কাগজ বিক্রয় করিলে পাপী হইবে। মোটকথা, সকলের সহিত কায়-কারবার করিবে না; বরং কায়-কারবারের উপযোগী লোক তালাশ করিয়া লইবে।

আলিমগণ বলেন ঃ এমন এক যামানা ছিল যখন বাজারে যাইয়া 'কাহার সহিত কায়-কারবার করিব' জিজ্ঞাসা করা হইলে লোকে বলিত, যাহার সহিত ইচ্ছা কারবার করিতে পার; সকলে সৎলোক। তৎপর এক যামানা আসিল যখন ঐ প্রশ্নের উত্তরে লোকে বলিত, অমুক অমুক ব্যতীত সকলের সহিতই কারবার করিতে পার। অনন্তর এক যামানা আসিল যখন উক্ত প্রশ্নের উত্তরে লোকে বলে, অমুক অমুক ব্যতীত আর কাহারও সহিত কারবার করিও না। আশংকা হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন এক যামানা আসিবে যখন কারবার উপযোগী একজন লোকও পাওয়া যাইবে না। ইহাতো আমাদের যামানার পূর্বের লোকদের উক্তি ছিল। সম্ভবতঃ আমাদের সময়ে এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, লোকে কায়-কারবারে হালাল-হারামের পার্থক্য একেবারে উঠাইয়া দিয়াছে। আর অর্ধ শিক্ষিত ও ধর্ম-বিষয়ে অপরিপক্ক আলিমগণকে বলিতে শোনা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত মালই একরূপ হইয়া পড়িয়াছে এবং সবই হারামের মাল। সুতরাং হারাম-হালালে সতর্কতা অবলম্বন বর্তমানে সম্ভব নহে। এবংবিধ বাজে উক্তির ফলে

হারাম কায়-কারবারে মানুষের দুঃসাহসিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা নিতান্ত অন্যায়। অপরিপক্ক আলিমদের এই সকল উক্তি সত্য নহে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ অত্র পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে 'হালাল-হারামের পরিচয়' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

সপ্তম ঃ যাহার সহিত কারবার কর তাহার সঙ্গে কথাবার্তা, কাজ-কর্ম ও আদান-প্রদানের হিসাব-নিকাশ যথাযথভাবে ঠিক করিয়া রাখিবে। আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, তুমি যত লোকের সহিত কায়-কারবার করিয়াছ, কিয়ামত দিবস তোমাকে তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া তোমার নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ করা হইবে এবং ন্যায় বিচার করা হইবে।

এক বুযর্গ এক ব্যবসায়ীকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন? সে ব্যক্তি উত্তর করিল ঃ পঞ্চাশ হাজার খাতা আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। আমি নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহ, এই সকল খাতাপত্র কিসের? উত্তর আসিল, তুমি পঞ্চাশ হাজার লোকের সহিত কারবার করিয়াছিলে। তাহাদের প্রত্যেকের এক-একটি খাতা। তৎসহ সেই ব্যক্তি উক্ত বুযর্গের নিকট বলিল ঃ আমি দেখিতে পাইলাম, যাহার সহিত আমি যে কার্য করিয়াছি তাহা অবিকল উক্ত খাতাসমূহে আগা-গোড়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

মোটকথা, প্রতারণা করিয়া কাহারও ক্ষতি করিয়া থাকিলে তাহার এক কপর্দকের জন্যও তোমাকে ধরা হইবে এবং ইহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই তুমি অব্যাহতি পাইবে না।

কায়-কারবার সম্পর্কে পূর্বকালীন বুযর্গগণের আচরণ ও শরীয়তের পন্থা উপরে বর্ণিত হইল। উহা আজকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্বকালীন বুযর্গগণের আচরণসম্মত ও শরীয়তসঙ্গত কায়-কারবার ও উহার শিক্ষা অধুনা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি উহার একটি নিয়মও প্রতিপালন করে, সে অসীম সওয়াব পাইবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন কর যে ব্যক্তি উহার দশমাংশ করিবে উহাই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে, এমন এক যমানা আসিবে, সাহাবা (রা)-গণ নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহার কারণ? তিনি বলেন ঃ পুণ্য কার্যে তোমরা পরস্পর সাহায্য করিয়া থাক। এইজন্য ইহা তোমাদের পক্ষে সহজসাধ্য। আর ঐ সকল লোকের বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকিবে না এবং (ধর্মে-কর্মে) উদাসীনদের মধ্যে তাহারা হইবে গরীব।

এই হাদীসখানা এ স্থলে আনয়ণের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি উহা অবগত হইবে, সে নিরাশ হইবে না এবং এই কথা বলিবে না যে, এত সব সতর্কতা অবলম্বন

কিরূপে সম্ভব হয়; বরং বর্তমান যমানায় যতটুকু পারা যায়, তাহাই অধিক। কিন্তু যাহার বিশ্বাস আছে যে, পরকাল ইহকাল হইতে উৎকৃষ্ট, সে উল্লিখিত যাবতীয় সতর্কতাই অবলম্বন করিতে পারে। কারণ, সতর্কতার দরুন দরিদ্রতা ও অভাব ব্যতীত আর কিছুই সৃষ্টি না হইলেও যে দরিদ্রতার ফলে চিরস্থায়ী বাদশাহী লাভ হয় এমন দরিদ্রতা মানুষ হৃষ্ট চিত্তে বরণ করিয়া লইতে পারে। কেননা, দুনিয়ার ধন-দৌলত এবং রাজত্ব লাভের অনিশ্চিত আশায় দূর-দূরান্ত সফরের কত দুঃখ-কষ্টই না মানুষ সহ্য করিয়া থাকে! অথচ মৃত্যু আসিয়া পড়িলে সবই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় পরকালের বাদশাহী লাভের উদ্দেশ্যে যে আচরণ অন্যের নিকট হইতে পাইতে পছন্দ কর না, তাহা অপরের জন্য পছন্দ না করা তেমন কোন বড় কাজ নহে।

চতুর্থ অধ্যায়

হালাল, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয়ের পরিচয়

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ-

হালাল রুযী অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরয।

সুতরাং হালালের পরিচয় না জানিলে ইহা অন্বেষণ করিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট। আর এই উভয়ের মধ্যে জটিল ও অপ্রকাশ্য সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহাদের নিকটবর্তী হইবে; তাহার হারামে পতিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

হালাল, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি জানিয়া লওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা। 'ইহয়াউল উলূম' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি তদ্রূপ অপর কোন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না এবং সাধারণ লোকের যতটুকু বোধগম্য হয় ততটুকু এই গ্রন্থে চারটি অনুচ্ছেদে ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করিব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

হালাল রুযী অন্বেষণের ফযীলত ও সওয়াব ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا-

হে রাসূলগণ! হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং নেক কাজ কর।

এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হালাল রুযী অন্বেষণ করা মুসলমানের উপর ফরয। তিনি আরও বলেন ঃ যে হালাল বস্তুতে হারামের সংমিশ্রণ নাই, যে ব্যক্তি এমন হালাল দ্রব্য একাধারে চল্লিশ দিন আহার করে, আল্লাহ তাহার হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান করিয়া দেন এবং হিকমতের উৎস তাহার হৃদয় হইতে প্রবাহিত করিয়া দেন। অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, দুনিয়ার মহব্বত তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। অন্যতম সাহাবী হযরত সা'আদ (রা) নিবেদন করিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এরূপ দু'আ করুন, আমি যে বিষয়ে দু'আ করি তাহাই যেন কবূল হয়। তিনি বলিলেন ঃ দু'আ কবূল হওয়ার জন্য হালাল বস্তু ভক্ষণ কর।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের খাদ্য ও বস্ত্র তো হারামের; আবার তাহারা হাত উঠাইয়া দু'আ করে। এইরূপ দু'আ কখনও কবূল হইবে? (অর্থাৎ কখনই কবূল হইবে না)। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র এক ফেরেশতা বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করেন। তিনি প্রত্যেক রাত্রে ঘোষণা করেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করিবে আল্লাহ্ না তাহার ফরয ইবাদত কবূল করিবেন, না সুন্নত।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়া কোন বস্ত্র খরিদ করে এবং তন্মধ্যে এক দিরহাম হারামের থাকে তবে যতক্ষণ সেই বস্তু তাহার পরিধানে থাকিবে ততক্ষণ তাহার নামায কবূল হইবে না। তিনি বলেন ঃ দেহের মাংস হারাম ভক্ষণে পয়দা হয় তাহা দোযখের আগুনে দগ্ধ হইবে। তিনি বলেন যে, কোথা হইতে মাল উপার্জন করে (হারাম, কি হালাল উপায়ে) এ সম্বন্ধে যাহার কোন উৎকণ্ঠা নাই, দোযখে কোন্ দিক দিয়া তাহাকে নিক্ষেপ করিবেন, এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন পরওয়া করিবেন না। তিনি বলেন, ইবাদতের দশটি ভাগ আছে; তন্মধ্যে নয় ভাগই হইল কেবল হালাল রুযী অন্বেষণ করা। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল জীবিকা অন্বেষণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, শয্যা গ্রহণের সময় তাহার সমস্ত পাপ মার্জিত হইয়া থাকে এবং সকালে সে যখন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয় তখন আল্লাহ্ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম হইতে নিবৃত থাকে, তাহার হিসাব গ্রহণে আমার লজ্জা করে। তিনি বলেন সুদের এক দিরহামের পাপ মুসলমান অবস্থায় ত্রিশবার ব্যাভিচারের পাপ অপেক্ষা অধিক। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি হারামের মাল উপার্জন করে, সে দান করিলে ইহা কবূল হয় না এবং সঞ্চয় করিয়া রাখিলে ইহা তাহাকে দোযখের দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

হযরত আবূ বকর (রা) একবার এক গোলামের হাত হইতে দুধের শরবত পান করিলেন। তৎপর তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেই শরবত হালাল উপায়ে অর্জিত ছিল না। তৎক্ষণাৎ কণ্ঠনালীতে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া তিনি এমনভাবে বমি করিতে লাগিলেন যে, ইহার প্রচণ্ডতায় ও কষ্টে তাহার মৃত্যু ঘটিবার উপক্রম হইল এবং তৎপর তিনি মুনাজাত করিয়াছিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! শরবতের যে অংশটুকু আমার শিরাসমূহে লাগিয়া রহিয়া গেল এবং বমনে বাহির হইল না তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। হযরত উমর (রা) একদা এরূপই করিয়াছিলেন। কারণ, লোকে ধোকা দিয়া তাঁহাকে সদকার দুগ্ধ পান করাইয়াছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, নামায পড়িতে পড়িতে তুমি যদি কুঁজো হইয়া যাও এবং রোযা রাখিতে রাখিতে কেশের ন্যায় ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া পড় তথাপি হারাম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত এই রোযা-নামাযে কোনই ফল পাইবে না এবং উহা কবূলও হইবে না।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম মাল হইতে দান করে সে এমন ব্যক্তি সদৃশ যে নাপাক বস্ত্র পেশাব দ্বারা ধৌত করে যাহাতে উহা অধিকতর নাপাক হইয়া পড়ে। হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন মু'আয (রা) বলেন ঃ ইবাদত আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার। দু'আ ইহার চাবি এবং হালাল খাদ্য এই চাবির দাঁত। হযরত সহল তস্‌তরী (র) বলেন ঃ চারিটি উপায় ব্যতীত কেহই ঈমানের হাকীকত উপলব্ধি করিতে পারে না। যথা ঃ (১) সুন্নত প্রণালীতে সকল কার্য সম্পন্ন করা। (২) পরহিযগারীর নীতি অনুসারে হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা। (৩) দেহ ও মন দ্বারা যে সমস্ত মন্দ কার্য সম্পন্ন হয় তৎসমূদয় পরিত্যাগ করা। (৪) মৃত্যু পর্যন্ত এই নীতিগুলির উপর দৃঢ়পদ থাকা। বুযর্গগণ বলেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন সন্দেহযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিবে তাহার হৃদয় কালিমাময় হইয়া যাইবে। হযরত ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন ঃ সন্দেহযুক্ত এক-এক কপর্দক ইহার প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেওয়াকে আমি লক্ষ মুদ্রা দান করা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি। হযরত সহল তস্‌তরী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করে, সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, তাহার সমস্ত শরীর পাপে জড়িত হইয়া পড়ে। আর যে ব্যক্তি হালাল ভক্ষণ করে তাহার সর্বাঙ্গ ইবাদতে মগ্ন থাকে এবং নেক কার্য করিবার শক্তি সর্বদা তাহার অনুকূলে ও সহায়ক থাকে।

এই বিষয়ে বহু হাদীস ও বুযর্গানে দীনের উক্তি বিদ্যমান আছে। এই জন্যই মুত্তাকী পরহিযগার ব্যক্তিগণ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তন্মধ্যে হযরত ওহাব ইব্‌ন ওয়ার্‌দ কোন জিনিস ইহার প্রকৃত অবস্থা না জানা পর্যন্ত ভক্ষণ করিতেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা কিরূপ এবং কোথা হইতে উপার্জিত হইয়াছে? একদা তাঁহার মাতা তাঁহাকে এক পেয়ালা দুগ্ধ পান করিতে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এই দুধ কোথা হইতে আসিল ? ইহার মূল্য আপনি কোথা হইতে দিলেন? কাহার নিকট হইতে খরিদ করিলেন? এই প্রশ্নগুলির উপযুক্ত উত্তর পাওয়ার পর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যে ছাগলের এই দুধ ইহা কোথা হইতে ঘাস খাইয়াছে? অপর মুসলমানগণের কোন হক আছে, এমন স্থানে কি ইহা চরিয়াছে? মোটকথা উক্ত দুধ তিনি পান করিলেন না। তাঁহার মাতা দু'আ করিয়া বলিলেন ঃ বৎস! পান কর, আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত করুন। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ রহমত করিলেও আমি উহা পান করিতে চাহি না। কারণ, পান করিলে এই পাপের সহিত তাঁহার রহমত লাভ করিব। ইহা আমি পছন্দ করি না।

হযরত বিশরে হাফী (র) অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন; একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ আপনি কোথা হইতে আহার করেন? তিনি বলিলেন ঃ অপর লোক যেখান হইতে আহার করিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি আহার করিয়া ক্রন্দন

করে এবং যে ব্যক্তি আহার করিয়া আনন্দ করে, এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন ঃ হাত খুব খাট এবং লুকমা খুব ছোট হওয়াতে কোন ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

হালাল-হারামে পরহিযগারীর শ্রেণীভেদ ঃ হালাল ও হারামের বহু শ্রেণী আছে এবং সব শ্রেণী এক রকমের নহে। কোনটি মাত্র হালাল, কোনটি পবিত্র হালাল, আবার কোনটি অধিকতর পবিত্র হালাল। তদ্রূপ হারামের মধ্যেও কোনটি সাধারণ হারাম, কোনটি জঘন্য হারাম, আবার কোনটি জঘন্যতম হারাম। যেমন কোন রোগ গরমে বৃদ্ধি পাইলে যে বস্তু অধিক গরম তাহা ব্যবহারে অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে এবং গরমেও শ্রেণীভেদ আছে। কারণ, মধু উষ্ণতায় চিনির সমান নহে। হারামও তদ্রূপ। হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকার ব্যাপারে মুসলমানগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী ঃ পরহিযে আব্দুল এবং ইহা সাধারণ মুসলমানের পরিহিযগারী। ইহা হইল যাহা প্রকাশ্য ফিকাহ শাস্ত্রের বিধান ও ফতওয়া অনুসারে হারাম, তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা। ইহা পরহিযগারীর সর্বনিম্ন শ্রেণী। যে ব্যক্তি এই শ্রেণীর পরহিযগারী অবলম্বনে বিরত থাকিবে তাহার ন্যায়-পরায়ণতা বিনষ্ট হইবে এবং সে ফাসিক ও গুনাহগার বলিয়া গণ্য হইবে। এই শ্রেণীর লোকও কতিপয় উপশ্রেণীতে বিভক্ত। কারণ, কাহারও মাল মালিকের সম্মতিক্রমে নাজায়েয উপায়ে গ্রহণ করা হারাম এবং বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া অধিকতর হারাম। আবার কোন ইয়াতীম বা দরিদ্রের নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লইলে আরও জঘন্য হারাম হইবে। আর সুদঘটিত নাজায়েয পন্থায় কোন জিনিস গ্রহণ করিলে জঘন্যতম হারাম হইবে যদিও সর্বশ্রেণীর হারামই হারাম নামে অভিহিত। যে জিনিস যত অধিক হারাম ইহাতে পারলৌকিক ক্ষতির আশঙ্কাও তত অধিক এবং ক্ষমা-প্রাপ্তির আশাও তত কম। যেমন মধু সেবনে রোগীর যত অধিক ক্ষতি হয়, মিশ্রি ও চিনি খাইলে তাহার তত ক্ষতি হয় না। আবার মধু অধিক পরিমাণে পান করিলে যত ক্ষতি হয়, অল্প পরিমাণে পান করিলে তত ক্ষতি হয় না।

যিনি ফিকাহ শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি হালাল হারাম সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সমস্ত ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সকলের জন্য ওয়াজিব নহে। কারণ যাহার জীবিকা গনীমতের মাল ও জিযিয়া হইতে সংগৃহীত হয় না, তাহার জন্য

গনীমত ও জিযিয়া সম্বন্ধে বিধানসমূহ অবগত হওয়া আবশ্যক নহে। কিন্তু আবশ্যক পরিমাণ জ্ঞানার্জন প্রত্যেকের প্রতি ওয়াজিব। উদাহরণস্বরূপ, ক্রয়-বিক্রয় হইতে যাহার আয় হইয়া থাকে, ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় বিধান অবগত হওয়া তাহার প্রতি ওয়াজিব; মজুরী দ্বারা যে ব্যক্তি জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, ইজারা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান লাভ করা তাহার ওপর ওয়াজিব। এইরূপ প্রত্যেক পেশার জন্য পৃথক পৃথক বিধান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যে পেশা অবলম্বন করে তৎসম্বন্ধে বিধানাবলী অবগত হওয়া তাহার উপর ওয়াজিব।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ নেক্কারগণের পরহিযগারী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মুফতী যাহাকে হালাল অথচ সন্দেহমুক্ত নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন তাহা বর্জন করাই এই শ্রেণীর পরহিযগারীর মধ্যে গণ্য।

সন্দেহযুক্ত বিষয় তিন প্রকার ঃ (১) যাহা বর্জন করা ওয়াজিব। (২) যাহা বর্জন করা ওয়াজিব নহে কিন্তু মুস্তাহাব। (৩) যাহা অমূলক সন্দেহের কারণে পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে। যেমন কোন সন্দিগ্ধচিত্ত পরহিযগার ব্যক্তি কেবল সন্দেহেরবশে শিকারের গোশত আহার করেন না। তাঁহারা সন্দেহ করেন, হয়ত এই শিকার অপর কাহারও স্বত্বাধিকারে ছিল এবং তাহার নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। অথবা কোন ব্যক্তি মালিকের অনুমতিতে বিনাভাড়ায় তাহার কোন গৃহে বাস করিতেছে; হঠাৎ ধারণা হইল; হয়ত গৃহের মালিক মরিয়া গিয়াছে এবং হয়ত তাহার ওয়ারিসগণ ইহার মালিক হইয়াছে। এইরূপ ধারণায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সঠিকভাবে প্রমাণিত না হইলে এই সমস্ত ব্যাপারে এবংবিধ ধারণা অমূলক সন্দেহ মাত্র।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ মুত্তাকীগণের পরহিযগারী। যাহা হারামও নহে সন্দেহযুক্তও নহে; বরং সাধারণ হালাল। কিন্তু ইহাতে এইরূপ আশংকা আছে যে, ইহার ফলে পরিশেষে কোন হারাম বা সন্দেহযুক্ত ব্যাপারে পতিত হইতে হইবে। মুত্তাকী লোকগণ এইরূপ কার্য হইতেও বিরত থাকেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, সন্দেহযুক্ত ও আশঙ্কাজনক বিষয়ে পতিত হওয়ার ভয়ে সন্দেহযুক্ত ও আশংকাজনক বিষয় বর্জন না করা পর্যন্ত কেহ মুত্তাকী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ হারামে পতিত হওয়ার আশংকায় আমরা হালারের দশ ভাগের নয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়াছি। এইজন্যই একশত দিরহাম কাহাকেও কর্জ দিয়া তাহার নিকট হইতে নিরানব্বই দিরহামের অধিক তাঁহারা গ্রহণ করিতেন না। সব লইলে হয়ত অধিক হইয়া পড়িবে, তাঁহারা এইরূপ আশংকা করিতেন।

হযরত আলী ইব্ন মা'বাদ (র) বলেন ঃ আমি এক গৃহ ভাড়ায় রাখিয়া ছিলাম। একটি চিঠি লিখিয়া উহার কালি সেই গৃহের মাটি দ্বারা শুকাইতে ইচ্ছা করিলাম।

খেয়াল হইল, মাটিতে আমার কোন স্বত্ব নাই; ইহাদ্বারা কালি শুকাইব না। তৎপর মনে মনে বলিলাম, সামান্য মাটি লাগিবে, ইহার কি মূল্য আছে? অবশেষে সামান্য মাটি দ্বারা চিঠির কালি শুকাইলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছেন- যে ব্যক্তি অন্য লোকের দেওয়ালের মাটিকে নগণ্য ও মূল্যহীন মনে করে, কিয়ামত দিবস সে বুঝিতে পারিবে।

দ্বিবিধ কারণে এই শ্রেণীর মুত্তাকীগণ অতি তুচ্ছ এবং নগণ্য বস্তুও বর্জন করিয়া থাকেন। (১) ইহার স্বাদ গ্রহণ করিলে মন আরও পাইতে আশা করিবে এবং (২) পরকালে মুত্তাকীগণের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার আশংকা। এইজন্যই শিশুকালে হযরত ইমাম হাসান (রা) সদ্কার একটি খুরমা মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ থু থু ফেল, থু থু ফেল; ইহা ফেলিয়া দাও। হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর সম্মুখে লোকে গনীমতের কস্তুরী স্থাপন করিলে তিনি নাসিকা ঢাকিয়া বলিলেন ঃ গন্ধই ইহার ভোগের বস্তু এবং ইহা মুসলমান সমাজের প্রাপ্য। কথিত আছে, এক বুযর্গ এক রোগীর শিয়রে বসিয়াছিলেন। রোগী মারা গেলে তিনি প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া বলিলেন ঃ এখন এই তৈল তাহার ওয়ারিসগণের হক।

হযরত উমর (রা) গনীমতের কস্তুরী গৃহে আনিয়া মুসলমান জনসাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থ স্বীয় পত্নীকে বলিয়া দিলেন। একদা গৃহে অবস্থানকালে তাঁহার পত্নীর চাদর হইতে কস্তুরীর গন্ধ পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহা কিসের গন্ধ? পত্নী বলিলেন ঃ আমি কস্তুরী ওজন করিতেছিলাম এমন সময় কিঞ্চিত পরিমাণে হাতে লাগিয়া গেল। উহা আমি চাদরে মুছিয়া ফেলিলাম। হযরত উমর (রা) সেই চাদর তাঁহার পত্নীর মাথা হইতে টানিয়া লইয়া ধুইতে ও মাটিতে ঘষিতে লাগিলেন। গন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তদ্রূপ করিতেছিলেন। তৎপর তিনি উহা পত্নীকে দিলেন। যদিও এত সামান্য পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য ছিল তথাপি ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) অন্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ভয়ে সেই সামান্য গন্ধটুকু পর্যন্ত পত্নীকে উপভোগ করিতে দেন নাই। মুত্তাকীর সওয়াবলাভের আশায় এবং হারামে পতিত হওয়ার আশংকায় হালাল বস্তুও তিনি বর্জন করাইয়াছেন।

হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ এক ব্যক্তি মসজিদে উপবিষ্ট থাকাকালীন বাদশাহের মাল হইতে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালান আরম্ভ হইল, তখন সেই ব্যক্তির কি করা উচিত? তিনি বলিলেন ঃ তৎক্ষণাৎ তাহার বাহির হইয়া যাওয়া আবশ্যক যেন উহার গন্ধ তাহার নাসিকায় প্রবেশ না করে। ইহা হারামের নিকটবর্তী। কারণ, যে পরিমাণ সুগন্ধি তাহার নাসিকায় প্রবেশ করিবে এবং কাপড়ে লাগিবে, তাহাই উহার উপভোগ্য বস্তু।

হযরত ইমাম সাহেব (র)-কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ হাদীসের কিতাবের একটি পাতা পড়িয়া থাকিতে পাইলে মালিকের বিনা অনুমতিতে উহা হইতে নকল করিয়া লওয়া দুরস্ত আছে কি? তিনি বলিলেন ঃ না, দুরস্ত নহে।

যে মুবাহ কার্য পার্থিব শোভা-সৌন্দর্যের দিকে আকর্ষণ করে তাহার বিধানই উপরে বর্ণিত হইল। কারণ, মানুষ মুবাহ কার্যে লিপ্ত হইলে ইহা তাহাকে অন্যদিকে টানিয়া নিবে। এমন কি, যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে সে মুত্তাকীর শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিবে না। কারণ, উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে কামভাব জাগ্রত হইয়া উঠে এবং হৃদয়ে বাজে চিন্তা উদয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা অত্যাধিক প্রফুল্লতা ও জ্ঞানশূন্যতা জন্মে।

দুনিয়াদারদের ধন-সম্পদ, ঘরবাড়ি ও বাগানাদির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও তদ্রূপ। কারণ, ইহাতে দুনিয়ার লোভ জাগ্রত হইয়া উঠে এবং ঐ সমস্তের অন্বেষণে মানুষকে বিব্রত রাখে, পরিশেষে দুনিয়ার লোভ তাহাকে হারামের দিকে পরিচালিত করে। এই জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের অগ্রণী। দুনিয়ার মুবাহ বস্তু সম্পর্কেই তিনি ইহা বলিয়াছেন। কারণ, দুনিয়ার মহব্বত পার্থিব ধন-সম্পদ অন্বেষণে মানুষকে উন্মাদ করিয়া তোলে এবং তৎপর সে পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এমন কি আল্লাহ্র যিকিরও তখন তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না এবং আল্লাহ্র প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া পড়া চরম দুর্গতি ও দুর্ভাগ্যের কারণ। এই কারণেই হযরত সুফিয়ান সওরী (র) যখন এক ধনীর সুরম্য প্রাসাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহচর ইহা দেখিতে আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন ঃ তোমরা এই সমস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে ধনীরা এত অপব্যয় করিত না। সুতরাং তোমরাও এই অপব্যয়জনক পাপের অংশী।

হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ বাসগৃহ ও মসজিদের দেওয়ালের চুনকাম করা কিরূপ? তিনি বলিলেন ঃ গৃহের মেঝে পলস্তরা করা দুরস্ত যাহাতে ধূলা না উড়ে। কিন্তু আমার মতে দেওয়ালে চুনকাম করা মাকরূহ। কারণ, ইহা সাজ-সজ্জার অন্তর্গত। পূর্বকালীন বুযর্গগণ বলেন ঃ যাহার পোশাক হালকা ও পাতলা, তাহার ধর্ম-প্রেরণাও অতি দুর্বল। হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় পবিত্র হালাল হইতেও নিবৃত্ত থাকা উচিত, এই উদ্দেশ্যেই এ স্থলে এ সমস্ত কথা উল্লেখ করা হইল।

চতুর্থ শ্রেণী ঃ সিদ্দীকগণের পরহিযগারী। তাঁহারা এমন বস্তুও পরিত্যাগ করেন যাহা হালাল এবং হারামেও নিক্ষেপ করে না। কিন্তু উক্ত হালাল বস্তু অর্জিত হওয়ার

উপাদানসমূহের কোন একটি উপাদানে কোন পাপের পরশ লাগিয়াছিল। সিদ্দীকগণের পরহিযগারীর কতিপয় দৃষ্টান্ত এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে।

হযরত বিশরে হাফী (র) রাজা-বাদশাহদের খননকৃত নদী-নালার পানি পান করিতেন না। আরও বহু বুযর্গ হজ্জযাত্রার পথে রাজা-বাদশাহদের খননকৃত পুষ্করণীর পানি পান করিতেন না। রাজা-বাদশাহদের খননকৃত নদী-নালার পানি যে সমস্ত বাগানে সিঞ্চন করা হইত অনেক বুযর্গ সে সমস্ত বাগানের ফল খাইতেন না। হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) মসজিদে বসিয়া কাপড় সেলাই করা মাকরূহ মনে করিতেন এবং মসজিদে বসিয়া উপার্জন করা তিনি পছন্দ করিতেন না। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কবরস্থানের গম্বুজে নক্‌শা করা কিরূপ? তিনি বলিলেন ঃ আমার মতে ইহা মাক্‌রূহ। তিনি আরও বলেন, কবরস্থান পরকালের জন্য।

এক বুযর্গের গোলাম বাদশাহর গৃহ হইতে প্রদীপ জ্বালাইয়া আনিয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিলেন। একরাত্রে এক বুযর্গের পাদুকার ফিতা ছিঁড়িয়া যায়। ঘটনাক্রমে সেই সময় বাদশাহের লোকেরা মশাল জ্বালাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু এই আলোতে তিনি ফিতা জোড়া দেওয়া পছন্দ করিলেন না। এক বুযর্গ মহিলা সূতা কাটিতেছিলেন। তখন বাদশাহের লোকেরা মশাল জ্বালাইয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই আলোকে সূতাকাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। অত্যাচারী লোক দ্বারা বন্দী হইয়া হযরত যুন্নুন মিসরী (র) কয়েকদিন বন্দীখানায় কষ্টে অতিবাহিত করেন। তাঁহার মুরীদ এক পুণ্যবতী মহিলা নিজ হস্তে প্রস্তুত সূতা বিক্রয়ে হালাল খাদ্য সংগ্রহ করতঃ তাঁহার জন্য বন্দীখানায় পাঠান। কিন্তু তাহা তিনি ভক্ষণ করেন নাই। সেই মহিলা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষুণ্ন মনে নিবেদন করিলেন ঃ আপনিও জানেন আমি যে খাদ্য প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা হালাল। কিন্তু আপনি ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও ইহা খাইলেন না কেন? তিনি বলিলেন ঃ এক অত্যাচারীর পাত্রে করিয়া উক্ত খাদ্য আমার সম্মুখে আনয়ন করা হইয়াছিল। জেল দারোগার হাতেই ছিল এই পাত্র। এক অত্যাচারীর হস্তে করিয়া সেই খাদ্য তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল এবং সম্ভবত তাহার হস্তের ক্ষমতা হারাম উপায়ে অর্জিত হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করেন নাই। এই শ্রেণীর পরহিযগারী অতীব উচ্চস্তরের। ইহার হাকীকত যে উপলব্ধি করিতে পারিবে না সে ধোকায় পতিত হইবে। এমন কি, সে কোন ফাসিকের হাতে খাদ্য গ্রহণ করিবে না। কিন্তু ব্যাপারটি এইরূপ নহে। বরং ব্যাপারটি এমন অত্যাচারীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে হারাম ভক্ষণ করে এবং হারাম উপায়েই তাহার ক্ষমতা অর্জিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন ব্যভিচারীর ক্ষমতা ব্যভিচার লব্ধ নহে।

সুতরাং ব্যভিচারী ব্যক্তি যদি কাহারও সম্মুখে খাদ্য পৌঁছায় তবে হারাম উপায়ে অর্জিত ক্ষমতা এই খাদ্য পৌঁছাইবার কারণ হইবে না।

হযরত সির্রী সাকতী (র) বলেনঃ একদা এক প্রান্তর দিয়া অতিক্রমকালে একটি ঝরণার নিকট উপস্থিত হইলাম। পার্শ্বে বৃক্ষ-পত্র দেখিয়া উহা ভক্ষণ করিতে মনস্থ করিলাম। কারণ, তথায় হয়ত ইহাই আমার জন্য হালাল খাদ্য হইবে। এমন সময় অদৃশ্যবাণী হইল ঃ যে শক্তি তোমাকে এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল উহা কোথা হইতে আসিল ? ইহাতে লজ্জিত হইয়া আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। সিদ্দীকগণের পরহিযগারীর স্তর এইরূপ উন্নতই হইয়া থাকে। তাঁহারা এই প্রকার সতর্কতার সহিত সূক্ষ্ম চিন্তা করিয়া দ্রব্যাদির বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমানকালে তৎপরিবর্তে লোকে কেবল বস্ত্রাদি ধৌত করার ব্যাপারে এবং পাক পানি অন্বেষণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। এইগুলিকে পূর্বকালীন বুযর্গগণ সাধারণ ব্যাপার মনে করিতেন। তাঁহারা খালি পায়ে পথ চলিতেন এবং যে পানি জুটিত তাহাতেই উযু-গোসল সমাধা করিতেন। অঙ্গ-বস্ত্র পরিষ্কার করা বহিরাঙ্গের সাজসজ্জা ও শোভামাত্র। এই পরিচ্ছন্নতার প্রতি কেবল মানুষের দৃষ্টিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তির তাড়না ধোকা দিয়া এই বাহ্য পরিচ্ছন্নতার দিকে মুসলমানকে ব্যাপৃত রাখে। পক্ষান্তরে পূর্বকালীন বুযর্গগণের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অন্তরের সাজসজ্জা ও শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আল্লাহ্ ইহাই দেখিয়া থাকেন। মানবের দৃষ্টি তৎপ্রতি পতিত হয় না বলিয়া এই অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা নফসের নিকট অতীব কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্চম শ্রেণী ঃ আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রকৃত একত্ববাদিগণের পরহিযগারী। আহার, নিদ্রা, কথন ইত্যাদি যাহা একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নহে- তৎসমুদয়কেই তাঁহারা নিজেদের উপর হারাম বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একমাত্র এক আল্লাহ্ এবং তাহারাই পরিপূর্ণ একত্ববাদী। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন মু'আয (র) একদা ঔষধ সেবন করিলে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে গৃহ মধ্যে কয়েকবার পায়চারী করিবার জন্য বলিলেন। তিনি বলিলেন ঃ আমি এইরূপ পায়চারী করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। ত্রিশ বৎসর যাবত আমি আমার কার্য ও গতিবিধির হিসাব রাখিতেছি যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যেই আমি নড়াচড়া না করি। মোটকথা, এই সকল বুযর্গের অন্তরে ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রকার সৎকল্পের উদয় না হইলে তাঁহারা নড়াচড়াই করেন না। তাঁহারা আহার করিলে এই পরিমাণই আহার করিয়া থাকেন

যাহাতে ইবাদতে সামর্থ্যের জন্য তাঁহাদের বুদ্ধি ও প্রাণ রক্ষা পায়। কথা বলিলে এইরূপ কথাই বলেন যাহা একমাত্র ধর্মপথের কথা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য সমস্তকেই তাঁহারা নিজেদের জন্য হারাম বলিয়া মনে করেন।

উপরে যাহা বর্ণিত, তাহাই পরহিযগারীর শ্রেণীসমূহ। ইহা অপেক্ষা কম নহে। পরহিযগারীর এই সোপানসমূহের প্রতি মনোনিবেশ কর এবং ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর। তৎসঙ্গে নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিও লক্ষ্য কর। তখন দেখিবে যে, প্রথম শ্রেণীর পরহিযগারী যাহা সর্বসাধারণ মুসলমানের পক্ষে অবশ্য পালনীয়, যাহা প্রতিপালন না করিলে ফাসিক বলিয়া অভিহিত হইতে হয়, তাহাও তুমি পালন করিতে পারিতেছ না। এমন কি শরীয়তের স্পষ্ট বিধানগুলি পালন করিতেও তুমি কষ্ট ও লজ্জা বোধ কর। অথচ কথা বলিবার বেলায় বড় বড় বুলি আওড়াইয়া থাক এবং আলমে মালাকুতের বর্ণনা প্রদান করিতে থাক ও নানারূপ দুর্বোধ্য অর্থশূন্য উক্তি করিয়া থাক। হাদীস শরীফে উক্তি আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহাদের শরীর নানারূপ নিয়ামতে পরিপুষ্ট এবং যাহারা বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করে ও বিবিধ প্রকার পোশাক পরিধান করিয়া থাকে এবং কথা বলিতে যাইয়া সুন্দর সুন্দর কথা বানাইয়া বলে, তাহারা মানবজাতির মধ্যে নিকৃষ্টতম। আল্লাহ আমাদিগকে এই সমস্ত হইতে রক্ষা করুন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

হালাল-হারামে পার্থক্যকরণ ও ইহাদের পরিচয় ঃ কতক লোকের অসার ধারণা এই যে, দুনিয়ার সমস্ত ধনই হারাম; সমস্ত না হইলেও অধিকাংশ ধনই হারাম। এই ধারণার বশবর্তী লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথম শ্রেণী ঃ এই শ্রেণীর লোকের মনে পরহিযগারীর সতর্কতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠার কারণে তাঁহারা বলেন ঃ জঙ্গলের লতা-পাতা, নদীর মাছ, বন্য শিকারের গোশত এবং এই প্রকার দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছুই আমরা খাইব না।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ এই শ্রেণীর লোকের উপর লোভ-লালসা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা বলে ঃ যাহা পাইব তাহাই খাইব; হালাল হারামের পার্থক্য করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ এই শ্রেণীর লোক মিতাচারের নিকটবর্তী। তাহারা বলে ঃ প্রত্যেক প্রকারের বস্তু প্রয়োজন অনুসারে ভোগ করা উচিত।

নিঃসন্দেহে এই তিন শ্রেণীর লোকই ভ্রমে পতিত রহিয়াছে। বাস্তব পক্ষে হালাল ও হারাম কিয়ামত পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত থাকিবে এবং সন্দেহজনক বিয়ষসমূহ

এতদুভয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ উক্তিই করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বলে যে, দুনিয়ার অধিকাংশ ধনই হারাম সে ভুল করে। কারণ হারাম অনেক হইলেও অধিকাংশ নহে এবং 'অধিকাংশ' ও 'অনেক' এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, পীড়িত, মুসাফির ও সৈন্য অনেক বলিলে অধিকাংশই পীড়িত, মুসাফির ও সৈন্য বলিয়া বুঝায় না। তদ্রূপ অত্যাচারী অনেক থাকিলেও অধিকাংশই অত্যাচারিত। এই সকল লোকের ভ্রমে পতিত হওয়ার কারণ। 'ইহ্ইয়াউল উলূম' নামক কিতাবে ইহা প্রমাণসহ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আসল কথা এই যে, আল্লাহ্র জ্ঞানে যাহা হালাল কেবল তাহাই ভোগ করিবার আদেশ বান্দাকে দেওয়া হয় নাই। কারণ, ইহা অবগত হওয়ার শক্তি কাহারও নাই; বরং শরীয়তের বিধান মতে যাহা হালাল বলিয়া মানুষ জানিতে পারিয়াছে এবং হারাম বলিয়া প্রকাশ পায় নাই, তাহা ভোগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ বিধান মানিয়া চলা খুব সহজ। উহার প্রমাণ এই যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) একবার এক মুশরিকের পাত্রে এবং হযরত উমর (রা) একদা এক ইয়াহুদী মাহিলার পাত্রে উযু করিয়াছিলেন। পিপাসা থাকিলে তাঁহারা উহাতে পানিও পান করিতেন। মদ্যপান ও মৃত জন্তু ভক্ষণ করে বলিয়া মুশরিক ও ইয়াহুদীদের হাত অপবিত্র থাকার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু উক্ত মুশরিক ও ইয়াহুদীর পাত্রে অপবিত্রতা দেখিতে পান নাই বলিয়াই তাঁহারা উহাকে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। অপবিত্র মনে করিলে তাঁহারা কখনও তদ্রূপ করিতেন না। কারণ, অপবিত্র পানি পান করা হারাম। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) যে শহরে গমন করিতেন তথা হইতেই আহার্য দ্রব্য খরিদ করিয়া ভক্ষণ করিতেন এবং আদান-প্রদান করিতেন। অথচ তাঁহাদের সময়ে চোর, সুদখোর, শরাব ব্যবসায়ী ইত্যাদি সবই ছিল। তাঁহারা দুনিয়ার ধন হইতে হস্ত সংকুচিত করেন নাই; বরং সকলকেই তাঁহারা সমান জ্ঞান করিতেন এবং আবশ্যক পরিমাণে পরিতুষ্ট থাকিতেন।

সাধারণত ছয় প্রকার লোকের সহিত কারবার করিতে হয়।

প্রথম ঃ অজ্ঞাত লোক, যে সৎ, কিন্তু অসৎ ইহা জানা নাই। যেমন কোন অপরিচিত স্থানে গমন করিলে তথাকার সকলের নিকট হইতে খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করা এবং সকলের সহিত আদান-প্রদান করা জায়েয। কারণ, তাহাদের অধিকারে যাহা আছে প্রকাশ্যভাবে তাহারাই ইহার মালিক। কাজ-কারবার জায়েয হওয়ার জন্য এতটুকু প্রমাণই যথেষ্ট এবং হারাম হওয়ার কোন লক্ষণ না পাওয়া পর্যন্ত আদান-প্রদান অশুদ্ধ হইবে না। অপরিচিত ব্যক্তির সাধুতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রবৃত্ত হইয়া বিলম্ব করা পরহিযগারী বটে; কিন্তু ইহা ওয়াজিব নহে।

দ্বিতীয় ঃ যাহার পরহিযগারী জানা আছে তাঁহার দ্রব্য ভোগ করা জায়েয। তাঁহার সাধুতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়া বিলম্ব করা পরহিযগারী নহে, বরং অমূলক সন্দেহ। তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইতেছে জানিয়া তিনি মনঃক্ষুণ্ন হইলে অনুসন্ধানকারী অবশ্যই গুনাহগার হইবে। কারণ নেক্কার লোকের প্রতি খারাপ ধারণা করাও পাপ।

তৃতীয় ঃ যে ব্যক্তি অত্যাচারী বলিয়া বিদিত, যেমন তুর্কী কিংবা খাজনা আদায়কারী অথবা যাহার সমস্ত বা অধিকাংশ ধন হারাম, এমন ব্যক্তির ধন ব্যবহারে নিবৃত্ত থাকা ওয়াজিব। কিন্তু এমন ব্যক্তির কোন দ্রব্য যদি হালাল উপায়ে অর্জিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়; কারণ সে ব্যক্তি ইহা কাহারও নিকট হইতে বলপূর্বক ছিনাইয়া লয় নাই ও হালাল হওয়ার লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান থাকে তবে এরূপ দ্রব্য হালাল বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

চতুর্থ ঃ যাহার অধিকাংশ মাল হালাল, কিন্তু হারাম হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। যেমন, কোন ব্যক্তি কৃষিকার্য করে, তৎসঙ্গে আবার খাজনা আদায়ের কার্যও করে অথবা কোন ব্যক্তি বাণিজ্যিও করে এবং সরকারী লোকদের সঙ্গে বেচা-কেনাও করে। এইরূপ ব্যক্তির মাল হালাল। তাহার মালের অধিকাংশ গ্রহণ করা দুরস্ত। কারণ, ইহার অধিকাংশ মালই হালাল। কিন্তু পরহিযগার লোক অবশ্যই এইরূপ মাল গ্রহণে বিরত থাকিবে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র)-এর জনৈক কর্মচারী বসরা হইতে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ সরকারী লোকদের সহিত যাহারা আদান-প্রদান করে তাহাদের সঙ্গে আমি বেচাকেনা করি। ইহার উত্তরে তিনি লিখিলেন ঃ যদি তাহারা সরকারী লোক ব্যতীত অপর লোকের সহিত কারবার না করে তবে তাহাদের সহিত তুমি ক্রয়-বিক্রয় করিও না। কিন্তু তাহারা যদি অপর লোকের সহিত কারবার করিয়া থাকে তবে তাহাদের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করা দুরস্ত আছে।

পঞ্চম ঃ যাহারা অত্যাচার করে বলিয়া জানা নাই এবং কি উপায়ে উপার্জন করে তাহাও জানা নাই। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ বা আকারে অত্যাচারী বলিয়া বোধ হয়; যেমন পরিধানে মূল্যবান পোশাক, মাথায় আমিরী টুপী অথবা আকার সৈনিক পুরুষের নিশ্চিতরূপে অবগত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সহিত ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন কার্যে নিবৃত্ত থাকা উচিত।

ষষ্ঠ ঃ যাহাদের মধ্যে অত্যাচারের কোন নিদর্শন নাই বটে, কিন্তু পাপের নিদর্শন সুস্পষ্ট। যেমন, পুরুষের পরিধানে রেশমী পোশাক, দেহে স্বর্ণালঙ্কার অথবা প্রকাশ্যে মদ্যপান, পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত এবংবিধ পাপের লক্ষণ-। এই প্রকার লোকের ধন

গ্রহণে বিরত থাকা ওয়াজিব নহে। কারণ, এই সমস্ত পাপাকার্যে মাল হারাম হয় না। তবে এই প্রকার ব্যক্তি হালাল মালের অধিকারী হইলেও এইরূপ মনে হইতে পারে যে, এই ব্যক্তি যেমন হারাম কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না তদ্রূপ হয়ত সে হারাম মাল হইতেও পরহিয করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ অনুমানে কাহারও মাল হারাম বলিয়া ফতওয়া দেওয়া যায় না। কারণ, একেবারে নিষ্পাপ কেহই নহে এবং এমন অনেক লোক আছে যাহারা চরিত্রগত পাপ হইতে বিরত থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে বিরত থাকে। হালাল ও হারাম পার্থক্যকরণে এই নীতি স্মরণ রাখা উচিত।

এই নীতি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে কেহ হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে এই অপরাধের জন্য সে ধৃত হইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ অপবিত্রতা লইয়া নামায দুরস্ত নহে। কিন্তু অজ্ঞাতসারে কেহ অপবিত্রতা লইয়া নামায পড়িয়া ফেলিলে ইহা আদায় হইয়া যাইবে। নামায শেষ করার পর সেই অপবিত্রতা সম্বন্ধে জানিতে পারিলেও এক রিওয়ায়েত মতে ইহার কাযা ওয়াজিব হইবে না। ইহার প্রমাণ এই, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের অবস্থায় স্বীয় পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ফেলিলেন এবং নামায শেষ করার পর বলিলেন ঃ "জিবরাঈল (আ) আমাকে জানাইলেন যে, পাদুকাদ্বয় অপবিত্র।" উক্ত অপবিত্রতা সম্বন্ধে পরে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নামায দুহরাইয়া পড়েন নাই।

অপরের ধনোপার্জনের পন্থা অনুসন্ধানের নিয়ম ঃ উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহার উপার্জনের উপায় অজ্ঞাত, তাহার ধন গ্রহণ না করা ওয়াজিব না হইলেও পরহিযগার লোকের জন্য উহা হইতে বিরত থাকা উত্তম। এইরূপ স্থলে ধনের মলিককে ধন উপার্জনের উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি তাহার মনে কষ্ট না হয়। মনে কষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করা হারাম। কারণ, পরহিযগারী একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং মনে কষ্ট দেওয়া হারাম। এমতাবস্থায় ওযর-আপত্তি দেখাইয়া আহারে বিরত থাকিবে আর কোন ওযর-আপত্তি না দেখাইতে পারিলে আহার করিবে যাহাতে সেই ব্যক্তির মনে কষ্ট না হয়। কাহারও ধন উপার্জনের পন্থা সম্বন্ধে তৃতীয় ব্যক্তিকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিবে না, যাহাতে তাহার পক্ষে ইহা শুনিবার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপভাবে জিজ্ঞাসা করাও হারাম। কারণ, এইরূপ জিজ্ঞাসা করাতে পরদোষ অনুসন্ধান, পশ্চাৎনিন্দা এবং অপরের প্রতি মন্দ ধারণা প্রকাশ পায়। এই ত্রিবিধ কার্যই হারাম। শুধু সতর্কতার জন্য হারাম কার্য জায়েয হয় না। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও মেহমান হইলে এইরূপ অনুসন্ধান করিতেন না এবং এক স্থান হইতে হাদিয়া

আসিলেও ঐ প্রকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু সন্দেহের উদ্রেক হইলে অনুসন্ধান করিতেন। তিনি যখন সর্বপ্রথমে মদীনা শরীফে তশরীফ আনয়ন করেন, তখন (মদীনাবাসিগণ সদ্‌কা ও হাদিয়া সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না বলিয়া) ইহা সন্দেহের স্থান ছিল। এই কারণে তখন কেহ তাঁহাকে কিছু প্রদান করিতে চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন ইহা হাদিয়া না সদ্‌কা? আর তাঁহার প্রশ্নে কেহ কষ্ট পাইত না।

বাজারে বাদশাহী দ্রব্য বা লুটের বস্তু বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে, অপর দিকে ইহাও জানা আছে যে, বাজারের অধিকাংশ দ্রব্যই হারাম উপায়ে অর্জিত; এমতাবস্থায় বস্তুটি কি এবং কোথা হইতে আসিল, ইহা ভালরূপে অবগত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় করিবে না। কিন্তু বাজারে অধিকাংশ দ্রব্য হারাম না হইলে তদ্রূপ অনুসন্ধান ব্যতীত ক্রয় করা জায়েয আছে। তথাপি আল্লাহ্‌ভীতি ও পরহিযগারী রক্ষার জন্য জানিয়া শুনিয়া ক্রয় করা আবশ্যক।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

রাজা-বাদশাহগণের বৃত্তি গ্রহণ, তাহাদিগকে সালাম করা ও তাহাদের হালাল ধন গ্রহণ ঃ একালের রাজা-বাদশাহগণ মুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব, জরিমানা বা ঘুষরূপে যাহা কিছু গ্রহণ করে উহার সমস্তই হারাম। তবে রাজকোষের তিন প্রকার ধন হালাল ঃ (১) জিহাদের ময়দানে শত্রু পক্ষীয় কাফিরদের পরিত্যক্ত যে ধন গনীমতরূপে পাওয়া যায়। (২) অমুসলমান প্রজাদিগকে যুদ্ধের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া তাহাদের নিরাপত্তার মূল্যস্বরূপ শরীয়তের বিধান অনুসারে যে জিযয়া কর আদায় করা হয় এবং (৩) লা-ওয়ারিস মাল যাহা বাদশাহ উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ধন মুসলমানের জন্য নির্ধারিত।

আজকাল হালাল ধন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজস্ব ও জরিমানা হইতে অধিকাংশ ধন সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং রাজকোষের ধন কোন হালাল পন্থায়, গনীমত, জিয্‌য়া অথবা লা-ওয়ারিশগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে কিনা তাহা না জানিয়া রাজকোষের কোন ধন গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। কোন বাদশাহ্‌ কৃষি-কার্য দ্বারা ক্ষেত্র হইতে শস্য উৎপন্ন করাইলে ইহা তাহার জন্য হালাল হইবে। কিন্তু বেগার খাটাইয়া উৎপন্ন করাইলে উহা হারাম না হইলেও সন্দেহযুক্ত হইবে। বাদ্‌শাহ নিজস্ব মূল্য দিয়া কোন কৃষি জমি খরিদ করিয়া থাকিলে ইহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ইহার মূল্য হারাম অর্থ হইতে দেওয়া হইলে এই সম্পত্তি সন্দেহযুক্ত হইবে। বাদশাহ্‌ নিজস্ব তহ্‌বিল হইতে কোন ব্যক্তির ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলে তাহা গ্রহণ করা দুরস্ত হইবে কিন্তু বৃত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও মুসলমানগণের মঙ্গল সাধনের জন্য নির্ধারিত ধন হইতে প্রদান

করা হইলে এইরূপ বৃত্তি গ্রহণ করা জায়েয হইবে না। বৃত্তি গ্রহণকারী মুসলমান সমাজের হিতকর কোন কার্যে লিপ্ত থাকিলে যেমন— কাযী, মুফতী, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী বা চিকিৎসক অর্থাৎ এইরূপ কোন কার্যে লিপ্ত থাকিলে যাহার ফল সর্বসাধারণ ভোগ করিয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে তদ্রূপ বৃত্তি গ্রহণ করা জায়েয আছে। ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার্থিগণ সেইরূপ বৃত্তি গ্রহণের উপযোগী। উপার্জনে অক্ষম বা অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিগণও উক্ত তহবিল হইতে পাওয়ার অধিকারী। আলিম ও অপর লোকগণ যদি ধর্ম-বিষয়ে রাজ-কর্মচারী ও রাজা-বাদশাহ্‌দের মন যোগাইয়া না চলে, তাহাদের অপকর্মে সাহায্য না করে, তাহাদের অত্যাচারে প্রশ্রয় না দেয়, এমনকি তাহাদের নিকট গমন না করে, গমন করিলেও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী গমন করে, তবে তাহারাও উক্ত তহবিল হতে বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হইবে। রাজা-বাদশাহ্‌ ও রাজ-কর্মচারিগণের সহিত আলিম ও আলিম ব্যতীত অপরাপর লোকের আচরণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) আলিমগণ রাজা-বাদশাহ্‌ বা রাজ-কর্মচারীদের নিকট যাইবেন না এবং রাজা বাদশাহ ও রাজ-কর্মচারীরাও আলিমগণের দরবারে যাইবে না। ইহাতে ধর্মের নিরাপত্তা রহিয়াছে। (২) রাজা-বাদশাহের নিকট গমন ও তাহাদিগকে সালাম করা শরীয়তমতে নিন্দনীয়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে যাওয়া যাইতে পারে।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যাচারী রাজা-বাদশাহ্‌দের লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবে সে অব্যাহতি পাইবে। আর যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে দুনিয়ার লোভে পতিত হইবে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ আমার (তিরোধানের) পর অত্যাচারী বাদশাহের আবির্ভাব হইবে। যে ব্যক্তি তাহার মিথ্যা ও উৎপীড়ন ক্ষমা করিবে এবং উহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নহে। আর কিয়ামতের দিন আমার হাওযের দিকের পথ তাহার জন্য রুদ্ধ থাকিবে। তিনি আরও বলেন ঃ যে সকল আলিম আমীরগণের নিকট গমন করে, তাহারা আল্লাহ্‌র বড় শত্রু। আর যে সকল আমীর আলিমগণের নিকট গমন করে তাহারা আমীরদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ রাজা-বাদশাহ্‌গণের সহিত মেলামেশা না করা পর্যন্ত আলিমগণ পয়গম্বর (আ)-গণের আমানতদার। যখন (মেলামেশা) করিল তখন তাহারা আমানতের খিয়ানত করিল। তোমরা তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাক।

হযরত আবূ যর (রা) হযরত সল্‌মাহ (রা)-কে বলেন ঃ সুলতানগণের দরবার হইতে দূরে থাকিও। কারণ, তাহাদের দরবারে তোমাদের সাংসারিক লাভ যতটুকু হইবে তদপেক্ষা অধিক তোমার ধর্মের অনিষ্ট হইবে। তিনি আরও বলেন ঃ দোযখে এক ময়দান রহিয়াছে; সুলতানগণের সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল

আলিম গমন করে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই তথায় যাইবে না। হযরত উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন ঃ ধনীদের সহিত আলিম ও সংসার-বিরাগিগণের বন্ধুত্ব রিয়া-র প্রমাণ। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ মানুষ ধার্মিক অবস্থায় বাদশাহের দরবারে গমন করে এবং ধর্মহীন হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কিরূপে? তিনি বলিলেন ঃ সে তখন এমন বিষয়ে বাদশাহের মনস্তুষ্টি অন্বেষণ করে যাহাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

হযরত ফুযাইল (র) বলেন ঃ আলিম বাদশাহের সান্নিধ্য যতটুকু লাভ করে আল্লাহ হইতে ততটুকু দূরে সরিয়া পড়ে। হযরত ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেন ঃ জুয়াড়িগণ মুসলমানগণের যেরূপ ক্ষতি করিয়া থাকে তদপেক্ষা তাহাদের অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে সেই সকল আলিম যাহারা রাজা-বাদশাহদের নিকট গমন করে। হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্‌মান (রা) বলেন ঃ মানুষের মল-মূত্রের উপর উপবিষ্ট মাছি বাদশাহের দরবারে উপবিষ্ট আলিম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

রাজদরবার মন্দ হওয়ার কারণ ঃ রাজ-দরবারে যাতায়াতকারীদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কঠোর উক্তি করা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, তাহাদের জন্য তথায় কার্য, উক্তি, নীরবতা, অথবা ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় পাপের আশংকা রহিয়াছে।

কার্য সম্বন্ধীয় পাপ ঃ কার্য সম্বন্ধীয় পাপ এইরূপে হইয়া থাকে যে, অধিকাংশ স্থলে রাজপ্রাসাদ বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ স্থানে যাওয়া উচিত নহে। জঙ্গলে, উন্মুক্ত ময়দানে তাঁবু স্থাপন করা হইলেও তাহাদের তাঁবু ও বিছানা হারাম হইবে। এই তাঁবুতে প্রবেশ করা ও বিছানায় পা রাখা উচিত নহে। জবরদখলকৃত নহে এমন জমিতে তাঁবু ও ফরাস ব্যতীত হইলেও রাজ দরবারে যাওয়া উচিত নহে। কারণ হয়ত রাজা-বাদশাহের নিকট মাথা নত করিতে হইবে এবং তাহাদের সেবা করিতে হইবে। তাহা হইলে এক জালিমের নিকট বিনয় প্রকাশ করা হইবে, অথচ ইহা জায়েয নহে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন আমীরের ক্ষমতার কারণে তাহার নিকট বিনয় প্রকাশ করিলে সে অত্যাচারী না হইলেও বিনয় প্রকাশকারীর ধর্মের কিয়দংশ বিনষ্ট হইবে। সুতরাং মুসলমান হিসাবে আমীরকে শুধু সালাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত আর কিছুই দুরস্ত নহে। আমীরের হস্ত চুম্বন করা, পিঠ বাঁকাইয়া তাহার সম্মানার্থে মস্তক নত করা উচিত নহে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, আলিম অথবা ধর্মপরায়ণতার জন্য যে ব্যক্তি সম্মান পাইবার উপযোগী, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। পূর্বকালের কোন কোন বুযর্গ জালিমদের সালামের জওয়াব পর্যন্ত দেন নাই যেন অত্যাচারের কারণে তাহাদের অপমান হয়।

উক্তি সম্বন্ধীয় পাপ ঃ অত্যাচারী বাদশাহের মঙ্গলের জন্য দু'আ করিলে উক্তি সম্বন্ধীয় পাপ হইয়া থাকে। যেমন— "আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।" বলিয়া অত্যাচারী শাসকের জন্য দু'আ করা উচিত নহে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন জালিমের দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করে সে ইহা চাহে যে, দুনিয়াতে সর্বদা এমন লোক থাকুক যে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়া থাকে।" সুতরাং জালিমের জন্য এইরূপ দু'আ ব্যতীত অন্য কোন দু'আ দুরস্ত নহে।

اَصْلَحَكَ اللّٰهُ وَوَفَّقَكَ اللّٰهُ لِلْخَيْرَاتِ وَطَوَّلَ اللّٰهُ عُمْرَكَ فِىْ طَاعَتِهٖ–

আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন, কল্যাণের কার্যে আল্লাহ্ আপনাকে তওফীক দান করুন এবং তাঁহার বন্দেগীতে আপনাকে আল্লাহ্ দীর্ঘজীবী করুন।

অত্যাচারী আমীরের মঙ্গলের জন্য দু'আ সমাপ্ত করত ঃ লোকে খুব সম্ভব স্বীয় বাসনা প্রকাশ করে এবং বলে ঃ হুযূরের দরবারে হাযির হওয়ার বাসনা আমি সর্বদা পোষণ করিয়া থাকি। এইরূপ ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিয়া না থাকিলে সে মিথ্যা বলিল এবং অনাবশ্যক মুনাফিকী করিল। আর সে যদি বাস্তবিকই এই ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকে তবে যে অন্তর অত্যাচারীর সাক্ষাত লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয় তাহা ইস্‌লামের নূর শূন্যও হইতে থাকে। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে তাহার চেহারার প্রতি এইরূপ অসন্তুষ্ট থাকা উচিত যেমন লোকে স্বীয় শত্রুর প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া তাকে। উপরিউক্ত ইচ্ছা প্রকাশের পর সাক্ষাতকারী অত্যাচারীর ন্যায় বিচার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রশংসা আরম্ভ করে। ইহাতেও মিথ্যা এবং কপটতাপূর্ণ উক্তি করা হয়। ইহাতে সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতি এই যে, একজন জালিমের প্রশংসা করিয়া তাহার মনস্তুষ্টি করা হইল। ইহা জায়েয নহে। তৎপর সাক্ষাতকারীকে আবার উক্ত অত্যাচারীর অসম্ভব ও অস্বাভাবিক কথাগুলিকে মাথা নাড়িয়া সায় দিতে হয় এবং এইগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

নীরবতা সম্বন্ধীয় পাপ ঃ নীরবতা সম্বন্ধীয় পাপ এইরূপ হইয়া থাকে যে, বাদশাহের দরবারে রেশমী ফরাস, দেওয়ালের গায়ে প্রাণীর মূর্তি, বাদশাহের অঙ্গে রেশমী পোশাক, অঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি এবং তথায় নানাপ্রকার রৌপ্য পাত্র দেখা যায়। তদুপরি সম্ভবত তাহার অশ্লীল ও মিথ্যা কথা শুনা যায়। এই সকল শরীয়ত বিগর্হিত কর্ম দেখিয়া শুনিয়া প্রতিবাদ করা সাক্ষাতকারীর কর্তব্য, নীরব থাকা দুরস্ত নহে। ভয়ের কারণে প্রতিবাদ করিতে না পারিলে তাহাকে ক্ষমা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু বিনা কারণে তথায় গমন করিলে তাহাকে ক্ষমার্হ বলিয়া গণ্য করা যাইবে

না। কারণ, যেখানে পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হয় অথচ তৎসমূদয়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সম্ভব নহে, এমন স্থানে বিনা কারণে যাওয়াই সঙ্গত নহে।

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় পাপ ঃ রাজা-বাদশাহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাহাদিগকে ভালবাসা, সম্মানের পাত্র জ্ঞানে তাহাদিগকে ভক্তি করা, তাহাদের ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ পার্থিব ভোগ-বিলাসের বাসনা জাগ্রত হইতে দেওয়া অন্তর ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় পাপ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে মুহাজিরগণ! দুনিয়াদারদের নিকট যাইও না। কারণ, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছেন তৎপ্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবে। হযরত ঈসা (আ) বলিতেন ঃ দুনিয়াদারদের ধনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। কারণ, তাহাদের পার্থিব দীপ্তি তোমাদের অন্তর হইতে ঈমানের স্বাদ দূর করিয়া দিবে।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে উপলব্ধি করা উচিত যে, কোন অত্যাচারীর নিকট যাইবার অনুমতি নাই। কিন্তু দ্বিবিধ কারণে যাওয়া যায়। (ক) বাদশাহের কঠোর আদেশ। যদি তুমি তাহা অমান্য কর, তবে তিনি তোমাকে কষ্ট দিবেন অথবা বাদশাহের প্রভাব বিদূরীত হইবে এবং প্রজাবৃন্দ দুঃসাহসী হইয়া পড়িবে, এইরূপ আশংকা থাকিলে। (খ) নিজে উৎপীড়িত হইয়া সুবিচার প্রার্থনা অথবা অন্য মুসলামানের জন্য সুপারিশের উদ্দেশ্যে যাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু শর্ত এই যে, মিথ্যা বলা ও প্রশংসা করা যাইবে না এবং তীব্র ভাষায় অত্যাচারীকে উপদেশ দেওয়া বর্জন করা যাইবে না। কিন্তু ভয় থাকিলে নম্রতার সহিত উপদেশ দিবে। উপদেশ নিষ্ফল হইবে মনে করিলেও উপদেশ দিতে হইবে। মিথ্যা বলা ও অত্যাচারীর প্রশংসা হইতে সর্বদাই বিরত থাকিতে হইবে। এমন লোকও আছে, যে বাহানা করিয়া বলে, 'আমি অমুকের জন্য সুপারিশের উদ্দেশ্যে যাইতেছি; কিন্তু সেই ব্যক্তির কার্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা উদ্ধার হইলে কিংবা অপর কোন ব্যক্তি রাজদরবারে তাহা অপেক্ষা প্রিয়তর হইলে সে মনক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মীয় প্রয়োজনে সে রাজদরবারে গমন করে না; বরং সম্মান লিপ্সার বশীভূত হইয়া গমন করিয়া থাকে।

রাজা-বাদশাহের নিকট গমন ও আচরণের তৃতীয় শ্রেণী ঃ কোন আলিম রাজা-বাদশাহ বা রাজকর্মচারীদের নিকট গমন করিবেন না; বরং তাঁহারাই আলিমের দরবারে আগমন করিবেন। এইরূপ সাক্ষাতের বিধান এই যে, তাঁহারা আসিয়া সালাম করিলে আলিম ব্যক্তি সালামের জওয়াব দিবেন। শিষ্টাচার রক্ষার্থে এ সময়ে দণ্ডায়মান হওয়াও দুরস্ত আছে। কারণ, রাজা-বাদশাহগণ আলিমের দরবারে আগমন

করিলে ইল্‌মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং অত্যাচার করিলে রাজা-বাদশাহ যেমন ঘৃণার পাত্র হন তদ্রূপ আলিমের দরবারে আগমণের দরুন তাঁহারা সম্মানের পাত্রও বটে। কিন্তু দণ্ডায়মান না হওয়া এবং পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাই আলিমের জন্য উত্তম। তবে বাদশাহ্ অসন্তুষ্ট হইয়া আলিমকে কষ্ট প্রদানের অথবা প্রজাবৃন্দের অন্তরে বাদশাহের মর্যাদা ও ভয়-ভীতি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকিলে দণ্ডায়মান হওয়া যাইতে পারে।

আলিমের দরবারে আগত বাদশাহ্‌কে ত্রিবিধ উপদেশ ঃ বাদশাহ আলিমের দরবারে আসিয়া উপবেশন করিলে তাঁহাকে ত্রিবিধ উপদেশ প্রদান করা আলিমের কর্তব্য হইয়া পড়ে ঃ (১) বাদশাহ যদি কোন হারাম কার্য করেন এবং ইহা যে হারাম তাহা তিনি অবগত নহেন, এমতাবস্থায় ইহা যে হারাম তাহা আলিম তাঁহাকে জানাইয়া দিবেন। (২) অত্যাচার, পাপাচার ইত্যাদি কার্য হারাম জানিয়াও বাদশাহ্ করিতে থাকিলে তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন ও উপদেশ প্রদান করিতে হইবে এবং বলিতে হইবে ঃ জনাব, পার্থিব ভোগ-বিলাসের মোহে পরকালের বাদশাহী ও ধর্ম নষ্ট করা উচিত নহে। (৩) সর্বসাধারণের কিরূপে মঙ্গল ও উন্নতি সাধিত হইবে তাহা আলিমের জানা থাকিলে, অথচ বাদশাহ এ সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকিলে, এমতাবস্থায় যদি বিশ্বাস হয় যে, বলিয়া দিলে বাদশাহ শুনিবেন তবে তাঁহাকে জানাইয়া দিতে হইবে। বাদশাহ মানিবেন বলিয়া যদি আশা করা যায় তবে যাহারা বাদশাহের দরবারে গমন করে, তাহাদের প্রত্যেকের উপরই বাদশাহকে উপরিউক্ত ত্রিবিধ উপদেশ প্রদান করা ওয়াজিব। আলিম পরমুখাপেক্ষী না হইলে এবং ইল্‌ম অনুযায়ী আমলকারী হইলে অবশ্যই তাঁহার উপদেশ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাংসারিক লোভের প্রত্যাশী হইলে নীরব থাকাই সমীচীন। কারণ, এই অবস্থায় লোকের বিদ্রূপের পাত্র হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

হযরত মুকাতিল ইব্‌ন সালেহ (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা (র)-র নিকটে ছিলাম। তাঁহার গৃহে একখানা চাটাই, একটি চামড়া, একখানি কুরআন শরীফ এবং একটি বদনা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এক ব্যক্তি আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কে? উত্তর আসিল ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলাইমান, বর্তমানকালের খলীফা। মোটকথা, তিনি গৃহে প্রবেশপূর্বক উপবেশন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যখনই আমি আপনাকে দর্শন করি তখনই আমার অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হয়, ইহার কারণ কি ? হযরত হাম্মাদ (র) উত্তর দিলেন ঃ ইহার কারণ এই, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে আলিম একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইল্‌ম হাসিল করিয়া থাকে সকলে তাহাকে ভয় করে। আর দুনিয়া অর্জন যাহার ইল্‌মের উদ্দেশ্য, সে স্বয়ং সকলকে ভয় করে। অনন্তর খলীফা চল্লিশ হাজার দিরহাম তাঁহার সম্মুখে

স্থাপন করিয়া বলিলেন ঃ এই অর্থ কোন কার্যে ব্যয় করুন। তিনি বলিলেন ঃ যাও, এই অর্থ ইহার মালিককে দিয়া দাও। খলীফা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন ঃ ওয়ারিসসূত্রে হালাল মাল হইতে আমি ইহা পাইয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ ইহার প্রয়োজন আমার নাই। খলীফা বলিলেন ঃ উপযুক্ত পাত্রদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ আমি হয়ত ন্যায়ভাবে বন্টন করিব; কিন্তু কেহ হয়ত বলিবে যে, ন্যায়ভাবে বন্টন করা হয় নাই। তাহা হইলে সে পাপী হইবে। আমি ইহাও চাহি না। মোটকথা, তিনি সেই দিরহামগুলি গ্রহণ করিলেন না। প্রাচীনকালের আলিমগণ রাজা-বাদশাহের সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিতেন। আলিমগণ তাঁহাদের দরবারে গেলে এমনভাবেই যাইতেন যেরূপ হযরত তাউস (র) খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের নিকট গিয়াছিলেন।

কাহিনী ঃ খলীফা হিশাম মদীনা শরীফে গমন করতঃ সাহাবায়ে কিরাম (র) হইতে কোন একজনকে তাঁহার নিকট আনয়নের আদেশ করিলেন। লোকে তাঁহাকে জানাইল ঃ সকল সাহাবাই ইন্তিকাল করিয়াছেন। খলীফা আদেশ করিলেন ঃ তাবেঈগণের মধ্যে একজনকে আনয়ন কর। তদনুযায়ী হযরত তাউস (র)-কে তাঁহার নিকট আনয়ন করা হইল। তিনি খলীফার দরবারে প্রবেশ করিয়া পাদুকা খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هِشَامُ

"হে হিশাম! তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। তুমি কেমন আছ ?" ইহাতে খলীফা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিলেন। মদীনাবাসিগণ বলিলেন ঃ মদীনা নগরী রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র শহর এবং এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ আলিমগণের অন্যতম। সুতরাং এইরূপ সংকল্প করিবেন না। খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে তাউস! কেন তুমি এইরূপ দুঃসাহস ও বে-আদবী করিলে ? তিনি উত্তর করিলেন ঃ আমি কি করিয়াছি ? ইহাতে খরীফা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ঃ তুমি চারিটি বে-আদবী করিয়াছ ঃ (১) আমার ফরাসের একেবারে নিকটে আসিয়া জুতা খুলিয়াছ ঃ ইহা নিতান্ত অন্যায়। বরং মোজা ও জুতাসহ ফরাসের সম্মুখে বসা উচিত ছিল (অদ্যাবধি সেই খলীফা বংশে এই রীতি প্রচলিত আছে)। (২) আমাকে আমীরুল মু'মিনীন বলিয়া সম্বোধন কর নাই। (৩) আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়াছ; আমার কুনিয়াত (বংশ সম্পর্কিত উপনাম) উল্লেখ কর নাই (আমার জাতির নিকট ইহা অপছন্দনীয় ছিল)। (৪) আমার অনুমতি ব্যতীত আমার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়াছ এবং আমার হস্ত চুম্বন কর নাই।

হযরত তাউস (র) বলেন ঃ তোমার নিকটে আসিয়া জুতা খোলার কারণ এই যে, আমি সর্বাধিপতি আল্লাহ্র সম্মুখে জুতা খুলিয়া দৈনিক পাঁচবার তাঁহার দরবারে গমন করিয়া থাকি; কিন্তু তিনি কখনও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না। তোমাকে আমীরুল মু'মিনীন এইজন্যই বলি নাই যে, সমস্ত লোক তোমার খিলাফতে সম্মত নহে। অতএব

মিথ্যা বলিতে আমি ভয় করিয়াছি। তোমাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়াছি, কুনিয়াত উল্লেখ করি নাই। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাগণকে নাম ধরিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন, যেমন 'হে দাউদ', 'হে ইয়াহইয়া', 'হে ঈসা', এবং স্বীয় শত্রুগণকে কুনিয়াত ধরিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; যেমন "আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক।" তোমার হস্ত চুম্বন না করার কারণ এই যে, আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ কামভাবের সহিত স্বীয় স্ত্রীর এবং স্নেহের সহিত স্বীয় পুত্রের হস্ত ব্যতীত অপর কাহারও হস্ত চুম্বন করা দুরস্ত নহে। আর তোমার নিকট উপবেশন করার কারণ এই যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ কেহ কোন দোযখীকে দেখিতে চাহিলে তাহাকে বলিয়া দাও সে যেন এমন ব্যক্তিকে দেখে, যে স্বয়ং বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে আল্লাহ্র বান্দাগণ হাত বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইয়া থাকে।

এই উত্তরে হিশাম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলেন ঃ হযরত আলী (রা) বলেন যে, দোযখে পর্বত সমান সর্প ও উষ্টসমান বিচ্ছু রহিয়াছে। যে শাসক প্রজাবৃন্দের উপর ন্যায় বিচার না করে, এই সমস্ত সর্প ও বিচ্ছু তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত তাউস (র) দণ্ডায়মান হইলেন এবং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কাহিনী ঃ খলীফা সুলাইমান ইব্ন মালিক মদীনা শরীফে উপস্থিত হইয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত আবূ হাযেম (র)-কে আনয়ন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ মৃত্যু আমাদের নিকট এত অপ্রিয় কেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ, দুনিয়াকে তোমরা সুসজ্জিত এবং পরকালকে উৎসন্ন করিয়াছ। সুসজ্জিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া উৎসন্ন করা স্থানে গমন লোকের নিকট স্বভাবতঃই অপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। খলীফা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ মানুষ আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে ? তিনি বলিলেন ঃ প্রিয়জনের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে মানুষের যেরূপ অবস্থা হয়, নেক্কার বান্দাগণের তদ্রূপ অবস্থা হইবে। আর অপরাধী পলাতক দাসকে গ্রেফতার করিয়া বলপূর্বক তাহার ক্রুদ্ধ প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, পাপী লোকের অবস্থা তদ্রূপ হইবে। খলীফা বলিয়া উঠিলেন ঃ হায়, সেখানে আমার অবস্থা কিরূপ হইবে যদি জানিতে পারিতাম! তিনি বলিলেন ঃ কুরআন শরীফের প্রতি লক্ষ্য কর, তবেই জানিতে পারিবে। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ

নেক্কার লোকেরা নিশ্চয়ই আরাম ও আনন্দে থাকিবে এবং বদকার লোকেরা নিশ্চয়ই দোযখে থাকিবে।

খলীফা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ করুণাময় আল্লাহ্র রহমত কোথায় ? তিনি উত্তর করিলেন ঃ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ নেককার লোকগণের নিকটে।

সেকালে আলিমগণ রাজা-বাদশাহ্দের সহিত তদ্রূপ কথা-বার্তাই বলিতেন; কিন্তু দুনিয়ালাভের উদ্দেশ্যে যাঁহারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা দু'আ ও প্রশংসা কীর্তন ব্যতীত রাজা-বাদশাহ্দের সহিত কথা বলেন না। তাঁহারা ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন বাক্যসমূহ আবিষ্কার করেন যাহাতে বাদশাহ্কে সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। বাদশাহ্দের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা শরীয়তের হীলা অন্বেষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি কোন সময় রাজা-বাদশাহ্কে উপদেশ প্রদান করেন তবে স্বীয় সম্মানলাভের উদ্দেশ্যেই ইহা করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ এই যে, অপর কেহ তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাকে হিংসা করিয়া থাকেন।

অত্যাচারীদের সহিত মেলামেশা না করা এবং তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন না করা সর্বাবস্থায়ই উত্তম। আর তাহাদের বন্ধুবর্গ এবং চাটুকারদের সহিতও বন্ধুত্ব স্থাপন না করা উচিত। নির্জনবাস অবলম্বন এবং অপরাপর লোকের সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন না করা ব্যতীত অত্যাচারীদের সহিত বন্ধুত্ব বর্জন করিতে না পারিলে নির্জনবাস অবলম্বন এবং সকলের সহিত মেলামেশা বর্জন করাই সঙ্গত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যতদিন পর্যন্ত আমার উম্মতের আলিমগণ শাসকদের অনুকূল্য না করিবে ততদিন পর্যন্ত আমার উম্মতের লোকগণ সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য ও আশ্রয়ে থাকিবে।

ফল কথা এই যে, রাজা-বাদশাহ্গণের বিকৃতির কারণে প্রজাবৃন্দের বিকৃতি ঘটে এবং আলিমগণের বিকৃতির কারণে রাজা-বাদশাহগণের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। কেননা, আলিমগণ বিকৃত হইয়া পড়িলে তাঁহারা রাজা-বাদশাহ্দের সংশোধন করেন না এবং তাঁহাদের অপকর্মে অসম্মতি প্রকাশ করেন না।

গরীব-দুঃখীদের মধ্যে রাজ প্রদত্ত ধন বিতরণের শর্ত ঃ কোন বাদশাহ্ কোন আলিমের নিকট গরীবের মধ্যে বিতরণের জন্য ধন প্রেরণ করিলে এমতাবস্থায় যদি তাঁহার জানা থাকে যে, এই ধনের নির্দিষ্ট মালিক আছে, তবে উহা কখনই বন্টন করা সঙ্গত নহে; বরং এই ধন ইহার প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্য বলিয়া দিয়া প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এই ধনের মালিক পাওয়া না গেলেও কতিপয় আলিম ইহা গ্রহণ ও বিতরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আলিমদের (ইমাম গায্যালীর) মতে অত্যাচারী শাসকের নিকট হইতে সেই অর্থ গ্রহণ করতঃ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে সেই অর্থ তাহার হাতে থাকিয়া উৎপীড়ন ও পাপকার্যে খরচ হইতে না পারে এবং দরিদ্রগণ কিছুটা সুখলাভ করিতে পারে। কারণ অত্যাচারলব্ধ ধন প্রকৃত মালিককে ফিরাইয়া দেওয়ার উপায় না থাকিলে তিনটি শর্ত অনুযায়ী তাহা দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে।

প্রথম শর্ত ঃ আলিম ব্যক্তি বিতরণের জন্য সেই ধন গ্রহণ করাতে শাসক যেন এইরূপ বিশ্বাস করার সুযোগ না পায় যে, উহা হালাল। কারণ তাহার মনে এই ধারণার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে যে, হালাল না হইলে আলিম কখনও উহা গ্রহণ করিতেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে হারাম মাল অর্জনে শাসকগণ নির্ভীক হইয়া পড়িবে। গরীব-দুঃখীদিগকে দানের পূণ্য অপেক্ষা হারাম মাল অর্জন শাসকদিগকে নির্ভয় করিয়া দেওয়ার ক্ষতি অনেক বেশী।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ উক্ত মাল গ্রহণকারী আলিম এমন না হন যে, আপরাপর লোক শাসকদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ ব্যাপারে তাঁহার অনুসরণ করে; কিন্তু পরে উহা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে না। যেমন, কেহ কেহ উক্ত ধন গ্রহণের অনুকূলে এই প্রমাণ আনয়ন করিয়াছে যে, হযরত ইমাম শাফিঈ (র) খলীফাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, তিনি এই ধন গ্রহণ করতঃ সমস্তই গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। এ বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে ঃ

একদা হযরত ওহাব ইব্ন যুনাব্বিহ (র) ও হযরত তাউস (র) খলীফা হাজ্জাজের ভ্রাতার নিকট গমণ করেন। হযরত তাউস (র) হাজ্জাজের ভ্রাতাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন শীতকালীন প্রাতঃকাল, খুব শীত পড়িয়াছিল। আমীরের নির্দেশক্রমে লোকে একটি চাদর হযরত তাউস (র)-এর স্কন্ধদেশে চাপাইয়া দিল। তিনি চেয়ারে বসিয়া হেলিয়া দুলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। চাদরটি তাঁহার স্কন্ধ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার দানের অবমাননা হইতে দেখিয়া হাজ্জাজের ভ্রাতা খুব রাগান্বিত হইলেন। বুযর্গদ্বয় বহির্গত হইলে হযরত ওহাব (র) হযরত তাউস (র)-কে বলেন ঃ আপনি চাদরটি গ্রহণ পূর্বক কোন গরীবকে দিয়া দিলে ভাল হইত এবং এই আমীরও রাগান্বিত হইতেন না। হযরত তাউস (র) বলেন ঃ আমার আশংকা হইল যে, আমার অনুকরণে অপর লোকে শাসকদের ধন গ্রহণ করে; অথচ তাহারা ইহা জানিতে পারিত না যে আমি উহা গ্রহণপূর্বক গরীবকে দান করিয়াছি।

তৃতীয় শর্ত ঃ বিতরণ করিবার জন্য ধন প্রেরণের কারণে অত্যাচারীর প্রতি যেন ভালবাসা না জন্মে। কেননা, অত্যাচারীর প্রতি ভালবাসা বহু পাপের কারণ হইয়া থাকে; চাটুকারিতা ও খোশামোদের উপলক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। ভালবাসা জন্মিলে আবার সেই অত্যাচারীর মৃত্যু বা অবনতিতে দুঃখ-কষ্ট এবং তাহার মর্যাদা ও রাজ্য বৃদ্ধিতে আনন্দ হইয়া থাকে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) প্রার্থনা করিতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্! কোন পাপিষ্ঠকে আমার উপকার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিও না। উপকার করিতে দিলে আমার মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।" এইরূপ প্রার্থনার কারণ এই যে, উপকারীর প্রতি মানব-মন অবশ্যই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অথচ আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

যাহারা অত্যাচার করে তাহাদের প্রতি তোমরা আকৃষ্ট হইও না।

কাহিনী ঃ এক খলীফা হযরত মালিক ইব্ন দীনার (র)-এর নিকট দশ হাজার দিরহাম প্রেরণ করেন। তিনি সমস্ত মুদ্রা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন; নিজে এক কপর্দকও রাখেন নাই। হযরত মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসে (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ সত্য বল, এই দশ হাজার মুদ্রা তোমায় প্রেরণ করার কারণে তোমার হৃদয়ে খলীফার প্রতি ভালবাসা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা ? তিনি উত্তরে বলিলেন ? হ্যাঁ, বৃদ্ধি পাইয়াছে। হযরত ইব্ন ওয়াসে (র) বলিলেন ঃ আমিও এই আশংকাই করিতেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই মুদ্রাগুলির আপদ তোমার অন্তরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বস্‌রা নগরে এক বুযর্গ ছিলেন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করতঃ দরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিতেন। লোকে তাঁহকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার হৃদয়ে বাদশাহের প্রতি ভালবাসা জন্মিবে বলিয়া কি আপনার আশংকা হয় না ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ কেহ যদি আমার হস্ত ধারণপূর্বক আমাকে বেহেশ্‌তেও পৌছাইয়া দেয় এবং তৎপর সে পাপ করে। আমি তাহাকেও শত্রু মনে করিব। আর আমাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাওয়ার জন্য যে ব্যক্তি সেই লোকটিকে আমার বশীভূত করিয়া দিয়াছে তাহাকেও আমি শত্রু মনে করিব।

নিজের মনের উপর কাহারও এইরূপ অধিকার থাকিলে তাঁহার জন্য বাদশাহদের ধন গ্রহণ করতঃ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া দুরস্ত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সর্বসাধারণ, বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশী, দাস-দাসী, দরিদ্রের হক আল্লাহর ওয়াস্তে আদায় করা

দুনিয়া আল্লাহ্‌র পথের মন্‌যিলসমূহের অন্যতম। এই মনযিলে সকলেই মুসাফির। আর সকলের উদ্দেশ্যই যখন এক, তখন সকল মুসাফির একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং সহযাত্রীদের মধ্যে ভালবাসা, একতা ও বন্ধুত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় এবং একে অন্যের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এই সমস্ত হকের বিবরণ তিনটি অনুচ্ছেদ বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ঃ কাহারও সহিত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও মানবতার উৎকৃষ্ট স্তরসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

বন্ধুত্বের ফযীলত ঃ আল্লাহ যাহার হিত কামনা করেন তাহাকে উৎকৃষ্ট বন্ধু দান করেন, যেন সে আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গেলে বন্ধু তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়; আর সে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকিলে বন্ধু তাহার সঙ্গী ও সহায়ক থাকে। তিনি আরও বলেনঃ দুইজন মু'মিন পরস্পর মিলিত হইলে একের দ্বারা অন্যের কোন ধর্মীয় উপকার না হইয়া পারে না। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ কোন ব্যক্তি অপরকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্বীয় ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিলে তাহাকে বেহেশতে এমন উন্নত মর্যাদা প্রদান করা হইবে যাহা অন্য কোন নেককার্য দ্বারা লাভ করা যায় না। হযরত আবূ ইদরীস খাওলানী (রা) হযরত মুআয (রা)-কে বলিলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ আমি তোমাকে শুভ সংবাদ প্রদান করি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি-কিয়ামত দিবস আরশের আশে পাশে কুরসীসমূহ স্থাপিত হইবে। কতিপয় লোক উহাতে উপবেশন করিবে। তাহাদের চেহারা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান হইবে। সমস্ত লোক তো ভীত থাকিবে, অথচ এই সকল কুরসীতে সমাসীন লোক নির্ভয়ে থাকিবে; সব লোক ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিবে; (কিন্তু) এই সকল লোক প্রশান্ত থাকিবে। কুরসীতে সমাসীন এই সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র

বন্ধু। তাহাদের কোন ভয় বা চিন্তা থাকিবে না। সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাঁহারা কে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللهِ

তাহারা এইরূপ লোক যাহারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে দুই ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তন্মধ্যে আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে অধিক ভালবাসেন যে স্বীয় বন্ধুকে অধিক ভালবাসে। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ যাহাদের একজন অপরজনের সহিত আমার উদ্দেশ্যে সাক্ষাত করে, একজন অপরজনের সহিত আমার উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আমার উদ্দেশ্যে একজন অপরজনকে ক্ষমা করে এবং আমার জন্য একে অন্যকে সহায়তা করে, তাহারা আমার বন্ধু হওয়ার যোগ্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ বলিবেন, যে সকল লোক আমার জন্য পরস্পর বন্ধুত্ব করিয়াছিল তাহারা কোথায় ? আজ মানবের আশ্রয়ের জন্য কোথাও ছায়া নাই; আমি তাহাদিগকে স্বীয় (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কিয়ামত- দিবস সাত প্রকার লোক আল্লাহ্র আরশের ছায়া লাভ করিবে, তাহারা ব্যতীত অপর কেহই কোন ছায়া পাইবে না।

১. সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্।

২. যে যুবক যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত রহিয়াছে।

৩. যে ব্যক্তি মস্জিদ হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় মস্জিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত সময়ে তাহার হৃদয় মস্জিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে।

৪. যে দুই ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মিলিত হয় এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সংসর্গ বর্জন করে।

৫. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করিয়া রোদন করে।

৬. যে ব্যক্তিকে কোন ধনবতী ও সুন্দরী যুবতী নিজের দিকে আহ্বান করে এবং সে বলে 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি।'

৭. সেই ব্যক্তি যেন ডান হাতে এমনভাবে দান করে যে তাহার বাম হাতও জানিতে না পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাহার মুসলমান ভ্রাতার সহিত সাক্ষাত করে, এক ফেরেশতা তাহার পশ্চাতে ঘোষণা করিয়া বলে-আল্লাহ্র বেহেশ্ত তোমার জন্য মুবারক হউক। তিনি আরও বলেনঃ এক ব্যক্তি তাহার কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেছিল। আল্লাহ্র আদেশে পথিমধ্যে এক ফেরেশ্তা তাহার সহিত সাক্ষাত করিল। ফেরেশ্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল- তুমি কোথায়

যাইতেছ ? সে বলিল-অমুক ভ্রাতার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেছি। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করিল-তাহার নিকট তোমার কোন কাজ আছে কি ? সে বলিল-কোন কাজ নাই। ফেরেশ্তা আবার জিজ্ঞাসা করিল--তাহার সহিত তোমার কোন আত্মীয়তা আছে কি ? সে বলিল-কিছুই নহে। ফেরেশ্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল-সে তোমার কোন উপকার করিয়েছে কি ? সে বলিল-কিছুই নহে। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করিল- তবে কেন যাইতেছ ? সে বলিল-আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাহার নিকট যাইতেছি এবং তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ফেরেশতা বলিল-তোমাকে এই শুভ সংবাদ প্রদানের জন্য আল্লাহ্ আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তিকে তুমি ভালবাস বলিয়া আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসেন এবং তোমার জন্য তাঁহার উপর বেহেশ্ত ওয়াজিব করিয়া লইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ সেই বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা ঈমানের দৃঢ়তম দলীল যাহা আল্লাহ্র ওয়াস্তে হইয়া থাকে।

আল্লাহ্ কোন নবী (আ)-এর উপর ওহী প্রেরণ করিলেন, তুমি যে যুহদ (অর্থাৎ সংসার বিরাগ ও পরকাল আসক্তি) অবলম্বন করিয়াছ, ইহাতে স্বীয় শান্তি লাভের জন্য তাড়াতাড়ি করিয়াছ। কারণ ইহাতে সংসার ও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি পাইয়াছ। আর তুমি যে আমার ইবাদতে মশ্গুল হইয়াছ ইহাতে স্বীয় মর্যাদা লাভ করিয়াছ। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তুমি কি কখনও আমার বন্ধুগণের সহিত বন্ধুত্ব এবং আমার শত্রুদের সহিত শত্রুতা করিয়াছ ? আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ)-র উপর ওহী প্রেরণ করিলেন ঃ তুমি যদি পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দের সমস্ত ইবাদত একা সম্পন্ন কর এবং এই সকল ইবাদতের মধ্যে আমার উদ্দেশ্যে অন্যের সহিত বন্ধুত্ব বা শত্রুতা না থাকে তবে এই সমস্ত ইবাদত নিষ্ফল।

হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ পাপীদের সহিত শত্রুতা করিয়া তোমরা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হও, তাহাদিগ হইতে দূরে থাকিয়া আল্লাহ্র নিকটবর্তী হও এবং তাহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়া আল্লাহ্র সন্তোষ অন্বেষণ কর। লোকে জিজ্ঞাসা করিলঃ হে রূহুল্লাহ! আমরা কাহার সহিত উঠাবসা করিব ? তিনি বলিলেন ঃ এমন লোকের নিকট বস যাহাকে দর্শন করিলে আল্লাহ্র স্মরণ তোমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়, যাহার কথা তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং যাহার কার্যাবলী আমাদিগকে পরকালের প্রতি আকৃষ্ট করে। আল্লাহ্ হযরত দাঊদ (আ)-র উপর ওহী প্রেরণ করিলেন ঃ হে দাঊদ! মানব-সমাজ পরিত্যাগ করতঃ তুমি নির্জনে বসিয়াছ কেন ? তিনি নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তোমার মহব্বত আমার অন্তর হইতে সৃষ্টের স্মরণ বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে এবং আমি সকলের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি। নির্দেশ হইলঃ হে দাউদ! সাবধান হও এবং নিজের জন্য ভাই বন্ধু বানাইয়া লও। আর যে ব্যক্তি ধর্ম-পথে তোমার

সহায়ক না হয়, তাহা হইতে দূরে থাক; কারণ সে ব্যক্তি তোমার হৃদয় অন্ধকার করিয়া ফেলিবে এবং তোমাকে আমা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র এক ফেরেশ্‌তা আছে, তাহার দেহের অর্ধাংশ বরফ দ্বারা ও অপর অর্ধাংশ অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট। এই ফেরেশ্‌তা বলে ঃ ইয়া আল্লাহ্‌! যেমন তুমি বরফ ও অগ্নির মধ্যে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছ তদ্রূপ তোমার নেক বান্দাগণের অন্তরে সখ্যতা স্থাপন করিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তে লোহিত বর্ণ ইয়াকূত নির্মিত একটি স্তম্ভ তৈয়ার করা হইবে। ইহার উপর সত্তর হাজার বালাখানা থাকিবে। তথা হইতে তাহারা বেহেশতবাসিগণকে ঝুঁকিয়া দেখিবে। তাহাদের মুখমণ্ডলের জ্যোতি বেহেশ্‌তবাসিগণের উপর এমনভাবে প্রতিফলিত হইবে যেমন পৃথিবীর উপর সূর্যকিরণ প্রতিফরিত হইয়া থাকে। বেহেশ্‌তবাসিগণ বলিবে-'চল, আমরা তাহাদিগকে দেখিয়া আসি।' তাহাদের পরিধানে সবুজ রেশমী পোশাক থাকিবে এবং তাহাদের ললাটে লিখিত থাকিবে اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللهِ। এই সকল লোক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপনকারী।

হযরত ইব্‌ন সামাক (র) মৃত্যুকালে আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্‌! তুমি জান, আমি পাপ করিবার সময় তোমার অনুগত বান্দাগণকে ভালবাসিতাম। এই কার্যের ফলস্বরূপ আমার পাপসমূহ মাফ করিয়া দাও। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনকারিগণ যখন একে অন্যকে দেখিয়া আনন্দিত হয় তখন তাহাদের নিকট হইতে গুনাহ্‌ এইরূপভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন বৃক্ষ হইতে পত্র ঝরিয়া পড়িতে থাকে।

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসার নিদর্শন ঃ একই মক্তব, মাদ্‌রাসা বা গ্রামে অবস্থান অথবা ভ্রমণে একত্রে থাকার কারণে যে ভালবাসার উৎপত্তি হয় তাহা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত নহে। আবার দেখিতে মনোহর, বচনে মিষ্টভাষী এবং অন্তরে সরল ও অকপট হওয়ার দরুন অপরের প্রতি যে ভালবাসার উদ্রেক হয়, তাহাও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত নহে। কাহারও সাহায্যে পদমর্যাদা কিংবা ধন-সম্পদ লাভ হইলে অথবা কাহারও সহিত সাংসারিক কোন কার্যে নিবদ্ধ থাকিলে যে ভালবাসা জন্মে তাহাও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসার অন্তর্গত নহে। আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের উপর যাহার ঈমান নাই তাহার সহিতও এইরূপ ভালবাসা জন্মিতে পারে। ঈমান ব্যতীত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসা হইতে পারে না।

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসার দুইটি সোপান আছে।

প্রথম সোপান ঃ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভালবাসা। কিন্তু এই স্বার্থ ধর্ম আল্লাহ্‌র জন্য হইতে হইবে। যেমন, ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা দেন বলিয়া উস্তাদকে ভালবাসা

এই বিদ্যার উদ্দেশ্য পরকাল হইলে এবং সাংসারিক পদমর্যাদা ও ধনলাভের জন্য না হইলেও উস্তাদের প্রতি ভালবাসাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালবাসা বলা যাইবে। কিন্তু পর্থিব মান-মর্যাদা ও ধন-দৌলত লাভ করা, বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে হইলে উহাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বলা যাইবে না। সদ্‌কা প্রদানকারী যদি এমন লোককে ভালবাসে যে তাহার নিকট হইতে সদ্‌কা গ্রহণপূর্বক শর্তানুসারে গরীব-দুঃখীদিগকে উহা পৌঁছাইয়া দেয় কিংবা তাহাদের আতিথ্য করিয়া থাকে অথবা এমন লোককে যদি ভালবাসে যে গরীব-দুঃখীদের জন্য উত্তমরূপে খাদ্য পাকাইয়া থাকে তবে এই ভালবাসা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বলিয়া গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি খাদ্য-বস্ত্র প্রদান করতঃ নিরুদ্বেগে ও একাগ্রচিত্তে ইবাদত করিবার সুযোগ দান করে তাহার প্রতি ভালবাসাও আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালবাসার মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু শর্ত এই যে, খাদ্য-বস্ত্র পাইয়া নিশ্চিত মনে ইবাদত করিবার উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে। বহু আলিম ও আবিদ এই উদ্দেশ্যে ধনীদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন এবং ফলে উভয় দলই আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করিয়া থাকেন।

মন্দ কার্য হইতে স্বামীকে বাঁচাইবে এবং এমন সন্তান জন্মিবার উপলক্ষ হইবে যে পিতার মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ করিবে, এই কারণে স্বীয় স্ত্রীকে ভালবাসিলে এই ভালবাসাও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসা বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ স্ত্রীকে ভরণ-পোষণের ব্যয়ও সদ্‌কার মধ্যে গণ্য। ভৃত্যে প্রভুর খেদমত করে এবং সে তাহার কার্যভার গ্রহণপূর্বক প্রভুকে নিশ্চিন্ত মনে ইবাদতের অবসর প্রদান করে বলিয়া ভৃত্যকে ভালবাসিলে ইবাদতে অবসর করার দরুন ভৃত্যের প্রতি যে ভালবাসাটুকু হয়, তাহা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসা বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার সওয়াবও পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় সোপান ঃ যে ভালবাসা নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তেই হইয়া থাকে এবং যাহাতে উভয় পক্ষের অন্য কোন প্রকার স্বার্থের লেশমাত্রও থাকে না, উহাই এই উচ্চ সোপানের ভালবাসা। ইহা পূর্বোক্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভালবাসা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। শিক্ষা প্রদান, শিক্ষা গ্রহণ, ইবাদতে অবসরলাভ এবংবিধ কোন প্রকার স্বার্থই ইহাতে থাকে না। আল্লাহ্‌র আজ্ঞানুবর্তী ও তাঁহার প্রিয়পাত্র বলিয়া কাহাকেও ভালবাসিলে ইহাকে এই শ্রেণীর ভালবাসা বলে। কিংবা অন্ততঃপক্ষে ইহা মনে করিয়াও যদি কেহ কাহাকেও ভালবাসে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁহারই সৃষ্টি, তবে ইহাও আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার বড় সওয়াব পাওয়া যাইবে। কারণ, এইরূপ ভালবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি এমন মহব্বত হইতে জন্মিয়া থাকে যাহা ইশ্‌কের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। যেমন, কেহ কাহারও প্রতি আশিক হইলে সে মাশুকের অলি-গলি এবং তাহার মহল্লাকেও ভালবাসে। আর প্রিয়জনের গৃহ প্রাচীরও তাহার নিকট প্রিয় হইয়া পড়ে। এমন কি যে কুকুর প্রিয়জনের গলিতে যাতায়াত করে,

ইহাও অন্যান্য কুকুর অপেক্ষা উক্ত আশিকের নিকট অধিক প্রিয় হইয়া উঠে। অতএব যাহারা তাহার প্রেমাস্পদকে ভালবাসে অথবা যাহাদিগকে তাহার প্রেমাস্পদ ভালবাসে তাহাদিগকে, এমন কি যাহারা প্রেমাস্পদের আজ্ঞানুবর্তী চাকর-বাকর, দাস-দাসী তাহাদিগকে এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনকেও প্রেমিক স্বতঃই ভালবাসিয়া থাকে। কারণ, প্রেমাস্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা স্বতঃই প্রেমিকের অন্তরে অনুপ্রবেশ করে। প্রিয়জনের প্রতি প্রেম যত অধিক, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ও তাহার অনুগত ব্যক্তিগণের প্রতিও সেই প্রেমের প্রতিক্রিয়ারূপ ভালবাসা তত অধিক হইয়া থাকে।

সুতরাং যাহার অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত বৃদ্ধি পাইয়া ইশ্কের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে তিনি সাধারণভাবে তাঁহার সমস্ত বান্দাকে এবং বিশেষভাবে তাঁহার প্রিয়পাত্রগণকে ভালবাসিয়া থাকেন। সমস্ত মাখলুকাত স্বীয় প্রেমাস্পদের অপরিসীম শক্তির পরিচায়ক ও তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের জ্বলন্ত নিদর্শন, এইজন্য তিনি এই সমস্তকেই ভালবাসিয়া থাকেন। অপর কারণ এই যে, আশিক মাশুকের হস্তলিপি ও শিল্পকলাকেও ভালবাসিয়া থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে কেহ নূতন ফল আনয়ণ করিলে তিনি উহার সম্মান করিতেন এবং স্বীয় চক্ষু মুবারকে লাগাইয়া বলিতেন যে, উহার সৃষ্টিকাল আল্লাহ্র নিকটবর্তী অর্থাৎ উহা প্রকৃত শিল্পী আল্লাহ্র নূতন শিল্প নৈপুণ্য।

আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতের দ্বিবিধ কারণ ঃ প্রথম, মানবের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ্র ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দানের কারণে মহব্বত; দ্বিতীয়, কেবল আল্লাহ্র জন্যই আল্লাহ্কে ভালবাসা। কোন বস্তু বা উদ্দেশ্যের সহিত উহার আদৌ কোন সংশ্রব নাই। ইহা অতি উচ্চ স্তরের মহব্বত। এই গ্রন্থের পরিত্রাণ খণ্ডে 'মহব্বত' অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে। মোট কথা, ঈমানের বল অনুপাতে আল্লাহ্র মহব্বত প্রবল হইয়া থাকে। ঈমান যত বলবান হইবে মহব্বতও ততই প্রবল ও প্রগাঢ় হইয়া উঠিবে। তৎপর ইহা আল্লাহ্র প্রিয়জনের মধ্যে সঞ্চারিত হইবে। স্বার্থ ও উপকারের কারণে ভালবাসার উদ্রেক হইলে পূর্বকালীন নবী ও ওলীগণের প্রতি কাহারও ভালবাসা জন্মিত না। অথচ তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা সকল মুসলমানের অন্তরেই রহিয়াছে। সুতরাং ধর্মপথের দিশারী আলিম, সূফী, সংসারবিরাগী এবং তাঁহাদের খাদিম ও বন্ধুগণের প্রতি যে ভালবাসা জন্মে, তাহা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে বলিতে হইবে। কিন্তু আল্লাহ্র রাস্তায় মান-সম্ভ্রম ও ধন-দৌলত উৎসর্গ করার পরিমাণ দ্বারাই তাঁহার প্রতি মহব্বতের পরিমাণ নির্ণয় করা চলে। কাহারও ঈমান ও মহব্বত এত প্রবল যে, তিনি নিজের যথাসর্বস্ব একবারেই আল্লাহ্র রাস্তায় উৎসর্গ করিয়া দিয়া থাকেন। যেমন হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার যথাসর্বস্ব

একবারেই আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিয়াছিলেন। আবার কেহ এইরূপও হইয়া থাকেন যে, তাঁহার অর্ধেক ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় উৎসর্গ করেন। যেমন, হযরত উমর (রা) এইরূপ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ অল্প ধন-সম্পদই আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিয়া থাকে। অল্পই হউক আর অধিকই হউক, কোন মুসলমানের হৃদয়ই এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা হইতে একবারে মুক্ত থাকিবে না।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শত্রুতার পরিচয় ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী বান্দাগণকে ভালবাসিবে সে স্বতঃ কাফির, জালিম, গুনাহ্গার ও ফাসিকদিগকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিবে। কারণ কেহ, কাহাকেও ভালবাসিলে সে বন্ধুর-বন্ধুকেও বন্ধু ও শত্রুকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এবং কাফির, জালিম, গুনাহ্গার ও ফাসিকগণ আল্লাহ্র শত্রু। কোন মুসলমান ফাসিক (পাপী) হইলে মুসলমান হওয়ার কারণে তাহাকে ভালবাসিতে হইবে এবং পাপের কারণে তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এইরূপ স্থলে ভালবাসা ও অসন্তুষ্টি একত্রে মিলিত হইবে। যেমন, এক ব্যক্তি এক পুত্রকে পুরস্কার প্রদান করিল কিন্তু অপর পুত্রকে কিছুই দিল না। এইরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, এক কারণে সে এক পুত্রকে ভালবাসে এবং অন্য এক কারণে সে অপর পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট; ইহা অসম্ভব নহে। কারণ, যেমন এক ব্যক্তির তিন পুত্র আছে। তন্মধ্যে একজন বুদ্ধিমান পিতৃভক্ত; দ্বিতীয়জন বোকা ও পিতার অবাধ্য এবং তৃতীয় জন নির্বোধ কিন্তু পিতৃভক্ত। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি প্রথম পুত্রকে ভালবাসিবে, দ্বিতীয় পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবে এবং তৃতীয় পুত্রকে পিতৃভক্ত হওয়ার জন্য ভালবাসিবে ও নির্বুদ্ধিতার দরুন তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবে। আচার-ব্যবহারে ইহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেননা সে প্রথম পুত্রকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিবে। দ্বিতীয় পুত্রকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে এবং তৃতীয় পুত্রের কিছুটা স্নেহ ও কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখিবে।

ফলকথা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তৎপ্রতি তোমার এইরূপভাব পোষণ করা কর্তব্য যে, যেন সে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে এবং বিরুদ্ধাচরণের পরিমাণ অনুযায়ী তুমিও তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া থাক। আবার আল্লাহ্র প্রতি তাহার বাধ্যতা ও আনুগত্যের পরিমাণ অনুযায়ী তাহাকে ভালবাসিতে হইবে যেন উহার প্রতিক্রিয়া পরস্পর আচার-ব্যবহার, কাজ-কারবার, সঙ্গ-সাহচর্য এবং কথাবার্তায় প্রকাশ পায়। এমনকি পাপীর সংসর্গে তুমি যাইবে না এবং তাহার সঙ্গে কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিবে। আর তাহার পাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলে তাহা হইতে বহুদূরে থাকিবে এবং তাহার পাপ সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে তাহার সহিত কথাবার্তা বন্ধ করিয়া তাহা হইতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইবে। অত্যাচারীর সাহিত পাপী অপেক্ষা অধিক রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু

যে ব্যক্তি কেবল তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছে তাহাকে ক্ষমা করা ও অত্যাচার সহ্য করিয়া যাওয়া উত্তম। এ সম্বন্ধে প্রাচীন বুযর্গগণের বিভিন্নরূপ অভ্যাস ছিল। কেহ কেহ ধর্মীয় বন্ধনও শরীয়তের শাসন দৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে পাপী ও অত্যাচারীর প্রতি খুব কড়া ব্যবহার করিতেন এবং হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) তাহাদের অন্যতম।

হারিস মজামী দর্শন-শাস্ত্রে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদসমূহ প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) উক্ত গ্রন্থকারের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তৎপর যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন। হয়ত কেহ এই ভ্রান্ত মতবাদগুলি পাঠ করিবে এবং উহা তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িবে। হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন বলিলেন ঃ কাহারও নিকট আমি কিছু প্রত্যাশা করি না। কিন্তু বাদশাহ আমাকে কিছু দান করিলে আমি তাহা গ্রহণ করিব। ইহাতে হযরত ইমাম সাহেব (র) তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; এমনকি তাঁহার সহিত কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি তখন হযরত ইমাম সাহেব (র)-র নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন ঃ আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। হযরত ইমাম সাহেব (র) বলিলেন ঃ হালাল জীবিকা ভোগ করা ধর্মের বিধান। কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে ঠাট্টা করা সঙ্গত নহে।

কেহ কেহ আবার সর্বপ্রকার পাপীকেই দয়ার চোখে দেখিতেন। কিন্তু এইরূপ দয়ার নিয়্যত সর্বদা পরিবর্তনশীল। কারণ, তাওহীদের প্রতি যাঁহার লক্ষ্য, তিনি আল্লাহ্র প্রবল প্রতাপান্বিত কবলে সকলকেই অস্থির অবস্থায় দেখিতে পান এবং সকলকেই দয়ার চোখে দেখিয়া থাকেন। এইরূপ মনোভাব খুব বড় কথা। কিন্তু নির্বোধ লোকদের ইহাতে ধোকায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ, এমন লোকও আছে, যে অপরের পাপ ও উৎপীড়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান না করিয়া অম্লান বদনে সহ্য করিয়া যায়। কিন্তু নির্বোধ ব্যক্তি ইহাকে তাওহীদের প্রভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অথচ তাওহীদের লক্ষণ এই যে, কেহ প্রহার করিলে, ধন-সম্পদ কাড়িয়া লইলে, অপমান করিলে অথবা গালি দিলে ক্রোধের সঞ্চার হয় না; বরং তিনি মনে করেন যে, সমস্তই আল্লাহ্র তরফ হইতে ঘটিতেছে এবং উহাতে মানুষের কোন হাত নাই। অতএব কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া তিনি তাহাদিগকে দয়ার চোখে দেখিয়া থাকেন। যেমন কাফিরগণ উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দান্দান (দাঁত) মুবারক প্রস্তরাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ফলে তাঁহার নূরাণী চেহারা মুবারক রক্তাপ্লুত হইয়া যায়। তখন তিনি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া এই দু'আ করিতে লাগিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

ইয়া আল্লাহ্! আমার কওমকে হিদায়ত কর। কারণ, নিশ্চয়ই তাহারা অজ্ঞান।

কিন্তু এমন যদি হয় যে, নিজের প্রতি অত্যাচার হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং আল্লাহ্র নাফরমানী করিলে নীরব থাকে, তবে ইহা ধর্ম-বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের অভাব, কপটতা ও বোকামি বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা তাওহীদের লক্ষণ নহে। সুতরাং যাহার উপর তাওহীদ তত প্রবল হইয়া উঠে নাই এবং সে পাপীকে পাপের দরুন অন্তরে শত্রু জ্ঞান করে না, ইহা তাহার ঈমানের দুর্বলতা ও পাপীর সহিত তাহার বন্ধুত্বের প্রমাণ। যেমন, কেহ তোমার বন্ধুকে মন্দ বলিলে তুমি যদি ইহাতে ক্রুদ্ধ না হও তবে বুঝা যাইবে যে, তোমার বন্ধুত্ব খাঁটি নহে।

আল্লাহ্র শত্রুর শ্রেণী বিভাগ ঃ আল্লাহ্র শত্রুগণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। সুতরাং তাহাদের প্রতি ক্রোধ পোষণ ও কঠোরতা অবলম্বনেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণী ঃ কাফিরগণ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে রত কাফিরদের প্রতি শত্রুতা স্বতঃই ফরয। তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে। অথবা বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ যিম্মী অর্থাৎ জান-মালের নিরাপত্তার প্রতিদানে জিযিয়া কর দান করত ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রয়ে বসবাসকারী অমুসলমানগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহাদের সহিতও শত্রুতা ফরয। তাহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে যেন তাহারা গুনাহর পাত্র হইয়া থাকে এবং সম্মান না পায় ও তাহাদের জীবনযাত্রা সংকীর্ণ করিয়া রাখিবে। তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা মাকরূহ তাহরীমা। এমনকি হারাম হওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ–

যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আপনি তাহাদিগকে সে সমস্ত লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে দেখিবেন না যাহারা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের বিরোধী।

যিম্মীদের উপর নির্ভর করা তাহাদিগকে মুসলমানের উপর শাসক ও বিচারকরূপে নিযুক্ত করা কবীরা গুনাহ্ এবং এইরূপ করিলে ইসলামের অবমাননা করা হয়।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ বিদআতীলোক যাহারা মানুষকে শরীয়ত বহির্ভুত নূতন নূতন কার্যের প্রতি আহ্বান করে তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের সহিতও শত্রুতা

প্রকাশ করা আবশ্যক যেন লোকের মনে তাহাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাহাদিগকে সালাম না দেওয়া, তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা না বলা এবং তাহাদের সালামের জওয়াব না দেওয়াই উত্তম। কারণ, তাহারা বিদআতের প্রতি আহ্বান করিলে লোকে যদি ঐদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে বিদ্আতের পাপ সমাজে বিস্তার লাভ করিবে এবং ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হইবে। কিন্তু বিদআতী ব্যক্তি সাধারণ লোক হইলে এবং সে অপরকে বিদআতের দিকে আহ্বান না করিলে তাহার প্রতি তদ্রূপ কার্য করা অতি সহজ।

চতুর্থ শ্রেণী ঃ এমন পাপী যাহাদের পাপের দরুন মানবের দুঃখ-কষ্ট হইয়া থাকে তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন— অত্যচার, মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ ও পক্ষপাতিত্ব করিয়া বিচার করা; কাহারো কুৎসা রটনা করা, পরনিন্দা করা। মানুষের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া। এই শ্রেণীর পাপীদিগ হইতে বিমুখ থাকা এবং তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা করা অতি উত্তম কার্য। তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা ঘৃণ্য কার্য এবং একেবারে হারাম করা হয় নাই। কারণ তাহা হইলে সমাজে বাস করা কষ্টকর হইত।

পঞ্চম শ্রেণী ঃ মদ্যপায়ী ও পাপে লিপ্ত এমন লোকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যাহাদের পাপের দরুন অপর লোকের কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট হয় না। এমন লোকের সহিত আচরণ অধিকতর সহজ। সংশোধনের আশা থাকিলে এমন লোকের সহিত নম্র ব্যবহার করা এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করা উত্তম। অন্যথায় তাহাদিগ হইতে বিমুখ থাকাই উত্তম। কিন্তু তাহাদের সালামের জওয়াব দেওয়া উচিত এবং তাহাদিগকে অভিশাপ দেওয়া সঙ্গত নহে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় এক ব্যক্তি কয়েকবার মদ্য পান করে। এই জন্য তাহাকে যথাবিহিত শাস্তি প্রদান করা হয়। এক সাহাবী (রা) তাহাকে অভিশাপ করিয়া বলিলেন ঃ তাহার ফাসাদ আর কতদিন চলিবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে অভিশাপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন ঃ শয়তান তাহার শত্রুতার জন্য যথেষ্ট; তুমিও শয়তানের সাহায্যকারী হইও না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বন্ধুত্বের যোগ্যতা ও বন্ধুর প্রতি কর্তব্য ঃ যোগ্যতা ঃ সকল মানুষই সংসর্গ ও বন্ধুত্বের যোগ্য নহে; বরং সংসর্গ এমন লোকের সহিত রাখা উচিত যাহার মধ্যে তিনটি গুণ আছে।

প্রথম গুণ ঃ বুদ্ধিমত্তা। কারণ, নির্বোধের সংসর্গে কোন কল্যাণের আশা নাই। নির্বোধের সহিত বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না এবং পরিণামে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। কেননা, নির্বোধ বন্ধুর উপকার করিতে গিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ এমন কাজ করিয়া বসিতে পারে যাহা তাহার অকল্যাণের কারণ হইয়া পড়ে। বুযর্গগণ বলেনঃ নির্বোধ হইতে দূরে থাকা সওয়াব এবং তাহার চেহারা দর্শন করা গুনাহ্। যাহাদের কার্যের হিতাহিত জ্ঞান নাই এবং বলিয়া দিলেও বুঝে না, তাহারাই নির্বোধ।

দ্বিতীয় গুণ ঃ সৎস্বভাব ও সচ্চরিত্রতা। কারণ, অসৎস্বভাবের লোকের সংসর্গে শান্তি লাভের আশা করা যায় না। যখন তাহার অসৎস্বভাব প্রবল হইয়া উঠিবে তখন সে তোমার প্রতি তাহার বন্ধুত্বের সকল কর্তব্য বিনাদ্বিধায় পদদলিত করিয়া ফেলিবে।

তৃতীয় গুণ ঃ সততা ও ধর্মপরায়ণতা। কারণ, যে ব্যক্তি পাপে অদম্য হইয়া পড়িয়াছে, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে না তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। আল্লাহ্ কুরআন শরীফে বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

"এইরূপ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে না যাহার অন্তরকে আমার যিকির হইতে গাফিল করিয়া দিয়াছে এবং যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুগমন করিয়া থাকে। বিদ্আতী লোক হইতে দূরে থাকা উচিত। কারণ, তাহার বিদআতের আপদ অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অধুনা এক শ্রেণীর বিদআতী গজাইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অপেক্ষা জঘন্য বিদআতী আর নাই। তাহারা বলে ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে বাধা প্রদান করা এবং তাহাদিগকে পাপ ও দুষ্কর্ম হইতে বিরত রাখার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, কোন লোকের সঙ্গেই আমাদের শত্রুতা নাই এবং তাহাদের উপর আমরা শাসকও নহি। এই উক্তিতে নিজের জন্য সর্ববিধ কার্য জায়েয করিয়া লওয়ার বীজ নিহিত রহিয়াছে এবং ইহা খোদাদ্রোহিতার মূল। আর ইহা জঘন্যতম বিদআত। এইরূপ বিদআতী লোকদের সহিত মেলামেশা করা কখনই সঙ্গত নহে। কারণ, এই শ্রেণীর বিদআত কুপ্রবৃত্তির পরিপোষক। শয়তান ইহার সাহায্য করিয়া ঐ প্রকার মনোভাবকে বেশ ভালভাবে সাজাইয়া তাহাদের সহিত মেলামেশাকারীর অন্তরে বসাইয়া দিবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে স্পষ্ট ইবাহতী (অবৈধ কাজকে বৈধকারী) বানাইয়া দিবে।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (র) বলেন ঃ পাঁচ প্রকার লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ কর। প্রথম ঃ মিথ্যাবাদী। কারণ, তাহার দ্বারা তুমি সর্বদা প্রতারিত হইবে। দ্বিতীয়ঃ নির্বোধ। কেননা, নির্বোধ ব্যক্তি তোমার উপকার করিতে গিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার অপকার করিয়া ফেলিবে। তৃতীয় ঃ কৃপণ কেননা, কৃপণ নিতান্ত প্রয়োজনকালে তোমার সহিত বন্ধুত্ব বর্জন করিবে। চতুর্থঃ ভীরু। কারণ এইরূপ ব্যক্তি প্রয়োজনের সময় তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। পঞ্চম ঃ ফাসিক, কারণ, ফাসিক এক লোক্‌মার বিনিময়ে কিংবা তদপেক্ষা অল্পমূল্যে তোমাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ এক লোকমা অপেক্ষা অল্প কিঃ তিনি বলিলেন ঃ এক

লোকমা-লাভের আশা। হযরত জুনাইদ (র) বলেন ঃ কুস্বভাবী আলিমের বন্ধুত্ব অপেক্ষা সৎস্বভাবী ফাসিকের বন্ধুত্ব আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

উপরিউক্ত গুণসমূহ সমষ্টিগতভাবে একই ব্যক্তির মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। অতএব বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে হইবে। কেবল ভালবাসা ও সখ্যতা তোমার উদ্দেশ্য হইলে সচ্চরিত্রবান লোক অন্বেষণ কর। ধর্মীয় কল্যাণ উদ্দেশ্য হইলে পরহিযগার আলিমের অনুসন্ধান কর এবং পার্থিব মঙ্গল উদ্দেশ্য হইলে দানশীল ও দয়ালু ব্যক্তির তালাশ কর। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শর্ত আছে।

সমাজে তিন শ্রেণীর লোক আছে। এক প্রকার লোকখাদ্যবস্তুর ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয়। তাহাদের ছাড়া লোকের চলে না। অপর এক শ্রেণীর লোক ঔষধসদৃশ। কোন সময় তাহাদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ তাহাদের ফাঁদে পড়িয়া যায়। অতএব তাহাদিগ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। মোটকথা এমন লোকের সহিত সংসর্গ রাখা উচিত যাহার দ্বারা তোমার অথবা তোমার দ্বারা তাহার ধর্মীয় কল্যাণ সাধিত হয়।

সংসর্গ ও বন্ধুত্বের কর্তব্য ঃ বিবাহ বন্ধনে যেমন স্ত্রী ও পুরুষের উপর পরস্পর কতকগুলি কর্তব্য আরোপিত হয়, তদ্রূপ ভ্রাতৃত্ব এবং সংসর্গের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইলেও ভ্রাতৃত্বের উপর কতগুলি কর্তব্য আরোপিত হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ দুই ভাইয়ের উদাহরণ এইরূপ দুই হাতের ন্যায় যাহার একটি অপরটিকে ধৌত করিয়া দেয়।

সংসর্গ ও বন্ধুত্বের কর্তব্য দশ শ্রেণীতে বিভক্ত

প্রথম কর্তব্য ঃ ধন-সম্পদের মধ্যে। যাঁহারা ভাই-বন্ধুর হককে অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করেন, এমনকি নিজের অংশও তাহাদিগকে প্রদান করেন তাঁহারা বন্ধুত্বের কর্তব্য আদায়ে সর্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন মদীনার আন্সারগণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ–

এবং তাহারা নিজেদের অপেক্ষা (মুহাজিরগণকে)অগ্রবর্তী রাখে যদিও নিজেরা ক্ষুধার্তই থাকুক না কেন।

যাহারা ভাই-বন্ধুকে নিজতুল্য মনে করে এবং স্বীয় ধনকে নিজের ও তাহাদের সকলের ধন বলিয়া মনে করে তাহারা বন্ধুত্বের কর্তব্য সম্পাদনে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহারা ভাই-বন্ধুকে গোলাম ও খাদিমের ন্যায় মনে করে এবং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু তাহাদিগকে অযাচিতভাবে দান করে, তাহারা সর্বনিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ভাই-বন্ধুগণকে যদি এইরূপ বস্তুই তোমার নিকট হইতে চাহিয়া

লইতে হয় তবে তুমি তাহাদের বন্ধু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রহিলে না। কারণ এমতাবস্থায় তোমার অন্তরে বন্ধুর দুঃখ-কষ্টের প্রতি সমবেদনা মোটেই নাই; এই বন্ধুত্ব আন্তরিক নহে, ইহা অভ্যাসজনিত সংসর্গ এবং ইহার কোনই মূল্য নাই।

হযরত উতবাতুল গোলাম (রা)-এর এক বন্ধু ছিলেন। বন্ধু তাঁহাকে একদিন বলিলেন ঃ আমার চারি হাজার দিরহামের প্রয়োজন। তিনি বলিলেন ঃ আইস, দুই হাজার দিরহার গ্রহণ কর। বন্ধু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন ঃ তোমার লজ্জা হয় না ? আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্বের দাবী করিতেছ, অথচ পার্থিব ধন-সম্পদকে উহার উপর প্রাধান্য দিতেছ।

এক বাদশাহের নিকট লোকে কতিপয় সূফী ব্যক্তির পরোক্ষ নিন্দা করিল। ফলে এই সমস্ত সূফী ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ হইল। হযরত আবুল হাসান নূরী (র)-ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন ঃ সর্বাগ্রে আমাকে হত্যা করুন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি সর্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন কেন? তিনি বলিলেন ঃ এ সমস্ত সূফী আমার ভাই-বন্ধু। আমার ইচ্ছা, অন্ততঃ এক মুহূর্তকাল পূর্বে নিজের জীবনের বিনিময়ে মুহূর্তের জন্য তাঁহাদের জীবন রক্ষা করি। বাদশাহ বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! যাঁহারা এরূপ মনুষ্যত্বের অধিকারী তাঁহাদিগকে হত্যা করা দুরস্ত নহে। ইহা বলিয়া তিনি সকলকে মুক্তি দিলেন।

হযরত ফতেহ মুসেলী (র) একদা এক বন্ধুর গৃহে গিয়া দেখিলেন বন্ধু ঘরে নাই। তাঁহার পরিচারিকাকে বলিলেন ঃ তোমার প্রভুর ক্যাশ বাক্সটি আন। পরিচারিকা ইহা উপস্থিত করিলে তিনি আবশ্যক পরিমাণে টাকা-পয়সা উহা হইতে চাহিয়া লইয়া গেলেন। গৃহে ফিরিয়া এই সংবাদ শ্রবণে প্রভু এত আনন্দিত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ সে দাসীকে আযাদ করিয়া দিলেন।

এক ব্যক্তি হযরত আবূ হুরাইয়া (রা)-এর নিকট গিয়া বলিতে লাগিল ঃ আমি আপনার সহিত বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিলেন ঃ ভ্রাতৃত্বের কর্তব্য আপনার জানা আছে কি ? আগন্তুক বলিলঃ না। তিনি বলিলেন ঃ ভ্রাতৃত্বের হকসমূহের মধ্যে একটি হক এই যে, তোমার স্বর্ণ-রৌপ্যের উপর তুমি আমা অপেক্ষা বেশী হকদার হইবে না। আগন্তুক বলিলঃ আমি এখনও এই স্তরে উপনীত হই নাই। তিনি বলিলেন ঃ ব্যাস্ তবে সরিয়া পড়। এ কার্য তোমার দ্বারা হইতে পারে না।

হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ এক সাহাবীর নিকট এক ব্যক্তি ভাজ করা গোশ্ত প্রেরণ করিল। তিনি বলিলেন ঃ আমার অমুক বন্ধু খুব অভাবগ্রস্ত। তাহাকে দেওয়া উত্তম এবং (এই বলিয়া) গোশ্তগুলি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তথায় পৌছিলে তিনি তদ্রূপ উহা তাঁহার অপর এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আবার তাঁহার অন্য বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মোটকথা, এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে

গোশ্ত আবার প্রথম বন্ধুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

হযরত মাসরূক (র) ও হযরত খুসাইমা (র)-এর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা উভয়েই ঋণগ্রস্থ ছিলেন। তাঁহারা একে অন্যের ঋণ গোপনভাবে পরিশোধ করিলেন যে, কোন বন্ধুই তাহা জানিতে পারেন নাই।

বন্ধুত্বের ফযীলত ও দায়িত্ব ঃ হযরত আলী (রা) বলেন ঃ কোন গরীবকে একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা কোন বন্ধুর জন্য বিশ দিরহাম ব্যয় করাকে আমি উৎকৃষ্টতর মনে করি। রাসূলুল্লাহ (সা) অরণ্য হইতে দুইটি মিস্ওয়াক কাটিয়া লইলেন। তন্মধ্যে একটি ছিল বাঁকা ও অপরটি সোজা। তাঁহার সঙ্গে এক সাহাবীকে সোজা মিস্ওয়াকটি দিয়া দিলেন এবং নিজে বাঁকাটি রাখিলেন। সাহাবী নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মিসওয়াকটি ভাল। ইহা আপনার নিজের জন্য রাখুন। তিনি বলিলেন ঃ কেহ কাহারও সহিত ক্ষণকাল সঙ্গদান করিলেও কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসা করা হইবে, সাহচর্যের হক আদায় করা হইয়াছে, না নষ্ট করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই উক্তিতে এইদিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অপরের উপকার করা বন্ধুত্বের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ পরস্পর দুই বন্ধুর মধ্যে যে ব্যক্তি অপরকে অধিক দয়া ও সাহায্য করে আল্লাহ্ তাহাকে অধিক ভালবাসেন।

দ্বিতীয় কর্তব্য ঃ সর্বাবস্থায় অভিলাষ ও প্রার্থনা করিবার পূর্বেই সন্তুষ্ট চিত্তে বন্ধুর সাহায্য করা। প্রাচীন কালের বুযর্গগণের এইরূপ অভ্যাস ছিল যে, তাঁহারা প্রত্যহ বন্ধুগণের দ্বারে গমনপূর্বক গৃহবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ আপনারা কি করিতেছেন ? লাকড়ী, আটা, তৈল, লবণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস গৃহে মওজুদ আছে কিনা ? তাঁহারা ভ্রাতৃ-বন্ধুগণের কার্যকে নিজেদের কার্যের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাদের কোন কার্য করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন।

হযরত হাসান বস্রী (র) বলেন ঃ ধর্ম-ভ্রাতা আমার নিকট স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি অপেক্ষা অধিক প্রিয় কারণ, তাহারা ধর্ম স্মরণ করাইয়া দেয় এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। হযরত আতা (র) বলেন ঃ তিন দিন পর পর স্বীয় বন্ধুগণের খোঁজ-খবর লও। বন্ধু পীড়িত থাকিলে সেবা কর। কোন কার্যে লিপ্ত থাকিলে সাহায্য কর এবং আল্লাহ্র যিকির হইতে অসতর্ক থাকিলে স্মরণ করাইয়া দাও। হযরত জাফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ শত্রু আমা হইতে নির্লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি তাহার অভাব মোচনে অতি তাড়াতাড়ি করিয়া থাকি। এমতাবস্থায় বন্ধুদের জন্য আমার কি করা উচিত! প্রাচীনকালের জনৈক বুযর্গ স্বীয় বন্ধুর মৃত্যুর পর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গের সেবা করিয়া বন্ধুত্বের কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় কর্তব্য ঃ ভাই-বন্ধুগণের সহিত প্রিয়বাক্য বলা এবং তাহাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করা। বন্ধুর পশ্চাতে কেহ তাহাকে অন্যায় বলিলে ইহার যথাযথ উত্তর দিবে এবং মনে করিবে, বন্ধু অন্তরালে থাকিয়া সব শুনিতেছে। বন্ধু সর্বদা তোমার পশ্চাতে থাকুক, ইহা তুমি যেমন কামনা কর, তুমিও তদ্রূপ তাহার পশ্চাতে থাকিবে। চালাকি করিবে না। বন্ধু কিছু বলিলে তাহা মানিয়া লইবে, কোনরূপ প্রতিবাদ করিবে না। তাহার গোপন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। এমনকি বন্ধুত্ব ভঙ্গ হইয়া গেলেও প্রকাশ করিবে না। বন্ধুর গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া মন্দ স্বভাবের পরিচায়ক। তাহার স্ত্রী, সন্তানাদি ও বন্ধু-বান্ধবের নিন্দা করিবে না। কেহ তাহার দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করিলে উহা তাহার নিকট বলিবে না। কারণ, বলিলে তুমি তাহাকে কষ্ট দিলে। কিন্তু লোক বন্ধুর প্রশংসা করিলে ইহা তাহার নিকট গোপন করিবে না। কেননা বন্ধুর প্রশংসা গোপন করা তাহার প্রতি হিংসার প্রমাণ। বন্ধু তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে তজ্জন্য কোনরূপ অভিযোগ না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবে এবং আল্লাহ্র ইবাদতে স্বীয় দোষ-ত্রুটি স্মরণ করিবে। তাহা হইলে তোমার নিকট কেহ অপরাধ করিলে ইহাকে বিস্ময়কর বলিয়া মনে করিবে না এবং ইহাও বুঝিবে যে, সংসারে নির্দোষ ও ত্রুটিহীন মানুষ কখনই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। একেবারে নির্দোষ ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে চাহিলে মানব সমাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে। হাদীস শরীফে আছে যে, মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা অপরের ত্রুটির পশ্চাতে কোন উপযুক্ত ওযর (কারণ) আছে বলিয়া মনে করে। আর মুনাফিক সর্বদা অপরের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করিতে থাকে।

বন্ধুর একটি উপকারের বিনিময়ে তাহার দশটি ত্রুটি গোপন করিয়া রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অসৎ বন্ধু হইতে (আল্লাহ্র সমীপে) আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, দোষ-ত্রুটি দেখিলে সে প্রকাশ করিয়া দেয় এবং কোন ভাল আচরণ দেখিলে উহা গোপন করিয়া রাখে। বন্ধুর কোন অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হইলে তাহা ক্ষমা করিয়া দিবে এবং তাহার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করিবে। কারণ কাহারও প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ মু'মিনগণের চারি বস্তু অপরের উপর হারাম করিয়াছেন--ধন, প্রাণ মান-মর্যাদা ও কুধারণা পোষণ।

হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ তোমরা সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে কি মনে কর যে, তাহার নিদ্রিত ভ্রাতার গুপ্ত অঙ্গ হইতে কাপড় সরাইয়া তাহাকে উলঙ্গ করিতে থাকে ? লোকে বলিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহাকে কে সঙ্গত মনে করিবে ? তিনি বলিলেন ঃ তোমরাই বরং মনে করিয়া থাক। কারণ, তোমরা তোমাদের ভাই-বন্ধুদের ত্রুটি প্রকাশ করিয়া থাক যেন অপর লোকে উহা জানিতে পারে।

বুযর্গগণ বলেন ঃ কাহারও সহিত তুমি বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা করিলে প্রথমে তাহাকে ক্রোধান্বিত করিয়া গোপনে তাহার নিকট লোক পাঠাও, যে তথায় তোমার আলোচনা করিবে। ইহাতে ঐ ব্যক্তি যদি তোমাদের কোন গোপন কথা প্রকাশ করে তবে বুঝিবে সে বন্ধুত্ব স্থাপনের উপযোগী নহে। বুযর্গগণ আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ন্যায় তোমার গোপন কথা জানিয়াও অপরের নিকট প্রকাশ করে না, তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর। এক ব্যক্তি তাহার এক বন্ধুর নিকট নিজের কোন গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করত ঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আমি যাহা বলিলাম তাহা তোমার স্মরণ আছে কি ? সে ব্যক্তি বলিলঃ না, ভুলিয়া গিয়াছি। বুযর্গগণ বলেন ঃ যে ব্যক্তি চারি অবস্থায় তোমার বন্ধুত্ব ভুলিয়া যায় সে বন্ধুত্বের উপযোগী নহে ঃ (১) আনন্দের সময়, (২) ক্রোধের সময়, (৩) লোভের সময় এবং (৪) প্রবৃত্তির তাড়নার সময়, এই চারি সময়ে বন্ধুত্বের কর্তব্য ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে।

হযরত আব্বাস (রা) স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা)-কে বলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) তোমাকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রবীণগণের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, সাধারণ পাঁচটি উপদেশ স্মরণ রাখিওঃ (১) তাঁহার গোপন তথ্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, (২) তাঁহার সম্মুখে কাহারও গীবত করিও না, (৩) তাঁহার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিও না, (৪) তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিও না, (৫) তোমা কর্তৃক কোন বিশ্বাষঘাতকতার কার্য যেন তিনি কখনও দেখিতে না পান।

বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদ করা অপেক্ষা অপর কিছুই বন্ধুত্বের পক্ষে এত অধিক ক্ষতিজনক নহে। বন্ধুর কোন কথায় প্রতিবাদ করিলে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তুমি যেন তাহাকে নির্বোধ ও মুর্খ এবং নিজেকে বুদ্ধিমান ও মহাজ্ঞানী মনে করিয়া তাহার প্রতি অহংকার ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছ। এইগুলি শত্রুতার নিদর্শন, বন্ধুত্বের পরিচায়ক নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ঃ তোমরা আপন ভ্রাতার কোন কথায় প্রতিবাদ করিও না। তাহাকে বিদ্রূপ করিও না, তাহার সহিত কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিও না।

বুযর্গগণ বলেন ঃ তুমি তোমার বন্ধুকে 'চল' বলিলে সে যদি জিজ্ঞাসা করে, কত দূর এবং কোথায় যাইতে হইবে; তবে সে বন্ধুত্বের উপযোগী নহে। তাহার উচিত অন্য কিছুই না বলিয়া তোমার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করা। হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (র) বলেন ঃ আমার এক বন্ধু ছিলেন। যাহাকিছু তাঁহার নিকট চাহিতাম তাহাই তিনি দিয়া দিতেন। একবার তাঁহার নিকট বলিলাম, অমুক বস্তু আমার প্রয়োজন আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'কতটুকু প্রয়োজন?' ইহার পর আমার অন্তর হইতে তাঁহার বন্ধুত্বের আস্বাদ হ্রাস পাইতে লাগিল।

মোটকথা, বন্ধুর কথা ও কার্যের সহিত যথাসম্ভব ঐক্য ও আনুকুল্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই বন্ধুত্ব স্থায়ী থাকে।

চতুর্থ কর্তব্য ঃ কথায় বন্ধুর প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা প্রকাশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ–

তোমাদের মধ্যে কেহ কাহাকে ভালবাসিলে তাহাকে উহা জানাইয়া দাও।

তিনি এই উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়াছেন যে, বন্ধু উহা জানিতে পারিলে তাহার হৃদয়েও ভালবাসা জন্মিবে। এমতবস্থায় বন্ধুর প্রতি ঐ ব্যক্তির ভালবাসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। সকল অবস্থাতেই বন্ধুর খোঁজ-খবর লইবে, সুখ-দুঃখে তাহার অংশীদার হইবে। বন্ধুকে সম্বোধন করিতে হইলে উত্তম নামে সম্বোধন করিবে। তাহার কোন উপাধি বা পদবী থাকিলে ইহা ধরিয়া ডাকিবে। সম্ভবত ঃ এই উপাধি তাহার খুব প্রিয় হইয়া থাকিবে।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ বন্ধুর বন্ধুত্ব ত্রিবিধ কারণে দৃঢ় হইয়া থাকে। (১) প্রিয় নামে সম্বোধন করিলে, (২) দর্শনমাত্র নিজে তাহাকে প্রথমে সালাম করিলে, (৩) আগে বন্ধুকে বসাইয়া পরে নিজে বসিবে। এতদ্ব্যতীত বন্ধুর অগোচরে তাহার পছন্দনীয় প্রশংসাবাদ করিবে। এইরূপে তাহার স্ত্রী, সন্তানাদি এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনেরও প্রশংসা করিবে। এইরূপ ব্যবহার বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হইয়া থাকে। আর বন্ধুকৃত উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুর সদিচ্ছার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে সৎকার্যের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিবে না।

বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাহাকে সাহায্য করা আবশ্যক। কেহ তাহার দোষারোপ করিলে উহা খণ্ডন করা উচিত। বন্ধুকে নিজের ন্যায় মনে করিবে। তোমার সম্মুখে তোমার বন্ধুকে অপর লোকে মন্দ বলিলে যদি তুমি কিছুই না বল তবে যেন লোকে তাঁহাকে প্রহার করিতে দেখিয়া তুমি তাহাকে সাহায্য না করিয়া নীরব হইয়া রহিলে। বরং প্রহার যন্ত্রণা অপেক্ষা বাক্যাঘাত অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেনঃ বন্ধুর অগোচরে আমার সম্মুখে কেহ তাহার সন্বন্ধে আলোচনা করিলে আমি মনে করি, তিনি যেন উপস্থিত থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছেন এবং তিনি উপস্থিত থাকিলে যেরূপ উত্তর দিতাম আমি তদ্রুপ উত্তরই দিয়া থাকি।

হযরত আবু দারদা (রা) একস্থানে দুইটি আবদ্ধ বলদকে শায়িত দেখিলেন। কিন্তু ইহাদের একটি যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন অপরটিও উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে তিনি অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেনঃ ধর্ম-ভাই-বন্ধুগণও এইরূপ

হইয়া থাকে (একজন দাঁড়াইলে অপরজনও দাঁড়ায় এবং একজন চলিতে আরম্ভ করিলে অপরজনও চলে)। দাঁড়ানো ও গমনে একে অন্যের অনুবর্তী হয়।

পঞ্চম কর্তব্য ঃ বন্ধুর প্রয়োজনীয় দীনী ইল্‌ম (ধর্ম বিদ্যা) তাহাকে শিক্ষা দেওয়া। কারণ, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা তাহাকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা করা বহুগুণে শ্রেয়। ইল্‌ম শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল না করিলে তাহাকে উপদেশ দিবে এবং আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করিবে। কিন্তু নির্জনে উপদেশ দিবে। ইহাতে বন্ধুর প্রতি তোমার অনুগ্রহ প্রমাণিত হইবে। কারণ, লোক-সম্মুখে উপদেশ দিলে বন্ধু লজ্জা পাইবে। মিষ্ট ভাষায় উপদেশ দিবে, শক্ত কথায় নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ-

এক মু'মিন অপর মু'মিনের দর্পণস্বরূপ।

এই হাদীসের মর্ম এই যে, স্বীয় দোষ-ত্রুটি একে অপরের নিকট হইতে জানিয়া লইবে। বন্ধু যদি অনুগ্রহপূর্বক তোমার দোষ-ত্রুটি নির্জনে তোমাকে জানাইয়া দেয় তবে এই অনুগ্রহের জন্য তাহার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, অসন্তুষ্ট হওয়া কখনই সঙ্গত নহে। ইহার উদাহরণ এইরূপ-যেমন কোন ব্যক্তি তোমাকে জানাইয়া দিল যে, তোমার কাপড়ে সাপ অথবা বিচ্ছু রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইবে না, বরং যে উপকার সে করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রতি তুমি কৃতজ্ঞ থাকিবে।

সমুদয় মন্দ স্বভাব মানুষের মধ্যে সাপ-বিচ্ছু সদৃশ। এই সমস্তের দংশন যন্ত্রণা কবরে আত্মার উপরে প্রকাশ পাইবে। উহাদের দংশন দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছুর দংশন হইতে বহুগুণে অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইবে। কারণ, দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছুর দংশন দেহের উপর হইয়া থাকে। হযরত উমর (রা) বলেনঃ আল্লাহ্‌র রহমত তাহার উপর বর্ষিত হউক যিনি আমার দোষ-ত্রুটি আমার সম্মুখে উপহারস্বরূপ তুলিয়া ধরেন।

হযরত উমর (রা), হযরত সালমান (রা) নিকট আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ ভাই-সালমান! সত্য সত্য বলুন, অপছন্দনীয় কোন্ কোন্ বিষয় আমার মধ্যে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন। হযরত সালমান (রা) বলিলেন ঃ এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ আপনাকে অবশ্যই বলিতে হইবে। তিনি অত্যাধিক পীড়াপীড়ি করার পর হযরত সালমান (রা) বলিলেন ঃ আমি শুনিয়াছি, এক ওয়াক্তে আপনার দস্তরখানে দুই প্রকার খাদ্য আনীত হয় এবং আপনার দুইটি পিরহান আছে, একটি দিবাভাগে ও অপরটি রাত্রিকালে ব্যবহারের জন্য। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ এই দুইয়ের কোনটিই সত্য নহে। আর কিছু শুনিয়াছেন কি? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ না।

হযরত হুযাইফা মারআশী (র) হযরত আস্‌বাত (রা)-কে পত্রযোগে জানাইলেন ঃ আমি শুনিলাম, তুমি নিজের ধর্মকে দুই হাব্বার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ। অর্থাৎ তুমি বাজারে কোন বস্তু ক্রয় করিতে চাহিলে বিক্রেতা উহার মূল্য এক দাঙ্গা দাবি করিয়াছিল। কিন্তু তুমি উহা দুই হাব্বার বিনিময়ে চাহিয়াছিলে। বিক্রেতা তোমাকে চিনিত বলিয়া দুই হাব্বাতেই তোমাকে দিয়া দিল। তোমার ধার্মিকতা ও পরহিযগারীর কারণে অনুগ্রহ করতঃ অল্প মূল্যে সে জিনিসটি তোমাকে দিল। মোহের আবরণ মস্তক হইতে খুলিয়া ফেল এবং মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও।

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পাঠ ও ধর্ম-বিদ্যা অর্জন করতঃ দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আমার আশংকা হয় সে আল্লাহ্‌র কালাম লইয়া উপহাস করিতেছে।

উপদেশদাতার প্রতি যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, বুঝা যায় যে, তাহার হৃদয়ে ধর্মের প্রতি অনুরাগ আছে। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ-

আর কিন্তু তোমার উপদেষ্টাগণকে ভালবাস না।

যে ব্যক্তি উপদেষ্টাগণকে ভালবাসে না, এইজন্য অহংকার, আত্মাভিমান তাহার ধর্ম ও বুদ্ধির উপর প্রবল হইয়া উঠে। মানুষ যখন নিজের দোষ-ত্রুটি মোটেই বুঝে না তখনই এইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু নিজের দোষ-ত্রুটি বুঝিলে তাহাকে আকারে-ইঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া উচিত, স্পষ্ট ভাষায় লোক সম্মুখে উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। আর বন্ধু যে অপরাধ কেবল তোমার নিকট করিয়াছে তাহা গোপন রাখা ও তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ সাজিয়া থাকাই উত্তম। কিন্তু এইরূপ অপরাধ গোপন রাখার শর্ত এই যে, বন্ধু হইতে তোমার মন যেন ফিরিয়া না যায়। আর যদি একান্ত ফিরিয়া যায় তথাপি বন্ধুর প্রতি তাহার অগোচরে অসন্তুষ্ট হওয়া বন্ধু-বিচ্ছেদ অপেক্ষা শ্রেয়। কিন্তু ঝগড়া-বিবাদ এবং বাক-বিতণ্ডার আশংকা থাকিলে বিচ্ছেদই শ্রেয়। উক্ত অবস্থায় বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, ভাই-বন্ধুদের দুর্ব্যবহারের কষ্ট সহ্য করিলে নিজের স্বভাব সংশোধিত হইবে, সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিলে পার্থিব উপকার হইবে, এইরূপ উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে।

হযরত আবূ বকর কাত্তানী (র) বলেন ঃ আমার এক বন্ধু ছিলেন ঃ তাঁহার ব্যবহারে আমার মনে কষ্ট ছিল। মনের এই কষ্ট যেন দূরীভূত হয় এই জন্য তাহাকে কিছু দান করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে তাহার হস্ত ধারণপূর্বক একদিন তাঁহাকে আমার গৃহে লইয়া আসিলাম এবং বলিলাম ঃ আপনার পায়ের তালু আমার মুখমণ্ডলের উপর স্থাপন করুন। তিনি বলিলেন ঃ ইহা কখনই হইতে পারে না। আমি বলিলাম ঃ আপনাকে অবশ্যই ইহা করিতে হইবে; বিনা কারণেই করিতে

হইবে। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি বাধ্য হইয়া স্বীয় পায়ের তালু আমার মুখের উপর স্থাপন করিলেন। ইহাতে আমার মনের সেই কষ্ট দূরীভূত হইল।

হযরত আবূ আলী রিবাতী (র) বলেন ঃ একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ্ রাযীর সঙ্গীরূপে সফরে বাহির হইলাম। তিনি বলিলেন ঃ সফরে সরদার কে হইবে? আমি-না তুমি? আমি বলিলাম আপনি হইবেন। তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইলে আমি যাহা বলিব তাহাই তোমাকে মানিতে হইবে। আমি বলিলাম ঃ আপনার নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া লইব। তৎপর তিনি একটি পেট্‌রা চাহিলেন এবং তাহা আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি আমাদের পাথেয় দ্রব্য, কাপড়-চোপড় সমস্ত উহাতে পুরিয়া স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং যাত্রাপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিয়া বলিলাম, গাঠুরিঠা আমার নিকট দিন, আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না এবং বলিলেন ঃ তুমি তাবেদার (আজ্ঞাবহ), সরদারের উপর তাবেদারের হুকুম চালাইবার অধিকার নাই। সফরে একবার সারারাত্রি বৃষ্টি হইতেছিল। তিনি আমার মাথার উপরে একখানি কম্বল ধরিয়া সারারাত্রি দণ্ডায়মান রহিলেন। যেন আমার শরীরে বৃষ্টির পানি পড়িতে না পারে। আমি কোন কথা বলিতে গেলেই তিনি বলিতেন ঃ মনে রাখিও আমি সরদার তুমি তাবেদার। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম ঃ হায়! তাঁহাকে যদি আমি সরদার না বানাইতাম।

ষষ্ঠ কর্তব্য ঃ বন্ধুর ত্রুটি ক্ষমা করা। বুযর্গগণ বলেন ঃ তোমার কোন বন্ধু তোমার নিকট কোন অপরাধ করিলে উহা হইতে তাহাকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য তাহার পক্ষের সত্তর প্রকার ওযর তুমি নিজের মন হইতে উপস্থিত করিবে। ইহাতেও যদি তোমার মন তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত না হয় তবে স্বীয় মনকে বলিবে, তোর স্বভাব অত্যন্ত মন্দ এবং তুই নিতান্ত নীচ বংশজাত। তোর বন্ধু সত্তর ওযর পেশ করিল, তবুও তুই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিস না। সেই অপরাধ পাপজনক হইয়া থাকিলে উহা বর্জনের জন্য তাহাকে নম্রভাবে উপদেশ দিবে। এইরূপ অপরাধ সে পুনরায় না করিলে তুমি তাহার প্রতি এমন ভাব দেখাইবে যে, তুমি যেন সেই সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও অবগত নও। কিন্তু বারবার সেই অপরাধ করিতে থাকিলে তুমিও তাহাকে উপদেশ দিতে থাকিবে। বারবার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোন ফল না হইলে এমতাবস্থায় কর্তব্য সম্বন্ধে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত আবু যর (রা) বলেন যে, এমতাবস্থায় বন্ধুত্ব ছিন্ন করা উচিত। কারণ, প্রথমে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং এখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব ছিন্ন করা আবশ্যক। হযরত আবু দারদা (রা) প্রমুখ কতিপয় সাহাবী বলেন যে, তেমন অবস্থায়ও বন্ধুত্ব ছিন্ন করা সমীচীন নহে। কারণ, আশা করা যায় যে, সে ঐ গুনাহ্ পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু এমন ব্যক্তির সহিত প্রারম্ভেই বন্ধুত্ব স্থাপন না করা

উচিত ছিল। একবার বন্ধুত্ব স্থাপন করতঃ উহা ছিন্ন করা সমীচিন নহে। হযরত নখঈ (র) বলেন, পাপের কারণে বন্ধুকে পরিত্যাগ করিও না। কারণ, হয়ত আজ সে পাপ করিতেছে, কাল করিবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আলিমের দোষকে উপেক্ষা কর। তাহার প্রতি আস্থা হারাইও না এবং তাহার সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করিও না। আশা করা যায় যে, তদ্রূপ পাপ হইতে তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

কথিত আছে, প্রাচীনকালের দুই বুযর্গের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ছিল। তাহাদের একজন কামপ্রবৃত্তির তাড়নায় কাহারও প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন এবং স্বীয় বন্ধুকে বলিলেন ঃ আমার হৃদয় প্রণয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ভ্রাতৃত্ব বর্জন এবং বন্ধুত্ব ছিন্ন করিতে পার। বন্ধু বলিলেন ঃ আল্লাহ্ করুন, একটি মাত্র পাপের কারণে আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করিব! লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, এক প্রণয় রোগের দরুন ভালবাসার সম্পর্ক কর্তন করিব। বরং তিনি দৃঢ়তার সহিত শপথ করিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত সর্ব রোগের নিরাময় কর্তা আল্লাহ্ তাহার বন্ধুর প্রণয় রোগ আরোগ্য না করেন ততদিন তিনি পানাহার করিবেন না; সম্পূর্ণ উপবাস থাকিবেন। চল্লিশ দিন তিনি কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিলেন না। তৎপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এখন আপনার অবস্থা কেমন? বন্ধু উত্তর করিলেন ঃ সেই একই অবস্থা, একই রকম বেদনা হা- হুতাশ। তিনি তৎপর পানাহার না করিয়া দিন দিন কৃশ হইতে কৃশতর হইতে লাগিলেন ঃ অনন্তর বন্ধু যখন তাহাকে জানাইলেন যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাহার প্রণয় রোগ দূরীভূত হইয়াছে তখন তিনি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন এবং পানাহার করিলেন।

এক ব্যক্তিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার বন্ধু ধর্ম পথ ত্যাগ করতঃ পাপে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আপনি তাহার সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করেন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আজ তাহার বন্ধুর নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, তিনি ধ্বংসের পথে চলিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমি তাহাকে বর্জন করিব কিরূপে? বরং ইহাই তাহাকে সাহায্য কবিবার প্রকৃষ্ট সময়। সদয় উপদেশ প্রদানে তাহাকে দোযখ হইতে রক্ষা করা কর্তব্য।

কথিত আছে, বনী ইসরাঈল বংশের দুই ব্যক্তি পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক পাহাড়ে ইবাদত করিতেন। একদা কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের জন্য তাঁহাদের একজন বাজারে গমন করেন। তথায় তাঁহার দৃষ্টি অকস্মাৎ এক কুলটা রমণীর প্রতি পতিত হওয়ায় তাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তথায়ই রহিয়া গেলেন। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন অপর বন্ধু তাহার খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঘটনা শ্রবণ করতঃ তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কুলটা রমণীর প্রেমাসক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া বলিলেন ঃ তুমি কে? আমি তোমাকে চিনি না। তিনি বলিলেন ঃ প্রিয় ভ্রাতাঃ উদ্বিগ্ন হইও না। অদ্যকার ন্যায় এত

ভালবাসা তোমার প্রতি ইতঃপূর্বে কখনই ছিল না। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ চুম্বন করিলেন। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বন্ধুর অনুগ্রহ দৃষ্টি হইতে তিনি তখনও বঞ্চিত হন নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি তওবা করিলেন। এবং বন্ধুর সহিত চলিয়া গেলেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, হযরত আবু যর (রা) মত অর্থাৎ পাপাসক্ত বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করা নিরাপত্তার নিকটবর্তী হইতে হযরত আবু দরদা (রা) মত অর্থাৎ তওবা করতঃ সৎপথে প্রত্যাবর্তনের আশায় পাপাসক্ত বন্ধুর বন্ধুত্ব ছিন্ন না করা অধিকতর ফিকাহ শাস্ত্রসম্মত ও অধিকতর সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রসূত। কারণ, বন্ধুর সহানুভূতি অবশেষে পাপাসক্ত ব্যক্তির তওবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অপর পক্ষে পাপ- পংকিলে লিপ্ত হইয়া মানব যখন আত্ম সংশোধনে অক্ষম ও অপারগ হইয়া পড়ে তখনই তাহার ধর্মবন্ধুর সাহায্য ও সহানুভূতির সর্বাধিক প্রয়োজন। সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করা যায় কিরূপে ?

বন্ধুত্ব স্থাপনের পর পাপাসক্ত হইয়া পড়িলে বন্ধুত্ব বর্জন না করা ফিকাহ শাস্ত্রসম্মত বলার কারণ এই যে, উভয়ের স্থাপিত বন্ধুত্ব আত্মীয়তার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। পাপের কারণে আত্মীয়তা ছিন্ন করা দুরস্ত নহে। এই জন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَإِنْ عَصَمُوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ–

যদি আত্মীয়-স্বজন তোমার প্রতি নাফরমানী করে তবে বলিয়া দাও, আমি তোমার কার্যের প্রতি অসন্তুষ্ট।

এ স্থলে নাফরমানের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার জন্য আল্লাহ্ বলেন নাই।

হযরত আবু দারদা (রা)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার ভ্রাতা পাপ করে। আপনি তাহাকে দুশমন বলিয়া গণ্য করেন না কেন ? তিনি বলিলেন ঃ আমি তাহার পাপের প্রতি তো অসন্তুষ্ট। কিন্তু সে আমার ভাই (তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারি কিরূপে ?)

পাপাচারী ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন না করাই উচিত। কারণ, বন্ধুত্ব স্থাপন করতঃ ইহা ছিন্ন করা প্রতারণা (খেয়ানত) কিন্তু বন্ধুত্ব স্থাপন না করা প্রতারণা নহে। আর বন্ধুত্ব ছিন্ন করিলে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর যে অধিকার প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা লংঘন করা হয়। সমস্ত আলিমই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

তোমার বন্ধু তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই উত্তম। অপরাধ করিয়া সে যদি দোষ-স্খলণের জন্য কারণ দর্শায় এবং তুমি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পার তথাপি উহা মানিয়া লইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতার ওযর গ্রহণ করে না সে ব্যক্তি রাস্তায় মুসলমানগণের নিকট হইতে খিরাজ আদায়কারীর ন্যায় পাপী (সাধারণত অমুসলমানগণের নিকট হইতে নির্ধারিত হারে যে ভূমিকর আদায় করা হয় তাহাকে খিরাজ বলে)। তিনি আরও বলেন ঃ মুসলমান শীঘ্র অসন্তুষ্ট হয় এবং শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (র) স্বীয় মুরীদকে বলেন ঃ তোমার কোন বন্ধু হইতে কোন অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করিলে তাহাকে তিরস্কার করিবে না। তিরস্কার করিলে তুমি হয়ত এমন কথা শুনিবে যাহা সে অন্যায় আচরণ হইতে অধিক পীড়াদায়ক। সেই মুরীদ বলেন ঃ আমি যাচাই করিয়া হযরত পীর সাহেবের উক্ত উপদেশ অনুযায়ী ব্যবহার পাইয়াছি।

সপ্তম কর্তব্য ঃ বন্ধুর জীবদ্দশায় ও তাহার মৃত্যুর পরও তাহার জন্য দু'আ করা। নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্য যেমন দু'আ করিয়া থাক তদ্রূপ তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্যও দু'আ করিবে। বস্তুত বন্ধুর জন্য দু'আ প্রকারান্তরে নিজের জন্যই হইয়া থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতার অগোচরে তাহার মঙ্গলের জন্য দু'আ করিয়া থাকে, ফেরেশতাগণ তাহার মঙ্গলের জন্য ঠিক তদ্রূপ দু'আ করিয়া থাকেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তখন স্বয়ং আল্লাহ্ দু'আকারী বন্ধুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ আমি প্রথমে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অগোচরে বন্ধুগণের জন্য দু'আ আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করেন না।

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন ঃ আমি সিজদায় সত্তরজন বন্ধুর নাম করিয়া তাঁহাদের জন্য দু'আ করিয়া থাকি। বুযর্গগণ বলেন ঃ তোমার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ যখন তোমার পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি বন্টনে ব্যস্ত থাকে তখন যে তোমার জন্য দু'আ করে এবং পরকালে আল্লাহ্ তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, এই আশংকায় যে বিহ্বল থাকে সে ব্যক্তিই তোমার বন্ধু।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পানিতে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায়। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন অবলম্বন পাওয়ার আশায় হাতড়াইয়া থাকে, মৃত ব্যক্তিও তদ্রূপ স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধুদের প্রতীক্ষায় থাকে।

আর জীবিতদের দু'আ নূরের পাহাড় হইয়া মৃতের কবরসমূহে পৌছিয়া থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নূরের ভাণ্ডে করিয়া দু'আ মৃতদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং বলা হয়, ইহা অমুকের পক্ষ হইতে তোমার নিকট উপহার। জীবিত

লোকে উপহার পাইয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, মৃত ব্যক্তিও তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টম কর্তব্য ঃ বন্ধুত্বের প্রতিদান হক কখনও না ভোলা। বন্ধুত্বের হক না ভোলার অর্থ ইহাও যে, বন্ধুর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও তাহার বন্ধুবর্গের খোঁজ-খবর লইতে হইবে।

এক বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সমবেত সাহাবায়ে কিরাম (রা) ইহাতে বিস্মিত হইলে হুজুর (সা) বলিলেন ঃ এই মহিলা বিবি খাদীজা (রা)-এর জীবদ্দশায় আমাদের এখানে আসিত।

বন্ধুত্বের কর্তব্য সম্পাদন করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। বন্ধুর মৃত্যুর পর তাহার পরিবারবর্গ, দাস-দাসী, শিষ্য প্রভৃতি যে সমস্ত লোকের তাহার সহিত সম্পর্ক ছিল, তাহাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি রাখাও বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততার মধ্যে গণ্য। বন্ধুর প্রতি যেরূপ ভালবাসা ও অনুগ্রহ ছিল তাহাদের প্রতি তদপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ করা কর্তব্য। উচ্চ পদ, ধন-দৌলত এমনকি রাজ্যলাভের পরও বন্ধুর প্রতি পূর্ব নম্রতা সৌজন্য প্রদর্শন করা, তাহার সহিত অহংকার না করা এবং সর্বদা বন্ধুত্ব দৃঢ় রাখা ও কোন কারণেই বন্ধুত্ব ছিন্ন না করাকে বন্ধুত্বের হক আদায় করা বলে। কারণ, ভাই-বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান শয়তানের বড় কাজ যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ

অবশ্যই শয়তান তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দেয়।

অন্যত্র হযরত ইউসুফ (আ) এর উক্তি উদ্বৃত করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَانِىْ

শয়তান আমার ও আমার ভাইগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার পর...."

বন্ধুর বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে ইহাতে কর্ণপাত না করা এবং যাহারা ঐরূপ বলে তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করাও বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততার নিদর্শন। বন্ধুর শত্রুকে ভাল না বাসা; বরং তাহাকেও নিজের শত্রু মনে করা বন্ধুত্বের পরিচয়। কারণ, যে ব্যক্তি বন্ধুর শত্রুকে ভালবাসে তাহার বন্ধুত্ব দুর্বল।

নবম কর্তব্য ঃ বন্ধুত্বের মধ্য হইতে লৌকিকতা উঠাইয়া দেওয়া এবং একাকী যেরূপভাবে থাকিতে অভ্যস্ত, বন্ধুর সহিতও তদ্রূপই থাকা। এক বন্ধু অপর বন্ধুর সহিত আচার-ব্যবহারে সামাজিক শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বুঝা যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে পূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় নাই।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ যে বন্ধুর নিকট তোমার ওযর পেশ করিবার ও লৌকিকতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়, সেই বন্ধুদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। হযরত জুনাইদ (র) বলেন ঃ আমি অনেক বন্ধু দেখিয়াছি। কিন্তু এমন বন্ধুযুগল দেখি নাই যাহাদের একের পদমর্যাদা অপরের বিষণ্ণতার কারণ হইয়াছে। তবে তাহাদের কাহারও মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকিলে স্বতন্ত্র কথা। বুযর্গগণ বলেন ঃ দুনিয়াদার লোকের সহিত শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া চলিবে। আর পরলোক প্রিয় ধর্মপরায়ণ লোকের সহিত ওজনসুলভ এবং আরিফগণের (অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি) সহিত তোমার ইচ্ছানুরূপ আচার-ব্যবহার করিবে। কতিপয় সুফী এই শর্তে একত্রে বাস করিতেন যে, তাহাদের মধ্যে কেহ সর্বদা রোযা রাখিলে বা রোযা না রাখিলে অথবা সারারাত্রি নিদ্রা গেলে বা সারারাত্রি নামায পড়িলে তাহাদের কেহই অপরের নিকট উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না।

ফলকথা, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বের অর্থ অন্তরঙ্গতা এবং যেখানে অন্তরঙ্গতা রহিয়াছে সেখানে লৌকিকতার স্থান নাই।

দশম কর্তব্য ঃ সমস্ত বন্ধুর সম্মুখে নিজকে সর্বাপেক্ষা অধম বলিয়া মনে করা; তাহাদের নিকট হইতে কোন স্বার্থলাভের আশা না করা। তাহাদের নিকট কোন বিষয় গোপন না করা এবং তাহাদের প্রতি সর্ববিধ কর্তব্য সম্পাদন করিতে থাকা।

হযরত জুনাইদ (র)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি বারবার বলিতেছিল ঃ আজকাল বন্ধু দুর্ভল। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তুমি যদি এমন বন্ধুর অনুসন্ধান কর, যে কেবল তোমার খেদমত করিবে তোমার শোক-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, তবে এমন বন্ধু দুর্লভ বটে। কিন্তু যদি এমন বন্ধু অন্বেষণ কর যাহার খেদমত তুমি করিবে এবং যাহার দুঃখে তুমি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে তবে এমন বন্ধু অনেক আছে।

বুযর্গগণ বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজকে বন্ধুগণের মধ্যে উত্তম মনে করে সে নিজে পাপী হইবে এবং তৎসঙ্গে অপর বন্ধুকেও পাপী করিবে। আর যে ব্যক্তি নিজকে অপর বন্ধুর সমকক্ষ মনে করিবে সে নিজেও মনঃকষ্ট ভোগ করিবে এবং তাহার বন্ধুও মনঃকষ্ট পাইবে। কিন্তু সে নিজকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিলে সকল বন্ধুই শান্তি ও আরামে থাকিবে। হযরত আবু মুআবিয়াতুল আসওয়াদ (র) বলেন ঃ আমার সকল বন্ধুই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমাকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সাধারণ মুসলমান, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও দাস-দাসীর প্রতি কর্তব্য ঃ প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্য তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতার তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে এবং

ঘনিষ্ঠতার বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী তাহাদের প্রতি কর্তব্যও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র সহিত বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা সর্বাপেক্ষা দৃঢ়তম। এই ঘনিষ্ঠতার কর্তব্যসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যাহার সহিত বন্ধুত্ব নাই, কেবল ধর্ম সম্পর্ক বিদ্যমান, তাহার প্রতিও কতিপয় কর্তব্য রহিয়াছে।

সাধারণ মুসলমানের প্রতি কর্তব্য

প্রথম কর্তব্য ঃ নিজের নিকট যাহা অপছন্দনীয় তাহা অপর মুসলমানের জন্যও পছন্দ না করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সমগ্র মুসলমান একটি মানব-দেহস্বরূপ। ইহার (দেহের) একটি অঙ্গ ব্যথা পাইলে সমস্ত অঙ্গ ইহা অনুভব করে এবং সমস্ত অঙ্গই ব্যথিত হইয়া থাকে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ যে ব্যক্তি দোযখ হইতে রক্ষা পাইতে চাহে সে যেন কালেমা শাহাদাতের উপর (বিশ্বাস রাখিয়া) মৃত্যুবরণ করে এবং নিজে যেরূপ ব্যবহার অন্যের নিকট হইতে পছন্দ করে না তদ্রূপ ব্যবহার যেন সে নিজে অপরের সহিত না করে। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনার বান্দাগণের মধ্যে বড় সুবিচারক কে? উত্তর হইল ঃ যে ব্যক্তি স্বয়ং নিজের উপর সুবিচার করে।

দ্বিতীয় কর্তব্য ঃ হস্ত ও রসনা দ্বারা অপর মুসলমানকে কষ্ট না দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে লোকগণ! মুসলমান কে, তোমরা জান কি? তাঁহারা উত্তর করিলেন ঃ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল উত্তম জানেন। তিনি বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি মুসলমান যাহার হস্ত ও রসনা হইতে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে। লোকে নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কোন্ ব্যক্তি মুমিন? তিনি বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি মু'মিন যাহা হইতে অন্যান্য মু'মিন নিজেদের প্রাণ ও ধন সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারে। তাঁহারা আবার নিবেদন করিল ঃ মুহাজির কে? তিনি বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি মুহাজির যে মন্দ কার্য পরিত্যাগ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য স্বীয় চক্ষু দ্বারা এমনভাবে ইশারা করা দুরস্ত নহে, যাহাতে অপর মুসলমান ব্যথা পায় এবং এমন কোন কার্য করাও দুরস্ত নহে যাহার কারণে অপর মুসলমান চিন্তান্বিত ও ভীত হয়। হযরত মুজাহিদ (রা) বলেন যে, দোযখীদিগকে আল্লাহ্ পাঁচড়া রোগে আক্রান্ত করিবেন। তাহারা এত চুলকাইবে যে (তাহাদের মাংস খসিয়া) হাড় বাহির হইয়া পড়িবে। তখন আহ্বানকারী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে ঃ পরিশ্রম ও কষ্ট কিরূপ হইতেছে? তাহারা উত্তর দিবে ঃ অত্যন্ত কঠিন ও ভীষণ। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ তোমরা দুনিয়াতে মুসলমানদিগকে কষ্ট দিতে এই কারণেই তোমাদের এই শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি বেহেশতে এক ব্যক্তিকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে বিচরণ করিতে দেখিলাম।এই আমোদ-প্রমোদের অধিকার তাহার এই কারণে ভাগ্যে

ঘটিয়াছে যে, যেন কাহারও কষ্ট না হয় এইজন্য সে রাস্তা হইতে একটি বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়াছিল।

তৃতীয়ত কর্তব্যঃ কাহারও সহিত অহংকার না করা। কারণ অহংকারকারিগণকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বিনয়ী হওয়ার জন্য আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে যেন কেহই কাহারও উপর অহংকার না করে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বিধবাগণ ও মিসকীনদের নিকট গমন করিতেন এবং তাহাদের অভাব পূরণ করিতেন।

ফলকথা, কাহারও প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নহে। সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র একজন প্রিয়পাত্র। কিন্তু তুমি তাহা জান না। আল্লাহ্ তাহার অনেক প্রিয়পাত্রকে গোপন রাখিয়াছেন যেন লোকজন তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করিতে না পারে।

চতুর্থ কর্তব্য ঃ কোন মুসলমান সম্বন্ধে পরোক্ষ নিন্দুকের কথায় কর্ণপাত না করা। কারণ সৎলোকের কথা শ্রবণ করা উচিত। পরোক্ষ নিন্দাকারী ফাসিক। হাদীস শরীফে আছে যে, কোন পরোক্ষ নিন্দাকারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।

যে ব্যক্তি তোমার সম্মুখে অপরের নিন্দা করে, সে অপর লোকের নিকট তোমারও দুর্ণাম করিবে। পরোক্ষ নিন্দুক হইতে দূরে থাকিবে এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জ্ঞান করিবে।

পঞ্চম কর্তব্য ঃ তিনদিনের অধিক কোন প্রিয়জনের সহিত কথাবার্তা বন্ধ না রাখা। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, তিনদিনের অধিক কোন মুসলমান ভ্রাতার সহিত কথাবার্তা বন্ধ রাখা দুরস্ত নহে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয় সে ব্যক্তিই উত্তম। হযরত ইক্‌রামা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ হযরত ইউসুফ (আ) কে বলেন ঃ আমি তোমার নাম ও মর্যাদা এই জন্য বৃদ্ধি করিয়াছি যে, তুমি তোমার ভাইদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছ। হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ তুমি তোমার মুসলমান ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিলে আল্লাহ্ তোমার মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন।

ষষ্ঠ কর্তব্য ঃ সৎ-অসৎ সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করা ও তাহাদের উপকার করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ যাহার সহিত সম্ভব হয় সদ্ব্যবহার ও মঙ্গল কর, যদিও সে উহার উপযোগী নহে। কিন্তু তুমি উহা করার উপযোগী। হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ ঈমানের পরই সৃষ্টের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করা এবং সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল সাধন করা আসল বুদ্ধিমত্তার কাজ। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন যে, কোন ব্যক্তি কথা-বার্তা বলার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্ত ধারণ করিলে সে ব্যক্তি নিজে হাত ছাড়িবার পূর্বে তিনি তাহার হস্ত ছাড়িতেন না এবং কেহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করিলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তাহার দিকে মনোনিবেশ করিতেন ও কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতেন।

সপ্তম কর্তব্য ঃ বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সম্মান ও কনিষ্ঠগণকে স্নেহ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সম্মান করে না এবং কনিষ্ঠদিগকে দয়া ও স্নেহ করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, শুভ্র কেশের প্রতি সম্মান আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান। তিনি আরও বলেনঃ যে যুবক বয়োজ্যেষ্ঠগণের সম্মান করে, আল্লাহ্ সে যুবকগণকে তাহার বার্ধক্যের সময় তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তওফীক প্রদান করিবেন। ইহা দীর্ঘায়ুর শুভ সংবাদ। বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রতি যুবকের সম্মান প্রদর্শন প্রমাণ করে যে, সে যুবকও দীর্ঘায়ু লাভ করিবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রতি সে যে সম্মান প্রদর্শন করিত, উহার উত্তম বিনিময় পাইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাহাদের অল্প বয়স্ক ছেলেদিগকে লইয়া তাঁহার খিদমতে হাজির হইতেন। তিনি বালকদিগকে স্বীয় বাহনের উপর উঠাইয়া কাহাকেও সম্মুখে বসাইতেন, কাহাকেও পিছনে বসাইতেন। সম্মুখের বালক গর্ব করিয়া বলিতঃ দেখ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সম্মুখে বসাইয়াছেন এবং তোমাকে পশ্চাতে বসাইয়াছেন। নামকরণ ও দু'আর জন্য একটি শিশু ছেলেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির করা হইল। তিনি শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। এরূপ স্থলে যদি কোন শিশু তাহার পবিত্র ক্রোড়ে পেশাব করিতে আরম্ভ করিত, তখন লোকে শোরগোল করিয়া শিশুটিকে তাহার কোল হইতে উঠাইয়া লইতে চাহিলে তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিতেন ঃ তাঁহাকে এই অবস্থায় থাকিয়া পেশাব করিতে দাও। তাহার পেশাব বন্ধ করিও না। শিশুর অভিভাবকের সম্মুখে তিনি সেই পেশাবযুক্ত কাপড় ধৌত করিতেন না। কারণ, হয়ত সে মনে কষ্ট পাইতে পারে। লোকটি বাহির হইয়া গেলে তিনি উহা ধুইয়া লইতেন। শিশু ছেলে দুগ্ধপোষ্য হইলে তাহার পেশাবযুক্ত বস্ত্র তিনি হালকাভাবে ধৌত করিতেন।

অষ্টম কর্তব্য ঃ সকল মুসলমানের সহিত প্রফুল্ল বদনে সাক্ষাত করা এবং তাহাদের সহিত প্রফুল্ল থাকা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ প্রফুল্লবদন ও সরলচিত্ত ব্যক্তিকে ভালবাসেন। তিনি আরও বলেন ঃ যে নেক কার্যের দরুন পাপ মার্জনা করা হয় উহা সরল ব্যবহার, প্রফুল্লবদন ও মিষ্ট ভাষণ। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, এক গরীব স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলঃ আপনার খেদমতে আমার কিছু বলিবার আছে। হুযূর বলিলেন ঃ এই গলির মধ্যে যেখানে ইচ্ছা বসিয়া পড়, আমিও বসিব। স্ত্রীলোকটি একস্থানে বসিল, হুযুরও বসিলেন। তাহার সকল বক্তব্য শেষ না করা পর্যন্ত তিনি তথায় বসিয়া রহিলেন।

নবম কর্তব্য ঃ কোন মুসলমানের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, তিনটি দোষ যাহার মধ্যে আছে সে ব্যক্তি যদিও নামায পড়ে এবং রোযা রাখে তথাপি সে মুনাফিক। তিনটি দোষ এই ঃ (১) মিথ্যা বলা, (২) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা এবং (৩) আমানত খেয়ানত করা।

দশম কর্তব্য ঃ প্রত্যেককে তাহার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করা। যে ব্যক্তি সমাজে সম্মানিত তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবে। কোন ব্যক্তিকে আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে অশ্বে আরোহিত এবং পরিপাটিপূর্ণ অবস্থায় দেখিলে বুঝিতে হইবে, তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। হযরত আয়েশা (রা) এক সফরে আহারে বসিয়াছেন। এমন সময় এক ফকীর আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন ঃ তাহাকে একটি রুটি দিয়া দাও। কিন্তু তখনই এক অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ডাকিয়া বসাইতে বলিলেন। উপস্থিত লোকগণ বলিলেন ঃ আপনি ফকীরকে ত্যাগ করিয়া আমীরকে ডাকিয়া আনিলেন! হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা দান করিয়াছেন। সেই মর্যাদার প্রাপ্য হক পালনের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। ফকীর এক রুটিতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, আমীরের সহিত এইরূপ আচরণ সমীচীন নহে। তাঁহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। হাদীস শরীফে আছে ঃ কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি তোমার নিকট আগমন করিলে তাঁহার সম্মান কর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার শরীফে কোন সম্মানী ব্যক্তি আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের পবিত্র চাদর পাতিয়া বসাইতেন। তাঁহার বৃদ্ধা দুধ মাতা একদা তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নিজের চাদর বিছাইয়া বসিতে দিলেন এবং বলিলেন ঃ মারহাবা, মাতঃ আপনার যাহা ইচ্ছা বলুন, আমি প্রদান করিব। তৎপর গনীমতের মালের যে অংশ তিনি পাইয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পুণ্যশীলা ভাগ্যবতী মহিলা উহা হযরত উসমান (রা)-র নিকট এক লক্ষ দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন।

একাদশ কর্তব্য ঃ মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-মীমাংসা করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন কার্য রোযা, নামায ও সাদ্‌কা হইতে উত্তম, আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব কি ? লোকে নিবেদন করিল ঃ অনুগ্রহপূর্বক বলুন। তিনি বলিলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে (পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হইলে) মীমাংসা করিয়া দেওয়া। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসিয়া নিজে নিজে হাসিতে ছিলেন। হযরত উমর (রা) তখন নিবেদন করিলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক, হুযূরের হাসিবার কারণ জানিতে পারি কি ? হুযূর বলিলেন ঃ কিয়ামত দিবস আমার উম্মতের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি মহাপ্রতাপশালী

আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে নতজানু হইয়া থাকিবে। তাহাদের একজন বলিবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! এই ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার করিয়াছে; ইহার বিচার করুন। বিবাদীকে আল্লাহ্ বলিলেন ঃ তাহার প্রাপ্য দিয়া দাও। সে (বিবাদী) নিবেদন করিবেঃ ইয়া আল্লাহ্! আমার সমস্ত পূণ্য তো অন্য দাবীদারগণ লইয়া গিয়াছে। আমার নিকট এখন কিছু নাই। বাদীকে আল্লাহ্ বলিবেন ঃ এখন তুমি কি করিবে ? তাহার নিকট তো কোন নেকী নাই। বাদী বলিবে ঃ আমার গুনাহ্ তাহাকে অর্পণ করুন। তখন বাদীর গুনাহ্ বিবাদীর মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহাতেও বাদীর প্রাপ্য আদায় হইবে না। এতটুকু বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোদন করিলেন এবং বলিলেন ঃ ইহাই একটি ভীষণ দিন, যখন প্রত্যেকে স্বীয় পাপের বোঝা দূরে সরাইতে চাহিবে (অতঃপর পূর্বের কথা আরম্ভ করিয়া হুযূর বলিলেন) ঃ সেই সময় পরম করুণাময় আল্লাহ্ বলিবেন ঃ মস্তক উত্তোলন কর; বলত তুমি কি দেখিতেছ ? সে নিবেদন করিবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! রৌপ্যনির্মিত নগর দেখিতেছি। ইহাতে মহামূল্য রত্ন ও মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণের প্রাসাদসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। (ইয়া আল্লাহ্) কোন নবী, শহীদ কিংবা সিদ্দীক কি ইহার অধিকারী ? আল্লাহ্ বলিবেন ঃ যে ব্যক্তি ইহার মূল্য দিবে সেই ইহার মালিক হইবে। বাদী নিবেদন করিবে। ঃ হে বিশ্বপ্রভু! ইহার মূল্য কাহারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব ? আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তুমি দিতে পার। বাদী বলিবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! কিরূপে দিতে পারি ? উত্তর হইবে ঃ তুমি তোমার এই ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলে ইহার মূল্য দেওয়া হইল। বাদী (আনন্দে) আত্মহারা হইয়া নিবেদন করিবে ঃ হে করুণাময়! আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলাম। তখন আদেশ হইবে ঃ উঠ ও তাহার হস্ত ধারণ কর এবং তোমরা উভয়ে বেহেশ্তে চলিয়া যাও। এতটুকু বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মানুষের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করিয়া দাও। কারণ, আল্লাহ কিয়ামত দিবস মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি করিয়া দিবেন।

দ্বাদশ কর্তব্য ঃ মুসলমানের সকল ত্রুটি ও গোপনীয় দোষ গোপন রাখা। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এই জগতে মুসলমানগণের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখিবে, কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তাহার গুনাহ্গুলি গোপন রাখিবেন। হযরত আবূবকর (রা) বলেন ঃ আমি যখন কাহাকেও গ্রেফতার করি, সে চোরই হউক কিংবা শরাব-খোরই হউক, তখন আমি এই আশা পোষণ করিয়া থাকি যে, আল্লাহ্ যেন তাহার অশ্লীল পাপ গোপন রাখেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হে লোকগণ! তোমরা কেবল মুখে কালেমা পড়িয়াছ ঃ এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান আসে নাই। লোকদের গীবত (পরোক্ষ নিন্দা) করিও না, তাহাদের গোপনীয় দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করিও না। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ব্যক্ত করে, আল্লাহ্ তাহার দোষ-ত্রুটি ব্যক্ত করিয়া দেন যাহাতে সে অপদস্ত হয়, যদিও তাহার গৃহে হউক।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমার স্মরণ আছে, যখন সর্বপ্রথম লোকে এক ব্যক্তিকে চুরি কার্যে গ্রেফতার করিয়া তাহার হাত কাটিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আনয়ন করিল, তখন হুযূরের নূরানী চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি এই কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ? হুযুর বলিলেন ঃ কেন হইব না ? আপন ভ্রাতার সহিত শত্রুতা সাধনে আমি শয়তানের সাহায্যকারী কেন হইব ? তোমরা যদি চাহ যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন ও তোমাদের গুনাহ্ গোপন রাখেন এবং মার্জনা করেন তবে তোমরাও লোকের গুনাহ গোপন রাখ। কারণ, বিচারকের সম্মুখে অপরাধী পৌছিলে যথাবিহিত দণ্ডবিধান ব্যতীত উপায়ান্তর থাকিবে না। হযরত উমর (রা) এক রজনীতে নগরের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য বাহির হইলেন, এমন সময় তিনি এক গৃহ হইতে গানের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ছাদের উপর দিয়া গৃহে প্রবেশ করতঃ দেখিত পাইলেন, জনৈক পুরুষ এক কুলটা রমণীর সহিত মদ্য পান করিতেছে। তখন তিনি বলিলেন হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি ধারণা করিয়াছিলে তোমার এই পাপ আল্লাহ্ গোপন রাখিবেন। তখন সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! তাড়াতাড়ি করিবেন না। আমি যদি একটি পাপ করিয়া থাকি, আপনি কিন্তু তিনটি পাপ করিলেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوْا

"তোমরা পরস্পর দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইও না।"

আপনি অপরের দোষ অনুসন্ধান করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

"তোমরা গৃহের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ কর।"

কিন্তু আমার গৃহের কপাট বন্ধ দেখিয়া আপনি ছাদের উপর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا-

যতক্ষণ পর্যন্ত গৃহস্বামীর অনুমতি না পাও এবং গৃহের অধিবাসীদিগকে সালাম না কর ততক্ষণ তোমার নিজ গৃহ ভিন্ন অপরের গৃহে প্রবেশ করিও না।

অথচ আপনি বিনা অনুমতিতে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সালামও দেন নাই। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ আমি ক্ষমা করিলে তুমি তওবা করিবে কি ? সে

নিবেদন করিল ঃ হ্যাঁ, তওবা করিব এবং আর কখনও এমন কাজের নিকটবর্তী হইব না। তিনি ক্ষমা করিলেন এবং সে তওবা করিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কান পাতিয়া কাহারও এমন কথা শ্রবণ করে যাহা তাহাকে ব্যতীত (অপরের নিকট) বলা হইতেছে, কিয়ামত দিবস সীসা গলাইয়া তাহার কানে ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

ত্রয়োদশ কর্তব্য ঃ মিথ্যা অপবাদের স্থান হইতে দূরে থাকা যেন মুসলমানের অন্তর তোমার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা হইতে এবং তাহাদের রসনা তোমার দোষ রটনা হইতে রক্ষা পায়। কেননা, যে ব্যক্তি কোন পাপের কারণ হয় সে সেই পাপের অংশীদার হইয়া পড়ে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দেয়, সে কেমন? লোকে নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! এমন কাজ কে করিবে, যে নিজের মাতাপিতাকে গালি দিবে? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি অপর কাহারও মাতাপিতাকে গালি দেয় এবং তদুত্তরে সেই ব্যক্তি তাহার মাতাপিতাকে গালি দেয়, তবে সে যেন নিজের মাতাপিতাকেই গালি দিল। হযরত উমর (রা) বলেন যে, যে স্থানে বসিলে লোকে দোষারোপ করিতে পারে এমন স্থানে বসিলে যদি তোমার প্রতি কেহ মন্দ ধারণা পোষণ করে তবে তাহাকে তিরস্কার করা তোমার জন্য দুরস্ত নহে।

কোন এক রমযান মাসের শেষভাগে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সুফিয়া (রা) সহিত মসজিদে আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময় তথায় একজন লোক আসিয়া পড়িল। হুযূর (সা) লোকটিকে ডাকিয়া বলিলেনঃ তিনি আমার স্ত্রী। হযরত সুফিয়া (রা) নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! লোকে অপরের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করিতে পারে; কিন্তু আপনার প্রতি (মন্দ ধারণা পোষণ) করিতে পারে না। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ শয়তান মানবদেহে এমনভাবে চলাফেরা করিতে পারে যেমন শিরা-উপশিরার রক্ত চলাচল করিয়া থাকে।

হযরত উমর (রা) জনৈকা স্ত্রীলোকের সহিত এক পুরুষকে পথিমধ্যে আলাপ করিতে দেখিয়া তাহাকে দুররা মারিলেন। লোকটি নিবেদন করিলঃ ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! এই মহিলা আমার স্ত্রী। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তবে তুমি এমন স্থানে কেন আলাপ করিতেছ না যেখানে কেহ দেখিতে না পায়?

চতুর্দশ কর্তব্য ঃ পদমর্যাদাশীল ও ক্ষমতাবান হইলে অপরের জন্য সুপারিশ করিতে দ্বিধা না করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ তোমাদের কেহ আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে আমার ইচ্ছা হয় তৎক্ষণাৎ দিয়া দেই। কিন্তু এইজন্য বিলম্ব করিয়া থাকি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ তজ্জন্য সুপারিশ করিয়া উহার বিনিময় প্রাপ্ত হও। অতএব তোমরা সুপারিশ কর এবং সওয়াব অর্জন কর। হুযূর (সা)

আরও বলেন ঃ কোন সদ্কা মৌখিক সদ্কা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। নিবেদন করা হইল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! মৌখিক সদ্কা কি? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ সেই সুপারিশ যাহা কাহারও প্রাণরক্ষা করে, কাহারও উপকার করে অথবা কাহাকেও কষ্ট হইতে রক্ষা করে।

পঞ্চদশ কর্তব্য ঃ কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে কেহ তাহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিলে এবং তাহার ধন-সম্পত্তি কিংবা মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে তাহার স্থলবর্তী হইয়া তাহার পক্ষ হইতে প্রতিউত্তর প্রদান করা ও তাহাকে অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে স্থানে কেহ কোন মুসলমানকে গালি দেয় এবং তাহকে অপমান করিবার প্রয়াস পায় সেখানে যে ব্যক্তি উক্ত মুসলমানের সাহায্য করিবে আল্লাহ্ উক্ত সাহায্যকারীকে এমন স্থানে সাহায্য করিবেন, যেখানে সে সাহায্যের জন্য একান্তভাবে মুখাপেক্ষী হইবে। আর কেহ কোন মুসলমানকে অপমান করিতে উদ্যত হইলে যে মুসলমান তাহার সাহায্য করে না আল্লাহ্ এইরূপ ব্যক্তিকে এমন স্থানে অপমানিত ও ধ্বংস করিবেন যে স্থানে সাহায্যের জন্য সে নিতান্ত প্রত্যাশী হইয়া থাকিবে।

ষোড়শ কর্তব্য ঃ ঘটনাচক্রে কোন অসৎ লোকের সংসর্গে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে অব্যাহতি হওয়া না পর্যন্ত তাহার সহিত শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া চলা এবং সামনাসামনি তাহার সহিত কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার না করা।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ–

"--তাহারা ভাল দ্বারা মন্দের প্রতিশোধ করিয়া থাকে।"

আয়াতের তফসীরে সালাম ও ভদ্র ব্যবহার দ্বারা অসত্যের প্রতিদান দেওয়াকে বুঝাইয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার শরীফে হাযির হওয়ার অনুমতি চাহিল। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহাকে অনুমতি দাও। আর এই লোকটি তাহার কওমের মধ্যে অত্যন্ত অসৎ। সেই ব্যক্তি দরবারে আগমন করিলে হুযূর (সা) তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিলেন যাহাতে তাহাকে হুযূরের নিকট খুব মর্যাদাবান বলিয়া আমার মনে হইল। লোকটি বাহির হইয়া গেলে আমি নিবেদন করিলাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি অসৎ লোকটিকে অসৎ বলিয়াও বর্ণনা করিলেন, আবার তাহার এত খাতিরও করিলেন। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ হে আয়েশা (রা)! কিয়ামত দিবস সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে যাহার ক্ষতির আশংকায় লোকে তাহাকে খাতির করিয়া থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, অশ্লীলভাষী লোকদের কটুবাক্য হইতে নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় তাহা সদ্‌কার মধ্যে গণ্য। হযরত আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ এমন অনেক লোক আছে যাহাদের সম্মুখে আমরা প্রফুল্ল বদনে থাকি। কিন্তু আমাদের অন্তর তাহাদিগকে লানত করিতে থাকে।

সপ্তদশ কর্তব্য ঃ দরিদ্রগণের সহিত সঙ্গদান করা ও তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখা এবং আমীরদের সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মৃতদের নিকটে বসিও না। সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহারা কে ? হুযূর (সা) বলেন ঃ আমীর লোক হযরত সুলাইমান (আ) স্বীয় রাজ্যের যেখানে দরিদ্র লোক দেখিতে পাইতেন সেখানেই তাহাদের সহিত বসিয়া পড়িতেন এবং বলিতেন ঃ মিসকীন মিসকীনগণের পার্শ্বে বসিল। হযরত ঈসা (আ)-কে 'ইয়া মিসকীন' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি যত সন্তুষ্ট হইতেন অপর কোন নামেই তত সন্তুষ্ট হইতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করিতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাকে আজীবন মিসকীন রাখিও। যখন আমাকে মৃত্যু দান করিবে, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান করিও। আর যখন পুনরুত্থান করিবে, মিসকীনদের সঙ্গে আমাকে পুনরুত্থান করিও। হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিলেনঃ ইয়া আল্লাহ্! কোথায় তোমাকে অন্বেষণ করিব ? উত্তর আসিল ঃ ভগ্নহৃদয় লোকদের নিকট।

অষ্টাদশ কর্তব্য ঃ মুসলমানের মন সন্তুষ্ট করিতে ও তাহাদের অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অভাব মোচন করিল সে যেন সমস্ত জীবন আল্লাহ্‌র খেদমত করিল। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের চক্ষু উজ্জ্বল করিবে কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তাহার চক্ষু উজ্জ্বল করিবেন। হুযূর (সা) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিবাভাগে বা রাত্রিকালে এক ঘন্টা সময় কোন মুসলমানের অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করে, তাহার অভাব মোচন হউক, বা না হউক এই এক ঘণ্টাকাল তাহার জন্য দুই মাস মসজিদে অবস্থানপূর্বক একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা উত্তম। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষণ্ন লোককে শান্তি প্রদান করে বা অত্যাচারিত লোককে অত্যাচার হইতে রক্ষা করে, আল্লাহ্ তাহাকে তিয়াত্তরটি ক্ষমা প্রদান করিবেন। হুযূর (সা) বলেন ঃ তোমরা আপন ভাইকে সাহায্য কর; সে অত্যাচারী হউক কিংবা অত্যাচারিত হউক। সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! অত্যাচারী হইলে তাহাকে কিরূপে সাহায্য করিবে ? হুযূর (সা) বলেনঃ কোন মুসলমানের মন সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা কোন ইবাদতই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয় নহে। হুযূর (সা) বলেন ঃ দুইটি স্বভাব অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ আর নাই। আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়া। আর

দুইটি স্বভাব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইবাদত আর নাই-আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়ণ করা এবং মানুষকে আরাম প্রদান করা। হুযূর (সা) বলেন ঃ মুসলমানের ব্যথায় যে ব্যক্তি ব্যথিত না হয় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

হযরত ফুযায়ল (র)-কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তিনি বলিলেন ঃ ঐ সকল নিঃস্ব মুসলমানের জন্য আমি ক্রন্দন করিতেছি যাহারা আমার উপর অত্যাচার করিয়াছে। কিয়ামতের ময়দানে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে-তোমরা অত্যচার করিয়াছিলে কেন ? তখন তাহারা অপদস্থ হইবে এবং তাহাদের কোন ওযর-আপত্তিই গৃহীত হইবে না। হযরত মারূফ কাযী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ তিনবার প্রার্থনা করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের অবস্থা ভাল করিয়া দাও। ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের প্রতি দয়া বর্ষণ কর। ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতকে সচ্ছলতা দান কর। -- তাহার নাম আবদালগণের মধ্যে লিখিত হইবে।

উনবিংশ কর্তব্য ঃ কোন মুসলমানের নিকট পৌছামাত্র কথা বলিবার পূর্বে সর্বাগ্রে সালাম মুসাফাহা করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সালামের পূর্বে কেহ কথা বলিলে সে সালাম না করা পর্যন্ত তাহার উত্তর দিবে না। এক ব্যক্তি সালাম ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি তাহাকে আদেশ করিলেন তুমি বাহির হইয়া যাও এবং সালাম করিয়া পুনরায় প্রবেশ কর।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি আট বৎসর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করার পর তিনি আমাকে বলিলেন-হে আনাস! তাহারা ঃ (অর্থাৎ ওযু গোসল) উত্তমরূপে করিও যেন তাহার আয়ু দীর্ঘ হয়। আর কোন মুসলমানের নিকট পৌছামাত্র অগ্রে তাহাকে সালাম কর যেন তোমার সওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং যখন নিজ গৃহে প্রবেশ কর তখন নিজ পরিবারের লোকদিগকে সালাম কর। তাহাতে তোমার গৃহে প্রচুর মঙ্গল হইবে।

একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার শরীফে উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ সালামুন আলাইকুম। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহার জন্য দশটি সওয়াব লিখিত হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহার জন্য বিশটি সওয়াব লিখিত হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া বলিলঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ সালামুন আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহার জন্য ত্রিশটি সওয়াব লিখিত হইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ গৃহে প্রবেশকালে সালাম কর এবং বাহির হওয়ারকালেও সালাম কর। পূর্বের সালাম পরের সালাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। হুযূর (সা) বলেন ঃ দুই মুসলমান যখন পরস্পর মুসাফাহা করে তখন সত্তরটি রহ্‌মত তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি অধিকতর প্রফুল্লবদনে মিলিত হয় তাহার অংশে উনসত্তরটি রহমত পড়ে। আর যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর সালাম করে তখন একশতটি রহমত তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে সালাম করে তাহার ভাগে নব্বইটি এবং যে ব্যক্তি সালামের জওয়াব দেয় তাহার ভাগে দশটি রহমত পড়ে।

বুযর্গগণের হস্ত চুম্বন করা সুন্নত। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা) আমীরুল মুমেনীন হযরত উমর ফারুক (রা) হস্ত চুম্বন করিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম আমরা কোন বন্ধুর নিকট গমন করিলে (তাহার সম্মানার্থে মস্তক অবনত করতঃ) পৃষ্ঠদেশ বাঁকাইব কি ? হুযূর (সা) বলিলেন-না। আমি আবার নিবেদন করিলাম তাহার হস্ত চুম্বন করিব কি ? হুযূর (সা) বলিলেন-না। আবার নিবেদন করিলাম-মুসাফাহা করিব কি ? হুযূর (সা) বলিলেন -হ্যাঁ। কিন্তু কোন প্রাপ্তবয়স্ক বন্ধু বিদেশ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মানার্থে কেহ দণ্ডায়মান হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমাদের আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার (সম্মানের) জন্য আমরা দণ্ডায়মান হইতাম না। আমরা জানিতাম এই কার্যে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু যেখানে দাঁড়াইবার প্রথা হইয়া গিয়াছে, সেখানে সোজা দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শনে কোন ক্ষতি নাই। কাহারও সম্মুখে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান হওয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ লোক তাহার সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া থাকুক আর সে নিজে বসিয়া থাকুক, ইহা যে ব্যক্তি পছন্দ করে, তাহাকে বলিয়া দাও, সে যেন দোযখে নিজের স্থান করিয়া লয়।

বিংশতি কর্তব্য ঃ হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন--হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলিবে ও শ্রবণকারী 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিবে এবং আবার সেই ব্যক্তি (হাঁচিদাতা) 'ইয়ারহামুকাল্লাহ লী ওয়ালাকুম বলিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি হাঁচির পর 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' বলিবে না সে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' দু'আ পাওয়ার অধিকারী হইবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাঁচি দিবার আওয়ায দমন করিয়া অনুচ্চস্বর হাঁচিতেন এবং হাঁচির সময় মুখের উপর হাত রাখিতেন। পায়খানা বা প্রস্রাব করিবার সময় কাহারও হাঁচি

আসিলে 'আলহামদু লিল্লাহ' মনে মনে বলিবে। হযরত ইবরাহীম নখঈ (রা) বলেন যে, এই সময় মুখে বলিলেও কোন ক্ষতি নাই।

হযরত কা'বুল আহ্‌বার (র) বলেন যে, হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিয়াছিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তুমি কি নিকটে যে, আস্তে কথা বলিব অথবা তুমি কি দূরে যে, উচ্চস্বরে কথা বলিব ? উত্তর আসিল ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি। তিনি আবার নিবেদন করিলেন ইয়া ইলাহী! আমার বিভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে; যেমন স্ত্রী-সহবাস ও পায়খানা-প্রসাবজনিত অপবিত্রাবস্থা। এমতাবস্থায় তোমাকে স্মরণ করা বে-আদবী। উত্তর আসিল ঃ সকল অবস্থায় আমাকে স্মরণ কর এবং কোনরূপ আশংকা করিও না।

একবিংশতি কর্তব্য ঃ বন্ধু-বান্ধব না হইলেও পরিচিত রুগ্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রুগ্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করিবে সে বেহেশতে যাইবে এবং তত্ত্বাবধান করিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় তাহার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করিবার উদ্দেশ্যে সত্তর হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত হইয়া থাকে।

পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিবার সুন্নত তরীকা এই ঃ স্বীয় হস্ত পীড়িত ব্যক্তির হস্ত বা ললাটের উপর রাখিবে, অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করিবে এবং এই দু'আ পড়িবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – اُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ – وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ مِّنْ شَرِّ مَا تَجِدُ–

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। তুমি যে কষ্ট অনুভব করিতেছ তাহা হইতে আমি তোমার জন্য একক ও অভাবশূণ্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি, যিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং নিজেও কাহার কর্তৃক জাত নহেন এবং যাহার কোনাই সমকক্ষ নাই।

হযরত উসমান (রা) বলেন যে, একবার তিনি পীড়িত হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকবার তশরীফ আনয়ন করতঃ উপরি-উক্ত দু'আই পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করা,

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ–

আমি যে কষ্ট অনুভব করিতেছি তাহা হইতে আল্লাহ্‌র ইযযত ও ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

এবং 'কেমন আছ' বলিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ না করা পীড়িত ব্যক্তির জন্য সুন্নত।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন লোক পীড়িত হইলে তাহার উপর আল্লাহ্ দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন, কেহ খোঁজ-খবর লইতে আসিলে পীড়িত ব্যক্তি শোকর করে, না অভিযোগ করে। সে যদি শোকর করে এবং বলে 'আল হামদুলিল্লাহ', ভাল আছি তবে আল্লাহ বলেন ঃ এখন আমার প্রতি কর্তব্য এই-যদি আমার বান্দাকে ইহলোক হইতে উঠাইয়া লই, তবে রহমতের সহিত উঠাইয়া লইব এবং বেহেশতে স্থান দিব। আর যদি আরোগ্য দান করি তবে এই পীড়ার কারণে তাহার গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিব। যে রক্ত-মাংস পীড়ার পূর্বে তাহার দেহে ছিল এখন তাহাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রক্ত-মাংস দান করিব।

হযরত আলী (রা) বলেন যে, পেটে বেদনা হইলে স্বীয় স্ত্রীর মোহরের অর্থ হইতে কিছু লইয়া তদ্বারা মধু ক্রয়পূর্বক বৃষ্টির পানিতে মিশাইয়া পান করিলে উক্ত বেদনা আরোগ্য হয়। কারণ আল্লাহ্ বৃষ্টির পানিতে মুবারক, মধুকে রোগ নিরাময়ক এবং স্ত্রীর ক্ষমাকৃত মোহরকে প্রিয় ও সুস্বাদু করিয়াছেন। এই তিন জিনিসের সমন্বয় সাধিত হইলে নিঃসন্দেহে রোগ উপশম হইবে।

ফলকথা, অভিযোগ ও অধৈর্য প্রকাশ না করা এবং পীড়ার কারণে পাপ মোচনের আশা রাখা পীড়িত ব্যক্তির কর্তব্য। ঔষধ সেবনকালে ঔষধের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখিতে হইবে, ঔষধের উপর নহে।

পীড়িত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানের নিয়ম ঃ পীড়িত ব্যক্তির গৃহ-দ্বারে যাইয়া অনুমতি চাহিবে। দরজার সম্মুখে না দাঁড়াইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইবে। ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিবে। 'হে গোলাম' বলিয়া ডাকাডাকি করিবে না। ভিতর হইতে কেহ 'কে' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে 'আমি' বলিয়া উত্তর দিবে না; (বরং নিজের পরিচয় প্রকাশ করিবে)। 'হে গোলাম', ওহে বয়' ইত্যাদি বলিয়া ডাকাডাকির পরিবর্তে সশব্দে 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিবে। এই নিয়ম কেবল রোগীর গৃহে প্রবেশকালে প্রতিপাল্য নহে; বরং সর্বত্রই গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া অথবা আগমন-বার্তা জানাইবার জন্য এই নিয়ম পালন করিবে।

রোগীর নিকট অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবে না। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অধিক প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে না। রোগ আরোগ্যের জন্য দু'আ করিবে। রোগীকে দেখিয়া নিজে দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়াছ বলিয়া প্রকাশ করিবে। গৃহের অভ্যন্তরে প্রকোষ্ঠসমূহ ও দেয়ালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না।

দ্বাবিংশ কর্তব্য ঃ জানাযার সহিত গমন করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সহিত গমন করে সে এক কীরাত সওয়াব পাইয়া থাকে। দাফন করা পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে দুই কীরাত সওয়াব পাওয়া যাইবে এবং প্রত্যেক কিরাত ওহুদ পর্বতের সমান হইবে।

জানাযার সহিত গমনের নিয়ম ঃ জানাযার সহিত গমনকালে নীরব থাকিবে, হাসিবে না। উপদেশ গ্রহণ করিবে, নিজ মৃত্যুর কথা স্মরণ করিবে। হযরত আমাশ (রা) বলেন ঃ যখন আমরা জানাযার অনুগমন করিতাম তখন বুঝিতাম না যে, কাহার নিকট শোক প্রকাশ করিব। কারণ, প্রত্যেককে অন্যজন হইতে অধিক বিষণ্ন বলিয়া মনে হইত।

কতিপয় লোক এক মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া এক বুযর্গ বলিলেন ঃ নিজের চিন্তা কর। কারণ, মৃত ব্যক্তি তিনটি বিপদ কাটাইয়া গিয়াছে। সে (১) মালাকুল মওতের চেহারা দর্শন করিয়াছে, (২) মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে এবং (৩) অন্তিমকালের ভীতি অতিক্রম করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির পশ্চাতে গমন করে- (১) বন্ধু-বান্ধব, (২) ধন-সম্পদ ও (৩) আমল (কর্ম)। বন্ধু-বান্ধব ও ধন-সম্পদ তো ফিরিয়া আসে, আমল তাহার সঙ্গে থাকিয়া যায়।

ত্রয়োবিংশ কর্তব্য ঃ কবর যিয়ারতে যাওয়া, মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা এবং নিজে উপদেশ গ্রহণ করা। চিন্তা করিবে, এই সকল লোক আমার পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। আমাকেও অতিসত্বর যাইতে হইবে এবং মাটির নিচে শয়ন করিতে হইবে।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরকে অধিক স্মরণ করিবে তাহার কবর বেহেশেতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান হইবে। আর যে ব্যক্তি কবরকে ভুলিয়া যাইবে তাহার কবর দোযখের গহ্বরসমূহের একটি গহ্বর হইবে।

হযরত রাবী' ইব্ন খসীম (র) তাবেঈগণের মধ্যে একজন বুযর্গ ছিলেন। তাহার মাযার তূষ নগরে অবস্থিত। তিনি স্বীয় বাসগৃহে একটি কবর খনন করিয়া লইয়াছিলেন। যখনই আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে তাঁহার মনে কথঞ্চিত উদাসীনতা উপলব্ধি করিতেন তখনই তিনি কবরে যাইয়া শয়ন করিতেন। কিছুক্ষণ পর বলিতেন ঃ ইয়া ইলাহী! আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ কর যাহাতে আমি নিজে পাপসমূহের সংশোধন ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইতে পারি। তৎপর কবর হইতে উঠিয়া বলিতেন ঃ হে রাবী'! আল্লাহ্ তোমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। যত্নবান হও সেই সময়ের পূর্বে যখন তুমি আর দুনিয়ায় আগমনের অনুমতি পাইবে না।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবরস্থানে গমনপূর্বক একটি কবরের নিকট বসিলেন এবং খুব ক্রন্দন করিলেন ঃ আমি হুযূরের নিকট ছিলাম। আমি নিবেদন করিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি রোদন করেন কেন ? হুযুর (সা) বলিলেন, ইহা আমার আম্মার কবর। আমি তাঁহার কবর যিয়ারত করিতে এবং তাঁহার জন্য ক্ষমা চাহিতে আল্লাহ্‌র অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আল্লাহ্ কবর যিয়ারতের

অনুমতি দিলেন, দু'আর অনুমতি দিলেন না। সন্তানসুলভ ভালবাসা হৃদয়ে উথলিয়া উঠিয়াছে; এইজন্য রোদন করিতেছি।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহা উপরে বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত প্রতিবেশীর প্রতি স্বতন্ত্র কর্তব্য রহিয়াছে।

প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন প্রতিবেশী এমন যাহার মাত্র একটি অধিকার (হক) আছে; এই প্রতিবেশী কাফির। আর কোন প্রতিবেশী এমন যাহার দুইটি অধিকার আছে; এই প্রতিবেশী মুসলমান এবং কোন প্রতিবেশী এইরূপ যে, তাহার তিনটি অধিকার রহিয়াছে। এইরূপও প্রতিবেশী (মুসলমান) আত্মীয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে উপদেশ দিতেন এমনকি পরিশেষে আমি মনে করিতে লাগিলাম যে, প্রতিবেশী আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হইবে। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহাকে বলিয়া দাও, সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর সম্মান করে। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে দুইজন পরস্পর অভিযোগকারী কিয়ামত দিবস সর্বপ্রথম (আল্লাহ্র দরবারে) উপস্থিত হইবে, তাহারা দুইজন প্রতিবেশী হইবে। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর কুকুরকে ঢিল মারিয়াছে সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়াছে।

লোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরয করিল ঃ অমুক মহিলা দিবসে (নফল) রোযা রাখে এবং রাত্রিকালে (তাহাজ্জুদ ও নফল) নামায পড়ে। কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ সে দোযখে যাইবে। হুযূর (সা) বলেন ঃ চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশীর অধিকার রহিয়াছে। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম যুহরী (র) বলেন ঃ নিজ গৃহের সম্মুখের দিকে চল্লিশ ঘর, পশ্চাৎদিকে চল্লিশ ঘর, ডানদিকে চল্লিশ ঘর এবং বামদিকে চল্লিশ ঘর প্রতিবেশী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দিলেই যে তাহার প্রতি কর্তব্য প্রতিপালিত হইল তাহা নহে; বরং তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার, বিপদাপদে সাহায্য এবং উপকার করাও কর্তব্য। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামত দিবস ধনী ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া করিবে এবং বলিবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমার মঙ্গল করে নাই কেন এবং আমাকে তাহার গৃহে গমন করিতে দেয় নাই কেন।

---

১. ইহা আগের ঘটনা। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রার্থনায় হুযূরের মাতাপিতা উভয়েই ক্ষণিকের জন্য জীবিত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, তাঁহারা আল্লাহ্র ক্ষমার পাত্র হইয়াছেন। 'সীরাতে শামী' গ্রন্থে ইহা বর্ণিত আছে। তদুপরি হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাতাপিতা মু'মিন হওয়ার বিষয় বর্ণনা করিয়া একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি ইঁদুরের উপদ্রবে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ তুমি বিড়াল পুষিতেছ না কেন ? তিনি বলিলেন ঃ আমার আশংকা হয় যে, বিড়ালের আওয়াজ শুনিয়া ইঁদুর প্রতিবেশীর গৃহে চলিয়া যাইবে। তাহা হইলে এই হইবে যে, যাহা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি না তাহা তাহার জন্য পছন্দ করিলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ প্রতিবেশীর অধিকার কি, তাহা কি তোমরা জান ? (প্রতিবেশীর) অধিকার এই-তোমার নিকট সাহায্য চাহিলে সাহায্য করিবে, ধার চাহিলে ধার দিবে, অভাবগ্রস্ত হইলে অভাব মোচন করিবে, পীড়িত হইলে তত্ত্বাবধান করিবে, প্রাণত্যাগ করিলে তাহার জানাযার সঙ্গে যাইবে। আনন্দে অভিনন্দন এবং দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করিবে। তোমার গৃহে দেওয়াল উঁচু করিয়া তাহার বাতাস বন্ধ করিবে না। ফল ক্রয় করিলে তাহাকে পাঠাইয়া দাও। পাঠাইতে না পারিলে গোপন রাখ এবং নিজের সন্তানদিগকে ফল হাতে লইয়া বাহিরে যাইতে দিও না, যেন প্রতিবেশীর ছেলে দুঃখিত না হয়। আর স্বীয় রন্ধনশালায় ধূঁয়া দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না; কিন্তু তাহাকেও যদি খাদ্য প্রেরণ কর (তবে ক্ষতি নাই)।

হুযূর (সা) বলেন ঃ তোমরা কি জান, প্রতিবেশীর অধিকার কি ? সেই আল্লাহ্র শপথ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, প্রতিবেশীর অধিকার সেই ব্যক্তিই প্রদান করিতে পারে যাহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন। এইগুলি প্রতিবেশীরও অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত-নিজ গৃহ হইতে তাহার গৃহের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়া লুকাইয়া দেখিবে না, সে তোমার দেওয়ালের উপর কড়িকাঠ স্থাপন করিলে তাহাকে নিষেধ করিও না এবং তাহার নর্দমা বন্ধ করিও না। তোমার গৃহদ্বারের সম্মুখে সে আবর্জনা ফেলিলে তাহার সহিত ঝগড়া করিও না এবং তাহার যে দোষ শ্রবণ কর তাহা গোপন রাখ। মনে কষ্ট হয়, এমন কোন কথা তাহার নিকট বলিবে না; প্রতিবেশীর স্ত্রীলোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; তাহার দাসীদের প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করিবে না। এইগুলি মুসলমানগণের অধিকারসমূহ হইতে স্বতন্ত্র (অর্থাৎ মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর জন্য এই হকসমূহের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে)। এইগুলি ভালরূপে স্মরণ রাখিও।

হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ আমার প্রিয় বন্ধু রাসূলে মাকবুল রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন যে, যখন তুমি কিছু পাক কর তখন উহাতে অধিক পরিমাণ সুরুয়া রাখ এবং উহা হইতে প্রতিবেশীর অংশ প্রেরণ কর। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ প্রতিবেশী আমার চাকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বিনা প্রমাণে তাহাকে প্রহার করিলে পাপী হইব। আর প্রহার না করিলে প্রতিবেশী অসন্তুষ্ট হইবে। স্থির করিতে পারিতেছি না এমতাবস্থায় কি করিব। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ অপেক্ষা কর, চাকর এমন কোন অপরাধ করুক, যাহাতে সে শাসনের উপযুক্ত ও দণ্ডনীয় হয়। তৎপর শাসনে একটু বিলম্ব কর যেন প্রতিবেশী

আবার তোমার নিকট অভিযোগ করে। তখন চাকরকে শাস্তি দাও যেন উভয়ের প্রতি তোমার কর্তব্য সামাধা হয়।

আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কর্তব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি রহমান (দয়ালু) এবং আত্মীয়তা রিহম। আমার নাম হইতে ছাঁটাই করিয়া এই নাম রাখা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার হক পালন করে আমি তাহার সহিত মিলিত হই। যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে আমি তাহার সহিত ভালবাসা ছিন্ন করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের দীর্ঘায়ু ও সচ্ছল জীবিকা আকাংক্ষা করে নিজের আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে তাহাকে বলিয়া দাও। হুযূর (সা) বলেনঃ কোন ইবাদতের সওয়াবই আত্মীয়-স্বজনের হক প্রতিপালনের সওয়াব অপেক্ষা অধিক নহে। এমন কি কোন কোন লোক পাপাচারে লিপ্ত থাকে। (কিন্তু) তাহারা যখন আত্মীয়-স্বজনের হক প্রতিপালন করে ইহার বরকতে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হুযূর (সা) বলেন ঃ তোমার সহিত শত্রুতা পোষণ করে এমন আত্মীয়-স্বজনকে যাহা তুমি দান কর তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সদ্‌কা আর কোনটাই নহে।

আত্মীয়-স্বজনের হক প্রতিপালনের অর্থ এই যে, কোন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে তথাপি তুমি তাহার সহিত মেলামেশা করিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহাই যে, যে ব্যক্তি তোমার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করে তুমি তাহার সহিত মিলিত হইবে এবং যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তাহাকে তুমি দান করিবে, আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করে তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য ঃ মাতাপিতার হক (অধিকার) অতি বিরাট। কারণ, তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা অত্যাধিক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সন্তানকে গোলামরূপে পাইয়া মূল্য গ্রহণে তাহাকে আযাদ করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত কেহই পিতার হক আদায় করিতে পারে না। হুযূর (সা) বলেন ঃ মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার, তাহাদের উপকার ও হিত সাধন, নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা, জিহাদ ইত্যাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হুযূর (সা) বলেনঃ লোকে পাঁচশত বৎসরের ব্যবধান হইতে বেহেশতের সুগন্ধ পাইবে। কিন্তু অবাধ্য সন্তান ও আত্মীয়তা ছেদনকারী সুগন্ধ পাইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিলেন ঃ যে ব্যক্তি মাতাপিতার আনুগত্য স্বীকার করে না, আমি তাহাকে অবাধ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মাতাপিতার নামে দান করে তাহার কোন ক্ষতি হয় না। তাহারা উভয়েই সওয়াব পাইয়া থাকে এবং তাহার সওয়াবও কম হয় না। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমার মাতাপিতার মৃত্যু হইয়াছে। আমার উপর তাহাদের কি হক

আছে যাহা আমার জন্য পালনীয়? হুযূর (সা) বলেনঃ তাহাদের জন্য নামায পড় এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর তাহাদের প্রতিশ্রুতি ও উপদেশ পালন কর। তাহাদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান কর। তাহাদের প্রিয় ব্যক্তিদের সহিত সদ্ব্যবহার (ইহ্সান) কর। হুযূর (সা) বলেন ঃ মাতার হক পিতার হকের দ্বিগুণ।

সন্তান-সন্তুতির প্রতি কর্তব্য ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিবেদন করিল ঃ আমি কাহার সহিত ইহসান (ইহসান অর্থ সদ্ব্যবহার, উপকার ও হিত সাধন) করিব? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ মাতাপিতার সহিত। সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ তাঁহারা তো মরিয়া গিয়াছেন। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ সন্তানের সহিত ইহসান কর। কারণ সন্তানেরও পিতার তুল্য হক রহিয়াছে। সন্তানের হকসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, মন্দ স্বভাবের কারণে তাহাকে অবাধ্য করিয়া তুলিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত না করে আল্লাহ্ তাহার উপর রহমত বর্ষণ করেন।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ছেলে সাতদিনের হইলে তাহার আকীকা কর ও নাম রাখ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর। ছয় বৎসরের হইলে আদব শিক্ষা দাও। নয় বৎসরের হইলে তাহার বিছানা পৃথক করিয়া দাও এবং তের বৎসর বয়সের হইলে নামাযের জন্য তাহাকে প্রহার কর। ষোল বৎসর হইলে তাহাকে বিবাহ করাও এবং তাহার হস্তধারণপূর্বক বলিয়া দাও-আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি, তোমাকে লালন-পালন করিয়াছি, তোমাকে বিবাহ করাইয়া দিয়াছি। এখন দুনিয়াতে তোমার ফিত্না হইতে এবং আখিরাতে তোমার আযাব হইতে আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

সন্তান-সন্ততির অন্যতম হক এই যে, দান, উপহার এবং স্নেহ-অনুগ্রহ প্রদানে সকলের প্রতি সমতা রক্ষা করিবে। ছোট শিশুকে স্নেহ ও চুম্বন করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাসান (রা) চুম্বন করিতেন। আকরা ইবনে হাবিস বলেন ঃ আমার দশ পুত্র আছে। আমি কখনও কাহাকেও চুম্বন করি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দয়া করে না তাহার উপর আল্লাহ্ তা'আলার দয়া অবতীর্ণ হইবে না। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরের উপর ছিলেন এমন সময় হযরত হাসান (রা) পড়িয়া গেলেন। হুযূর (সা) তৎক্ষণাৎ মিম্বর হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহাকে উঠাইয়া লইলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন–

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ–

নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা ব্যতীত কিছুই নহে।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়িতেছিলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন

তখন ইমাম হাসান হুসাইন (রা) হুযূরের পবিত্র স্কন্ধের উপরে পা রাখিলেন। হুযূর (সা)] সিজদায় এত বিলম্ব করিলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) মনে করিতে লাগিলেন, হয়ত ওহী অবতীর্ণ হইতেছে; এইজন্যই তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করিতেছেন। সালাম ফিরাইলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! সিজদায় কি ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ না! হুসাইন (রা) আমাকে উট বানাইয়া ছিল। আমি তাহাকে সরাইয়া দিতে চাহিলাম না।

মোটকথা, সন্তান-সন্ততির হক অপেক্ষা মাতাপিতার হকের প্রতি অত্যধিক তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহাদিগকে সম্মান করা সন্তান-সন্ততির উপর ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা মাতাপিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তাঁহার নিজের ইবাদতের সঙ্গে বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا-

আপনার প্রভু চরম নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহাকে ছাড়া তোমরা আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং মাতাপিতার সহিত ইহসান করিও।

মাতাপিতার হক এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তজ্জন্য দুইটি বিষয় ওয়াজিব হইয়া পড়িয়াছে। (১) যে খাদ্য সন্দেহযুক্ত, কিন্তু হারাম নহে, মাতাপিতা সন্তানকে তাহা আহার করিতে বলিলে তাঁহাদের আদেশে উহা গ্রহণ করা অধিকাংশ আলিমের মতে সন্তানের প্রতি ওয়াজিব। কারণ, সন্দেহযুক্ত দ্রব্য হইতে পরহিয করা অপেক্ষা মাতাপিতার আদেশ পালন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা অধিক কর্তব্য। (২) মাতাপিতার অনুমতি ব্যতিত কোন সফর করা উচিত নহে। কিন্তু সফর সন্তানের উপর ফরয হইয়া থাকিলে, যেমন নিজ দেশে উপযুক্ত আলিম বিদ্যমান না থাকিলে নামায, রোযা প্রভৃতি ফরয বিষয়ক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সফর করা আবশ্যক হইয়া পড়িলে, তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে সফরে যাওয়া দুরস্ত আছে। হজ্জ ফরয হইলেও মাতাপিতার অনুমতি লইয়া যাওয়াই সঙ্গত। কারণ, উহাতে কিছু বিলম্ব করা জায়েয আছে।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলে হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার মাতা আছেন কি ? সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ হ্যাঁ। হুযূর (সা) বলেন ঃ তাহার নিকট যাইয়া বস; কেননা তাহার পায়ের নিচে তোমার বেহেশত। এক ব্যক্তি ইয়েমেন হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া জিহাদে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তোমার মাতাপিতা আছেন কি? সে ব্যক্তি বলিল ঃ জি হ্যাঁ, আছেন। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তবে যাও, প্রথমে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ কর। তাঁহারা অনুমতি না দিলে তাঁহাদের নির্দেশ মানিয়া চল। কারণ, তাওহীদের পর কোন নৈকট্য ও ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হক প্রায় পিতার হকের সমান। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, পুত্রের উপর পিতার হক যেরূপ ভ্রাতার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হকও তদ্রূপ।

দাস-দাসীর প্রতি কর্তব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দাস-দাসীদের হক সম্বন্ধে তোমারা আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যাহা আহার কর তাহাদিগকেও উহা খাইতে দাও। তোমরা যাহা পরিধান কর তাহাদিগকে তাহা পরিতে দাও। এমন কঠিন কাজের আদেশ তাহাদিগকে দিবে না যাহা তাহারা করিতে অক্ষম। কাজের উপযোগী হইলে তাহাদিগকে রাখ, অন্যথায় বিদায় করিয়া দাও এবং আল্লাহ্র বান্দাগণকে দুঃখে-কষ্টে রাখিও না। কারণ, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তোমাদের দাস-দাসী ও অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে তাহাদের অধীনস্থ করিতে পারিতেন।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! একদিনের মধ্যে কয়বার দাস-দাসীদের অপরাধ ক্ষমা করিব ? হুযুর (সা) বলিলেন ঃ সত্তরবার। হযরত আহ্নাফ ইব্ন কায়স (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি ধৈর্য কাহার নিকট শিখিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ কায়স ইব্ন আসেম হইতে শিখিয়াছি। কারণ, একদা তাঁহার দাসী একটি ছাগলের বাচ্চা ভাজিয়া একটি লৌহ শলাকায় গাঁথিয়া লইয়া আসিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার হাত হইতে স্খলিত হইয়া উহা কায়স ইব্ন আসেমের পুত্রের উপর পতিত হইল। ইহাতে শিশুটির মৃত্যু ঘটিল। দাসী ভয়ে বেহুঁশ হইয়া পড়িল। তিনি দাসীকে বলিলেন ঃ শান্ত হও। তোমার কোন দোষ নাই। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম।

হযরত আওন ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) স্বীয় ভৃত্যকে তাঁহার প্রতি অবাধ্যচরণ করিতে দেখিলে তাঁহাকে বলিতেন ঃ তোমার প্রভু যেমন স্বীয় প্রভু আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া থাকে, তুমিও তাহার সেই অভ্যাস অবলম্বন করতঃ তাহার নাফরমানী করিয়া থাক ? হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা) এক ভৃত্যকে প্রহার করিতেছিলেন, এমন সময় শব্দ আসিল, "হে আবূ মাসউদ!" তৎক্ষণাৎ তিনি সেই দিকে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইলেন। হুযূর (সা) বলিতে লাগিলেন ঃ এই গোলামের উপর তোমার যত ক্ষমতা আছে তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রহিয়াছে।

দাস-দাসীর হকের মধ্যে ইহাই একটি যে, তাহাদিগকে অন্ন, ব্যঞ্জন ও বস্তু হইতে বঞ্চিত করিবে না এবং ঘৃণার চক্ষে দেখিবে না। মনে করিবে, সেও তোমার মতই

মানুষ। সে তোমার নিকট কোন অপরাধ করিলে তুমি নিজে আল্লাহ্র নিকট যে সকল অপরাধ করিতেছ তাহা স্মরণ ও চিন্তা করিবে। দাস-দাসীর প্রতি তোমার ক্রোধের সঞ্চার হইলে তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার যে অপ্রতিহত ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা স্মরণ করিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অধীনস্থ ব্যক্তি যখন কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহাকে পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়াছে তখন অধীনস্থ ব্যক্তিকে তাহার সহিত বসাইয়া তাহার আহার করা উচিত। এতটুকু করিতে না পারিলে এক লোকমা অন্ন উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনসহ নিজ হস্তে তাহার মুখে তুলিয়া বলিবে ঃ এই লোকমা খাইয়া ফেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্জনবাস

নির্জনবাস অবলম্বন উত্তম কিংবা জনসমাজে আল্লাহ্র বান্দাগণের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া বাস করা উত্তম, এ বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী, হযরত ইবরাহীম আদহাম, হযরত দাউদ তায়ী, হযরত ফুযাইল ইব্ন আইয়ায, হযরত ইবরাহীম খাওয়ান, হযরত ইউসুফ ইসবাত, হযরত হুযায়ফা মারআশী ও হযরত বিশরে হাফী (র) প্রমুখ অধিকাংশ বুযর্গ এবং মুত্তাকীনের মতে নির্জনবাস জনসমাজে মিলিয়া-মিশিয়া থাকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বাহ্যদর্শী আলিমগণের এক দল বলেন যে, জনসমাজে মিলিয়া -মিশিয়া বাস করাই উত্তম।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ নির্জনবাস অবলম্বনে তোমার নিজের অংশ রক্ষা করিও। হযরত ইব্ন সিরীন (র) বলেন ঃ নির্জনবাস ইবাদত। এক ব্যক্তি হযরত দাউ তায়ী (র)-র নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন ঃ দুনিয়ার মোহ হইতে রোযা রাখ এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই রোযা খুলিও না। আর ব্যঘ্র হইতে মানুষ যেরূপ পলায়ন করে তুমিও মানুষ হইতে তদ্রূপ পলায়ন কর।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ তাওরীত কিতাবে বর্ণিত আছে, অল্পে পরিতৃপ্ত হইলে মানুষ অভাবমুক্ত হইয়া পড়ে; জনসমাজ হইতে দূরে সরিয়া নির্জন বাস অবলম্বন করিলে শান্তি লাভ করে; প্রবৃত্তিকে পদদলিত করিলে মুক্তিলাভ করে; হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করিলে তাহার মনুষত্বের বিকাশ ঘটে; ক্ষণকালের জন্য ধৈর্যাবলম্বন করিলে চিরস্থায়ী সফলতা অর্জিত হয়।

হযরত ওহাব ইব্ন ওয়ারদ (র) বলেন ঃ হিকমতের দশটি অংশ। তন্মধ্যে নয়টি তো নীরবতার মধ্যে এবং একটি নির্জনবাসের মধ্যে নিহিত আছে। হযরত রবী ইব্ন খসীম (র) ও হযরত ইবরাহীম নখ্ঈ (র) বলেন, ইল্‌ম শিক্ষা কর এবং নির্জনবাস অবলম্বন কর। হযরত মালিক ইব্ন আনাস (র) ধর্ম-ভ্রাতারগণের সহিত সাক্ষাত, পীড়িতদের খোঁজ-খবর গ্রহণ এবং জানাযার অনুগমনের জন্য গৃহ হইতে বাহিরে আসিতেন তৎপর এইগুলি হইতে এক -একটি করিয়া অবসর গ্রহণ করত ঃ নির্জনবাস অবলম্বন করিলেন। হযরত ফুযায়ল (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট দিয়া

অতিক্রমকালে আমাকে সালাম করে না এবং আমার পীড়ার সময় আমাকে দেখিতে আসে না, আমি তাহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকিব।

হযরত সাআদ ইব্‌ন আবী ওককাস এবং হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) দুইজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী মদীনা শরীফের নিকটবর্তী আকীক নামক স্থানে বাস করিতেন। কোন কাজ উপলক্ষেই তাঁহারা কোন সম্মেলনে গমন করিতেন না। অবশেষে সেই নির্জনবাসেই তাঁহারা ইন্তিকাল করেন। এক আমীর হযরত আসমা (রা)- কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ। আমীর বলিল ঃ কি প্রয়োজন ? তিনি বলিলেন ঃ প্রয়োজন এই যে, তুমিও আমার সহিত সাক্ষাত করিও না, আমিও তোমার সহিত সাক্ষাত করিব না। এক ব্যক্তি হযরত সহল তসতরী (র)-কে বলিলেন ঃ আমার বাসনা, আমাদের পরস্পর সংসর্গ থাকুক। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আমাদের একজন ইন্তিকাল করিলে অপরজন কাহার সঙ্গে সংসর্গ করিবে ? সেই ব্যক্তি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে। হযরত সহল অততরী (র) বলিলেন ঃ এখন আল্লাহ্‌রই সঙ্গে সংসর্গ রাখা উচিত। বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ বিধান রহিয়াছে, যেমন কোন অবস্থায় বিবাহ করাই উত্তম, আবার কোন অবস্থায় বিবাহ না করাই উত্তম, তদ্রূপ নির্জনবাস সম্বন্ধেও অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ বিধান রহিয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের অবস্থা অনুসারে বিধানও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং অবস্থাভেদে কাহারও পক্ষে নির্জনবাস উত্তম, আবার কাহারও পক্ষে জনসমাজে মিলিয়া-মিশিয়া থাকা উত্তম। অতএব নির্জনবাসের উপকারিতা ও অপকারিতা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বিধান জানা যাইবে না।

নির্জনবাসের উপকারিতা ঃ নির্জনবাসের উপকারিতা ছয়টি ঃ

প্রথম উপকারিতা ঃ আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর। কারণ, আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা এবং তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি নৈপুণ্য, আসমান-যমীনে তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্য সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং ইহলোক ও পরলোকে আল্লাহ্‌র গূঢ় তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। বরং মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুকে, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত ভুলিয়া তাঁহার যিক্‌র ও ধ্যানে এরূপভাবে নিমগ্ন হইবে যেন তোমার নিকট আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্বই না থাকে। নির্জনবাস ব্যতীত এইরূপ অবস্থা লাভ করা যায় না। কারণ, আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ মানুষকে আল্লাহ্ হইতে ফিরাইয়া রাখে। বিশেষতঃ সেই ব্যক্তিকে ফিরাইয়া রাখে, মানব সমাজে অবস্থান করিলেও সৃষ্টজগত হইতে বিছিন্ন হইয়া নবী-রাসূল (আ)-গণ এর ন্যায় একমাত্র আল্লাহ্‌কে লইয়া ব্যাপৃত থাকিবার ক্ষমতা যাহার নাই। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় কর্মের প্রারম্ভে হেরা পর্বতে যাইয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং লোক সমাজের

সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। তৎপর নবুওয়তের জ্যোতি প্রবল হইয়া উঠিল এবং তিনি মরতবায় উপনীত হইলেন যে, দৈহিকরূপে তিনি মানব সমাজে ছিলেন এবং অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্‌র সহিত বিরাজমান থাকিতেন। হযূর (সা) বলেন ঃ আমি কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আবূ বকর (রা) কে গ্রহণ করিতাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহব্বত (আমার অন্তরে) অপর কাহারও মহব্বতের জন্য একটুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট রাখে নাই। অথচ লোকে জানিত যে, প্রত্যেককে তিনি ভালবাসেন। অলীগণও যদি এই মরতবায় উপনীত হন তবে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

হযরত সহল তসতরী (র) বলেন ঃ ত্রিশ বৎসর যাবত আমি আল্লাহ্‌র সহিত কথাবার্তা বলিতেছি এবং লোকে মনে করে, আমি তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া থাকি। এইরূপ অবস্থায় উন্নীত হওয়া মোটেও অসম্ভব নহে। কারণ, কাহারও প্রেমে কেহ মগ্ন হইলে তাহার ভালবাসা এত প্রবল হইয়া উঠে যে, প্রেমিক লোক সমাজে থাকিলেও অন্তরে প্রেমাস্পদের সহিত লিপ্ত থাকার দরুন কাহারও কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে না এবং কাহাকেও সে দেখিতে পায় না। কিন্তু ইহাতে প্রত্যেকেরই গর্ববোধ করা উচিত নহে। কেননা, বহু লোক এমন আছে, লোক সমাজে অবস্থানের কারণে যাহারা আল্লাহ্‌র জ্যোতির্ময় পবিত্র দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়া যায়।

এক ব্যক্তি এক ইহুদী দরবেশকে বলিল ঃ নির্জনে ধৈর্য্যবলম্বন করা শ্রেষ্ঠ কাজ বটে। তিনি বলিলেন ঃ আমি একাকী নহি। আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে আছি। যখন তাঁহার সহিত গুপ্ত রহস্যের কথা বলিতে চাই তখন আমি নামায পড়িতে আরম্ভ করি। যখন ইচ্ছা হয় যে, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলুন তখন তওরীত পাঠ করিতে থাকি। লোকে এক বুযর্গকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ নির্জনবাসিগণ নির্জনবাসে কি উপকার লাভ করিল ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত। লোকে হযরত হাসান বসরী (র)-কে জানাইল যে, এক ব্যক্তি সর্বদা স্তম্ভের আড়ালে থাকে। তিনি বলিলেন ঃ লোকটি আবার আসিলে আমাকে খবর দিও। লোকটির আগমনবার্তা পাইয়া তিনি তাঁহার নিকট গমনপূর্বক বলিলেন ঃ ওহে! তুমি সর্বদা একাকী বসিয়া থাক। মানুষের সহিত মিলামিশা কর না কেন ? লোকটি বলিল ঃ আমি এক বড় কার্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, ইহা আমাকে জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলিলেন ঃ তুমি হাসানের নিকট গমন কর না কেন এবং তাহার কথা শুন না কেন ? লোকটি বলিল ঃ সেই কার্য আমাকে হাসান এবং সমস্ত মানুষ হইতে বিরত রাখিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ উহা কি কাজ ? লোকটি বলিল ঃ এমন কোন সময় নাই যখন আল্লাহ্ আমাকে নিয়ামত দান করেন না এবং আমি কোন পাপ না করি। সুতরাং আমি সর্বদা তাঁহার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকি। এইজন্য হাসানের সহিতও লিপ্ত হই না, আর লোকদের সহিতও

মিলামিশা করি না। অনন্তর হযরত হাসান বসরী (র) বলিলেন ঃ তুমি স্বীয় স্থান পরিত্যাগ করিও না। কারণ, তুমি ফিকাহশাস্ত্রে হাসান অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।

হযরত হরম ইব্‌ন হায়্যান (র) হযরত উওয়াইস করণী (রা)-এর নিকট গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি জন্য আসিয়াছ ? হযরত হরম (র) বলেন ঃ আপনার নিকট কিছু শান্তি পাইব, এই জন্য আসিয়াছি। হযরত উওয়াইস (রা) বলেনঃ আল্লাহ্‌র পরিচয়লাভের পর অপরের নিকট শান্তি পায় এমন কেহ আছে বলিয়া আমি মোটেই জানি না। হযরত ফুযায়ল (র) বলেন ঃ রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আমার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠে। তখন মনে মনে বলি, ভোর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সহিত নির্জনে উপবিষ্ট থাকিব। তৎপর ঊষার আলোর প্রকাশিত হইলে আমার হৃদয় বিষাদে ভরিয়া উঠে। তখন আমি মনে মনে বলি, লোকে আমাকে এখন আল্লাহ্‌ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবে।

হযরত মালিক ইব্‌ন দীনার (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি লোকের সহিত আলাপ করা অপেক্ষা মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সহিত আলাপ করাকে অধিক পছন্দ না করে তাহার জ্ঞান নিতান্ত সামান্য, তাহার হৃদয় অন্ধ এবং তাহার জীবন বিনষ্ট। এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, কাহারও সহিত সাক্ষাত লাভ করিবে এবং তাহার সহিত কথাবার্তা বলিবে তবে ইহাই তাহার বিপত্তি। কারণ, প্রয়োজনীয় বস্তু হইতে তাহার অন্তর শূন্য এবং সে বাহিরের সাহায্য প্রার্থনা করে। বুযর্গগণ বলেন ঃ লোকের সহিত যাহার বন্ধুত্ব সে নিঃস্বদের অন্তর্ভুক্ত।

উপরিউক্ত উক্তিসমূহ ও বর্ণনা হইতে বুঝিয়া লও, যে ব্যক্তি সর্বদা যিক্‌র করিয়া আল্লাহ্‌র সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কিংবা অহরহ চিন্তা-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও অনুপম সৌন্দর্য সম্পর্কে উপলব্ধি জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ, তাহার জন্য এই কার্য সেই সকল ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা আল্লাহ্‌র বান্দাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। কারণ, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রবল মহব্বত লইয়া পরলোক গমন করাই পরম সৌভাগ্য। যিক্‌রেই প্রেম-প্রীতি পূর্ণতা লাভ করে। আর প্রেম-প্রীতি মারিফাতের (পরিচয়-জ্ঞানের) ফল এবং মারিফাত চিন্তা ও ধ্যান হইতে জন্মে। এই সমস্তই নির্জনবাসে লাভ করা যায়।

দ্বিতীয় উপকারিতা ঃ নির্জনবাসে মানুষ অনেক পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকে। চারি প্রকারের পাপ আছে, জনসমাজে থাকিয়া কেহ উহা হইতে অব্যাহতি পায় না।

প্রথম পাপ ঃ অগোচরে পরনিন্দা করা ও পরনিন্দা শ্রবণ করা। এই পাপে ধর্ম বিনষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পাপ ঃ সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ সম্পর্কীয়। কারণ, অসৎকর্মে প্রতিরোধ না করিয়া নীরব থাকিলে পাপী হইতে হয়। আবার অসন্তোষ

প্রকাশ করতঃ নিষেধ করিতে গেলে লোকের সহিত শত্রুতা, ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তৃতীয় পাপ ঃ রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব) এবং নিফাক (কপটতা)। লোকসমাজে থাকিলে এই দুইটি দোষ হইতে বাঁচিয়া থাকা নিতান্ত দুষ্কর। কারণ, লোকজনের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন না করিলে তাহারা তোমাকে কষ্ট দিবে। আর সৌজন্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া রিয়া-তে নিপতিত হইবে। কেননা নিফাক ও রিয়াকে সৌজন্য হইতে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। পরস্পর শত্রু এমন দুইজন লোকের সহিত আলাপ করিবার সময় প্রত্যেকের মনমত কথা বলিলে মুনাফিকী হইয়া থাকে। আবার এইরূপ না করিলে তাহাদের শত্রুতা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে না। লোক সমাজে বাস করিলে পরস্পর সাক্ষাতের সময় একে অন্যকে অন্তত বলিয়া থাকে আমি সর্বদা আপনার সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব থাকি। আর এইরূপ উক্তি প্রায়ই মিথ্যা হইয়া থাকে। অথচ এইরূপ না বলিলেও লোকের নিকট পরিত্যক্ত হইতে হয়। এইরূপ উক্তি করিলে তুমিও কপটতা, মিথ্যাচরণ হইতে মুক্ত রহিলে না। জনসমাজে বাস করিলে অপর একটি সাধারণ কপটতার আশ্রয় লইতে হয় যে, কাহারও সহিত দেখা হওয়ামাত্র শিষ্টতা রক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে হয় ঃ আপনি কেমন আছেন ? আপনার পরিবারবর্গ কেমন আছে ? কিন্তু বাস্তব পক্ষে এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে প্রশ্নকারীর মনে কোনই আগ্রহ থাকে না। অতএব এরূপ আলাপ কপটতা মুক্ত নহে।

হযর ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ এমন লোকও আছে যে, কোন প্রয়োজনে অপরের নিকট গমন করত ঃ কপটতার সহিত তাহার উচ্চ মনুষ্যত্বের বর্ণনা করে এবং তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করে। ফলে ধর্মটুকু তাহার মস্তকে স্থাপনপূর্বক আল্লাহ্‌কে রাগান্বিত করিয়া অকৃতকার্য অবস্থায় সে গৃহে ফিরিয়া আসে। হযরত সিররী সাকতী (র) বলেন ঃ কোন ধর্ম-বন্ধু আমার নিকট আগমন করিলে আমি যদি আমার দাড়ির চুল সোজা করিবার জন্য উহাতে আমার হস্ত সঞ্চালন করি তবে আমার এই ভয় হয় যে, আমার নাম মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত করা হইবে। হযরত ফুযায়ল (র) এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি জন্য আসিয়াছ ? লোকটি বলিল ঃ আপনার সাক্ষাতলাভে শান্তি ও আরাম পাইবার আশায়। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! ইহা বিরক্তি ও অনৈক্য সৃষ্টির অধিক নিকটবর্তী। তুমি কেবল এই জন্যই আসিয়াছ যে, তুমি মিছামিছি আমার প্রশংসা করিবে এবং আমি তোমার মিথ্যা প্রশংসা করিব। আর তুমি আমার নিকট মিথ্যা গল্প করিবে এবং আমিও তোমার নিকট অলীক গল্প করিব। ফলে তুমি এখান হইতে মুনাফিক হইয়া গৃহে ফিরিবে এবং আমি মুনাফিক হইয়া এখান হইতে উঠিব। এমনিভাবে যে ব্যক্তি এইরূপ আচরণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে

পারে, জনসমাজে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করায় তাঁহার জন্য কোন ক্ষতি নাই। পূর্ববর্তী বুযর্গগণ পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের সময় পার্থিব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন না, কেবল ধর্মের অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন।

হযরত হাতেম আনামন (র) হামিদ লাক্‌ফাফকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কেমন আছ ঃ তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ শান্তিতে ও নিরাপদে আছি। হযরত হাতেম (র) বলিলেন ঃ পুলসিরাত অতিক্রম করিবার পর তুমি শান্তি পাইবে এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশের পর নিরাপদ হইবে। লোকে হযরত ঈসা (আ) কে তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ যে বস্তুতে আমার উপকার হইবে তাহা আমার আয়ত্বে নহে এবং যাহাতে আমার অপকার হইবে তাহা প্রতিরোধে আমি অক্ষম। আমি নিজ কাজে লিপ্ত আছি কোন অভাবগ্রস্তই আমা অপেক্ষা অভাবগ্রস্ত ও সম্বলহীন নহে। হযরত রাবী ইব্‌ন খাসীম (র)-কে লোকে তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন ঃ আমি দুর্বল ও পাপী। নিজের জীবিকা ভোগ করিতেছি এবং স্বীয় মৃত্যুর প্রত্যাশায় রহিয়াছি।

লোকে হযরত আবূ দারদা (রা) কে তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ দোযখ হইতে নিরাপদ হইতে পারিলে ভালই। হযরত উওয়াইস করণী (রা)-কে যদি কেহ 'কেমন আছেন' বলিয়া কুশল জানিতে চাহিত তবে তিনি বলিতেন ঃ সেই ব্যক্তি আবার কেমন থাকিবে, যে প্রত্যূষে বলিতে পারে না সে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকিবে কিনা এবং সন্ধ্যাকালে সে জানে না যে, সে কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিবে কিনা ? হযরত মালিক ইব্‌ন দীনার (র)-কে লোকে কেমন আছেন? বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ সেই ব্যক্তি আবার কেমন থাকিবে যাহার আয়ু কমিয়া আসিতেছে, আর পাপ বাড়িয়া চলিয়াছে ? কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কেমন আছেন ? তিনি বলিলেন ঃ এমন যে, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবিকা ভোগ করিতেছি এবং তাঁহার শত্রু ইবলীসের আদেশ পালন করিয়া যাইতেছি। হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসে (র)-কে লোকে তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ সেই ব্যক্তি আবার কেমন থাকিবে, যে প্রত্যহ এক মনযিল করিয়া আখিরাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে ? হযরত হামিদ লাক্‌ফাফকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কেমন আছেন ? তিনি বলিলেন ঃ এক দিন নিরাপদে থাকিব, এই আশায় আছি। লোকে বলিল ঃ আপনি কি এখন নিরাপদে নহেন ? তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি পথের সম্বল না লইয়া দূর-দূরান্তের সফরে যাত্রা করিয়াছে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় অন্ধকার কবরে গমন করিতেছে এবং কোন সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতীত ন্যয়পরায়ণ মহাবিচারকের বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে যাইতেছে, তাহার অবস্থা আবার কেমন হইবে ?

হযরত হাসসান ইব্‌ন সানান (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কেমন আছেন ঃ তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তিকে অবশ্যই মরিতে হইবে এবং তৎপর তাহাকে পুনরুত্থিত

করিয়া তাহার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হইবে, তাহার অবস্থা আবার কেমন হইবে ? হযরত ইব্‌ন সিরীন (র) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কেমন আছ ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ যাহার পাঁচশত দিরহাম ঋণ আছে, তদুপরি তাহার হস্তে নিজ পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য একটি কপর্দকও নাই তাহার অবস্থা কেমন হইবে ? ইহা শুনিয়া হযরত ইব্‌ন সিরীন (র) স্বীয় গৃহে গমন করিলেন এবং এক সহস্র দিরহাম আনিয়া সেই ব্যক্তিকে দান করিয়া বলিলেন ঃ পাঁচশত দিরহাম দ্বারা ঋণ পরিশোধ কর এবং পাঁচশত দিরহাম দ্বারা স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ চালাও। আর আমি এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কাহাকেও কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিব না। হযরত ইব্‌ন সিরীন (র) যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহার কারণ এই- অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে মুনাফিকী হইবে, তিনি এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

বুযর্গগণ বলেন ঃ আমরা এমন বহু লোক দেখিয়াছি, পরস্পরে সাক্ষাত হইলে যাহারা একে অন্যকে সালাম পর্যন্ত করিত না। কিন্তু তাহাদের কেহ অপরের নিকট কিছু চাহিলে যাহা কিছু থাকিত তাহা দান করিতে অস্বীকার করিত না। কিন্তু আজকাল এইরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, একে অপরের সহিত দেখা-সাক্ষাত করে এবং ঘরের মুরগীটি কেমন আছে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে বাকি রাখে না। কিন্তু একটি দিরহাম চাহিলেও 'না' ভিন্ন আর কোন উত্তর পাওয়া যায় না। এইরূপ আচরণ মুনাফিকী।

সুতরাং লোকের অবস্থা যখন এই পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে তখন লোক সমাজে অবস্থানকারী তাহাদের অবস্থার সহিত আনুকূল্য রক্ষা করিয়া চলিলে সেই মুনাফিকী ও মিথ্যাচরণে শরীক হইবে। আবার তাহাদের বিরুদ্ধাচারণ করিলে তাহাদিগকে শত্রু করিয়া তুলিবে এবং সে নিজে নিষ্ঠুর বলিয়া আখ্যায়িত হইবে। সকলে তাহার নিন্দা করিবে। অতএব তাহাদের কারণে তাহার ধর্ম এবং তাহার কারণে তাহাদের ধর্ম বিনষ্ট হইবে।

চতুর্থ পাপ ঃ যাহার সহিত তুমি উঠাবসা করিবে তোমার সম্পুর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার স্বভাব তোমার মধ্যে সংক্রমিত হইবে। তোমার প্রকৃতি তাহার প্রকৃতি হইতে এইরূপে কুস্বভাবসমূহ অপহরণ করিয়া লইবে যে, তুমি তাহা টেরও পাইবে না। দুনিয়ার মোহগ্রস্ত লোকের সহিত উঠাবসা করিলে দুনিয়ার মোহের সেই ঘ্রাণ তোমার জন্য বহু পাপের বীজ হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, দুনিয়াদারদিগকে দেখিলে তাহাদের দুনিয়ার লোভের প্রতি তোমার দৃষ্টি নিপতিত হইবে। ফলে তোমার মধ্যেও দুনিয়ার লোভ জন্মিবে। আবার যে ব্যক্তি কোন পাপীকে দেখিবে, যদিও সে পাপকে ঘৃণা করে তবুও বার বার সেই ব্যক্তির পাপানুষ্ঠান দেখিতে দেখিতে পরিশেষে পাপ তাহার দৃষ্টিতে নিতান্ত সহজ ও নগণ্য বলিয়া বোধ হইবে। পাপ বার বার দেখিলে তৎপ্রতি

অন্তরের ঘৃণা বিদূরীত হয়। এইজন্যই কোন আলিমকে রেশমী বস্ত্র পরিহিত দেখিলে সকলের অন্তরেই তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মে। এই আলিমই আবার সারাদিন পরনিন্দায় লিপ্ত থাকিলেও তাহার প্রতি হয়ত কাহারও মনেই ঘৃণার উদ্রেক হইবে না। অথচ পরনিন্দা রেশমী বস্ত্র পরিধান অপেক্ষা মন্দ; এমনকি পরনিন্দা ব্যভিচার অপেক্ষাও গুরুতর। কিন্তু পরনিন্দা সচরাচর দেখিতে -শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার কদর্যতা অন্তর হইতে লোপ পাইয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম ও বুযর্গগণের অবস্থা শ্রবণ করিলে যেরূপ উপকার হয়, মোহগ্রস্ত লোকদের অবস্থা শুনিলে তদ্রূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

বুযর্গগণের জীবন-চরিত্র আলোচনাকালে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয়। হাদীস শরীফে আছে

عِنْدَ ذِكْرِ الصّٰلِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

নেককারগণের আলোচনাকালে রহমত অবতীর্ণ হয়।

রহমত নাযিল হওয়ার কারণ এই যে, বুযর্গগণের অবস্থা শ্রবণ করিলে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ অনেক কমিয়া যায়। অনুরূপভাবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত লোকের আলোচনাকালে আল্লাহ্‌র অভিশাপ নামিয়া আসে। কেননা, ধর্মের প্রতি উদাসীনতা ও সংসারাসক্তি আল্লাহ্‌র অভিশাপের কারণ। সুতরাং সংসারাসক্ত লোকের আলোচনাই যখন অভিশাপের কারণ হইয়া থাকে তখন তাহাদের সংসর্গে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিলে তো আরও অধিক অভিশাপের কারণ হইবে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মন্দ সহচর কর্মকারতুল্য। কারণ, কাপড় দগ্ধ না হইলেও ইহার ধোঁয়া তো তোমাকে স্পর্শ করিবে। আর সৎ সহচর এমন আতর -বিক্রেতাতুল্য যে, সে তোমাকে কস্তুরী প্রদান না করিলেও উহার সুগন্ধ তো তোমার নিকট আসিবেই।

অসৎ সংসর্গ অপেক্ষা নির্জনবাস উৎকৃষ্ট এবং নির্জনবাস অপেক্ষা সৎ সংসর্গ উৎকৃষ্ট। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ যাহার নিকট বসিলে সংসারাসক্তি ছুটিয়া যায় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, তাহার সংসর্গে থাকা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তুমি তাহার অনুচর হইয়া থাক এবং যাহার অবস্থা ইহার বিপরীত তাহার সংসর্গ হইতে দূরে থাক। বিশেষত ঃ যে আলিম দুনিয়ার প্রতি লোভী এবং যাহার কথায় ও কাজে ঐক্য নাই, তাহার সংসর্গ অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ এইরূপ আলিম প্রাণ সংহারক বিষতুল্য এবং তাহার অন্তর হইতে ঈমানের মর্যাদা ও সম্মান একেবারে লোপ পাইয়াছে। কেননা, আলিম ব্যক্তির এইরূপ আচরণ দর্শনে লোকের মনে ধারণা হয় যে, বাস্তবিকই যদি ঈমানদারীর কোন মূল্য থাকিত হবে এই আলিম ব্যক্তি সর্বাগ্রে ঈশানদারীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিত। কারণ, কোন ব্যক্তি যদি সুমিষ্ট হালুয়ার পাত্র

সম্মুখে স্থাপনপূর্বক অতি লোভ সহকারে খাইতে থাকে এবং চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে ঃ হে মুসলমানগণ! ইহা হইতে দূরে থাক; কেননা ইহা বিষাক্ত। তবে তাহার কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না; এবং উহা খাইতে সে যে সাহস করিয়াছে ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, উহা মোটেই বিষাক্ত নহে।

অনেক লোকই এইরূপ আছে যে, তাহারা হারাম দ্রব্য ভক্ষণ এবং পাপ করিতে সাহস করে না। কিন্তু যখন শুনিতে পায় যে, অমুক আলিম এইরূপ কাজ করিতেছে তখন তাহারাও তদ্রূপ পাপকার্য করিতে সাহসী হইয়া ওঠে। এইজন্যই আলিমের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা হারাম হইয়াছে। ইহা হারাম হওয়ার দুইটি কারণ আছে। প্রথমত ঃ অগোচরে পরের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা গীবত, ইহা জঘন্য পাপ। দ্বিতীয়তঃ আলিম কর্তৃক কোন পাপকার্য অনুষ্ঠিত হইতে শুনিলে সাধারণ লোক তদ্রূপ পাপকার্য করিতে সাহসী হইয়া উঠিবে। আলিমের কার্যকে জায়েযের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার অনুসরণ করিবে এবং শয়তান তাহাদের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে ঃ তোমরা ঐ আলিমের ন্যায় কার্য কর। তোমরা সেই আলিম অপেক্ষা পরহিযগারও নও।

আলিমের কোন দোষ-ক্রটি দৃষ্টি হইলে জনসাধারণের দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। প্রথমত ঃ আলিম ভুল করিলে হইতে পারে যে, তাহার ইল্‌ম ইহার কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে। কারণ, ইল্‌ম মার্জনার পক্ষে বিরাট সহায়। অপর পক্ষে যেহেতু জনসাধারণের ইলম নাই, এমতাবস্থায় তাহারা নেককার্য না করিলে কিসের উপর ভরসা করিবে ? দ্বিতীয়ত ঃ আলিম যেমন জানে যে, হারাম মাল ভক্ষণ দুরস্ত নহে তদ্রূপ জনসাধারণও জানে যে, মদ্যপান ও যেনা দুরস্ত নহে। সুতরাং মদ্যপান ও যেনা করা যে অনুচিত, এ বিষয়ে সকলেই আলিম। এমতাবস্থায় সাধারণ লোক মদ্যপান করিলে ইহাতে মদ্যপান দুরস্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় না যে, অপর লোকেও তাহার দেখাদেখি ইহা পান করিতে আরম্ভ করিবে। অনুরূপভাবে আলিম ব্যক্তি হারাম মাল ভক্ষণ করিলে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, হারাম মাল ভক্ষণ দুরস্ত।

বস্তুতঃ হারাম ভক্ষণে সেই সমস্ত লোকই সাহসী হইয়া থাকে যাহারা নামেমাত্র আলিম এবং ইল্‌মের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। অথবা বাহ্যত ঃ আলিম যে মন্দ কার্য করিতেছে ইহার পক্ষে হয়ত তাহার কোন ওজর বা জটিল ব্যাখ্যা আছে যাহা জনসাধারণ বুঝিতে অক্ষম। অতএব, আলিমের ভুল-ক্রটিকে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতেই অবলোকন করা জনসাধারণের উচিত। অন্যথায় তাহাদের সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নৌকা দিয়া পার হওয়ার সময় হযরত খিযির (আ) নৌকায় ছিদ্র করিয়া দিলেন এবং ইহার গূঢ় রহস্য অবগত না থাকাবশত ঃ হযরত মূসা (আ) ইহাতে প্রতিবাদ করিলেন। এই কাহিনী আল্লাহ্ কুরআন শরীফে এই কারণেই উল্লেখ করিয়াছেন।

মোটকথা, যমানা এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, অধিকাংশ মানুষের সংসর্গেই ক্ষতি হইয়া থাকে। সুতরাং অধিকাংশ লোকের জন্যই জনসমাজ হইতে দূরে সরিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করাই উত্তম।

তৃতীয় উপকারিতা ঃ কোন নগরই শত্রুতা, ঝগড়া-বিবাদ এবং দলাদলি মুক্ত নহে। নির্জনবাস অবলম্বন করিলে এই সমস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে সমাজে মিলামিশা করিতে গেলে ধর্ম বিপন্ন হইয়া পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা যখন দেখিবে যে, লোকে পরস্পর হাতাহাতি করিয়া একে অন্যকে বাহির করিয়া দেয় তখন তোমরা (নিজ নিজ) গৃহে বসিয়া থাকিও এবং রসনা সংযত রাখিও। যাহা জানিবে, করিবে; যাহা জানিবে না, বর্জন করিবে। কেবল নিজ কাজে লিপ্ত থাকিবে এবং অপরের কাজে হাত দিবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মানুষ এমন এক সময়ে উপনীত হইবে যে, তখন তাহার ধর্ম নিরাপদ থাকিবে না। বরং (মানুষ তখন ধর্ম রক্ষার্থে) স্থান হইতে স্থানান্তরে, পাহাড় হইতে পাহাড়ান্তরে এবং গুহা হইতে গুহান্তরে খেকশিয়ালের ন্যায় জনসমাজ হইতে পলায়ন করিবে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! সেই যমানা কখন আসিবে ? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ যখন বিনাপাপে জীবিকা মিলিবে না। তখন লোক সমাজ হইতে দূরে দূরে অবস্থান করাই দুরস্ত হইবে। লোকে নিবেদন করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! কিরূপে ইহা সম্ভব ? আপনি তো আমাদিগকে বিবাহের আদেশ দিয়াছেন। হুযূর (সা) বলিলেনঃ তখন মানুষ স্বীয় মাতাপিতার হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তাহারা মরিয়া গিয়া থাকিলে স্ত্রী-পুত্রদের হাতে, তাহারাও না থাকিলে প্রিয়জনদের হাতে বিনষ্ট হইবে। লোকে নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! এইরূপ হইবে কেন ? দরিদ্রতা ও অভাবের জন্য মাতাপিতা পুত্রকে তিরস্কার করিবে এবং যে বস্তু সংগ্রহ করা পুত্রের সাধ্যাতীত উহা তাহারা পুত্রের নিকট চাহিবে। ফলে পুত্র (উহা সংগ্রহের চেষ্টায়) বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। এই হাদীস জনসমাজ হইতে দূরে অবস্থান সম্পর্কে বর্ণিত হইয়া থাকিলেও ইহা হইতে নির্জনবাস সম্বন্ধেও বুঝা যাইতেছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে কালের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন তাহা আমাদের বহু পূর্বেই আসিয়া পড়িয়াছে।

হযরত সূফিয়ান সওরী (র) তাঁহার যমানায় বলিতেন ঃ

وَاللّٰهُ لَقَدْ حَلَّتِ الْعُزُوْبَةُ

আল্লাহ্র শপথ, নির্জনবাস দুরস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ উপকারিতা ঃ নির্জনবাসে লোকে অপরের অনিষ্ট হইতে অব্যাহতি পায়

এবং পরিতুষ্ট থাকে। কারণ, লোকালয়ে থাকিলে অন্যের নিন্দা-চর্চা ও মন্দধারনার যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না এবং দুরাশা হইতেও নিস্তার পাওয়া যায় না। আর এমনও হইবে যে, সমাজে বসবাসকারী কোন কোন কার্য লোকের বোধগম্য না হওয়া বশতঃ তাহারা তৎপ্রতি নির্লজ্জ ও অসংযত ব্যবহার করিবে। জনসমাজে বাস করিয়া শোকাতুরের প্রতি সমবেদনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন, অতিথি সৎকার, সকলের প্রতি এবংবিধ কর্তব্যসমূহ প্রতিপালনে লিপ্ত থাকিলে তাহার সমস্ত সময় ইহাতেই ব্যয়িত হইবে এবং নিজের প্রয়োজনীয় কার্যে লাগিবার অবসরই পাওয়া যাইবে না। আবার কোন কোন লোককে বাদ দিয়া লোকবিশেষে কাহারও কাহারও প্রতি কর্তব্য প্রতিপালন করিলে অপর লোক অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া পড়িবে এবং তাহাকে কষ্ট দিবে। অপর পক্ষে নির্জনবাস অবলম্বন করিলে এ সমস্ত হইতেই অব্যাহতি পাইবে এবং সকলেই সন্তুষ্ট থাকিবে।

এক বুযর্গ সর্বদা কবরস্থানে থাকিতেন কিংবা নির্জনে বসিয়া কিতাব পাঠ করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি এইরূপ করেন কেন ? তিনি বলিলেন ঃ নির্জনবাস অপেক্ষা অধিক শান্তি ও নিরাপত্তা আর কোন অবস্থাতেই আমি দেখি নাই। আর কবর অপেক্ষা অধিকতর উপদেষ্টা এবং কিতাব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সঙ্গী আমি আর পাই নাই।

হযরত সাবিত বনানী (র) নামক জনৈক ওলী-আল্লাহ্ হযরত হাসান বসরী (র)-কে পত্র লিখিলেন ঃ শুনিতে পাইলাম আপনি হজ্জে যাইতেছেন। আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে ইছা করি। হযরত হাসান বসরী (র) উত্তর দিলেন ঃ আমাকে ক্ষমা করুন, যেন আমি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত নির্জনে জীবন-যাপন করিতে পারি। আমরা একত্রে থাকিলে হয়ত আমরা একে অন্যের এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাইব যাহা আমাদিগকে পরস্পর শত্রু করিয়া তুলিবে।

নির্জনবাসের অন্যতম উপকারিতা এই যে, মনুষ্যত্বের আবরণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ পায় না। কারণ, যে বিষয় কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই, একত্রে বাস করিলে তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়ে।

পঞ্চম উপকারিতা ঃ নির্জনবাসে লোকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি লালসা বিলুপ্ত হয়। পরস্পরের প্রতি লোভ-লালসা হইতে বহু দুঃখকষ্ট ও পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কারণ, দুনিয়াদার লোকদিগকে দেখিলে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি জন্মে। এই আসক্তি হইতে লোভের উৎপত্তি হয় এবং লোভের বশীভূত হইলে হেয় ও অপদস্থ হইতে হয়। এই জন্যই আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ الاية

লোকদের উপভোগের জন্য যে সমস্ত পার্থিব সৌন্দর্য ও আনন্দের সামগ্রী দান করিয়াছেন আপনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপও করিবেন না। এইগুলি তাহাদের জন্য ফিতনাস্বরূপ।

রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব হিসাবে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে (তোমাকে প্রদত্ত) আল্লাহর নিয়ামত তোমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে আর যে ব্যক্তি ধনীদের ঐশ্বর্য দেখিয়া উহা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং ইহা লাভ করিতে না পারে তবে পরকালের ক্ষতি সে ভোগ করিবে। আর অন্বেষণ না করিলে সাধনা ও ধৈর্যধারণ করিতে হইবে; ইহাও কষ্টসাধ্য।

ষষ্ঠ উপকারিতা ঃ অলস, নির্বোধ এবং যাহাদিগকে দেখিলে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, নির্জনবাসে তাহাদিগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। হযরত আমাশ (র)- কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইল কেন ? তিনি বলিলেন ঃ বহু নির্বোধ অলসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি বলিয়া। হাকীম জালীনুস বলেন ঃ দেহের যেমন জ্বর আছে, প্রাণেরও তদ্রূপ জ্বর আছে। অলসদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রাণের জ্বর। হযরত ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ কোন অলস ব্যক্তির নিকট বসিলে আমার দেহের যে অংশ তাহার দিকে থাকে, তাহা ভারী হইয়া পড়ে। ইহা পার্থিব উপকারিতা হইলেও ধর্ম-অপকারিতা ইহাতে জড়িত রহিয়াছে। কারণ, মন যাহাকে দেখিতে পছন্দ করে না, তাহাকে দেখিবামাত্র মুখে হউক বা অন্তরে হইক, অগোচরে তাহার নিন্দা আরম্ভ হয়। নির্জনে থাকিলে এ সমস্ত হইতে নিরাপত্তা ও রক্ষা পাওয়া যায়।

নির্জনবাসের আপদসমূহ ঃ অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্য অপর লোক ব্যতীত সফল হয় না এবং জন সমাজের মিলামিশা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। নির্জনবাসে এই সকল উদ্দেশ্য সফল ও সিদ্ধ হয় না উহাই নির্জনবাসের আপদ। এই আপদ ছয় প্রকার।

প্রথম আপদ ঃ নির্জনবাসে ইল্‌ম অর্জন ও দান হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। যে পরিমাণ ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয, যে ব্যক্তি উহা শিখে নাই, তাহার জন্য নির্জনবাস হারাম। আর যে ব্যক্তি ফরয পরিমাণ ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক ইল্‌ম সে শিখিতেও পারে না এবং বুঝিতেও পারে না এবং সে যদি ইবাদতের জন্য নির্জনবাস অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে তবে ইহা তাহার জন্য দুরস্ত আছে। কিন্তু শরীয়তের সমস্ত ইল্‌ম শিক্ষা করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, নির্জনবাস অবলম্বন করা তাহার জন্য বড়ই ক্ষতিজনক। কারণ, ইল্‌ম অর্জনের পূর্বে যে ব্যক্তি নির্জনবাস অবলম্বন করে সে তাহার অধিকাংশ সময় নিদ্রায়, বিনাকর্মে ও বাজে কল্পনায় নষ্ট করিয়া ফেলে। ইল্‌ম পরিপাক না করিয়া সারাদিন ইবাদতে লিপ্ত থাকিলেও এই

ইবাদতে অহংকার ও প্রতারণা হইতে মুক্ত থাকা যায় না এবং ধর্ম বিশ্বাসেও সে অলীক কল্পনা ও ভুল-ভ্রান্তি হইতে মুক্ত থাকিবে না। অথচ সে তাহা বুঝিতেও পারিবে না।

ফলকথা, নির্জনবাস পরিপক্ক আলিমের জন্য শোভা পায়, জনসাধারণের জন্য নহে। কারণ, সাধারণ মানুষ রুগ্ন ব্যক্তির ন্যায় এবং চিকিৎসক হইতে পলায়ণ করা রুগ্ন ব্যক্তির উচিত নহে। কেননা, নিজের চিকিৎসা নিজে করিলে সে শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আবার ইল্‌ম প্রদানের মর্যাদা অতি মহৎ।

হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষা করে ও তদনুযায়ী আমল করে এবং অপরকে শিক্ষা প্রদান করে, আকাশের রাজ্যসমূহে সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া আখ্যায়িত হইয়া থাকে। অথচ নির্জনবাসে ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া যায় না। সুতরাং ইল্‌ম অর্জন ও প্রদান নির্জনবাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। কিন্তু শর্ত এই যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই ইল্‌মে দীন উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক, ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। আর এমন ইল্‌ম শিক্ষা দিতে হইবে যাহা ধর্ম-কর্মে হিতকর এবং তন্মধ্যে যাহার আবশ্যকতা অধিক তাহা সর্বাগ্রে শিক্ষা দিতে হইবে। যেমন, পবিত্রতা বিষয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই বলিয়া দিবে যে, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পবিত্র করা অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু ইহা তুচ্ছ বিষয়। বরং পোশাক -পরিচ্ছদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পবিত্রতা সাধনের মূল উদ্দেশ্য হইল চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্তপদ ইত্যাদি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ হইতে পবিত্র রাখা। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ছাত্রকে বলিয়া দিবে এবং তদনুযায়ী আমল করিতে তাহাকে নির্দেশ দিবে। সে যদি তদনুযায়ী আমল না করে এবং অন্য বিদ্যা শিখিবার আগ্রহ প্রকাশ করে তবে বুঝিবে যে, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভই তাহার ইল্‌ম অর্জনের উদ্দেশ্য।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পাপ হইতে পবিত্র রাখিবার পর তাহাকে বলিবে, এই পবিত্রতার উদ্দেশ্যেও ইহা ব্যতীত অপর মহত্তর পবিত্রতা। তাহা হইল দুনিয়া ও আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর মহব্বত হইতে হৃদয়কে পবিত্র করা। এই পবিত্রতাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমার হাকীকত বা মূল তাৎপর্য, যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেহ বা কোন কিছুই তাহার উপাস্য না থাকে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির বশীভূত

فقد اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ

অর্থাৎ "সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে তাহার উপাস্যরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে" এবং সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমার হাকীকত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থের 'বিনাশন' ও 'পরিত্রাণ' খণ্ডে যাহা লিখিত হইবে উহা অধ্যয়ন না করিলে কুপ্রবৃত্তি হইতে হৃদয়কে পবিত্র করিবার উপায় জানা যাইবে না এবং এই উপায় অবগত হওয়া প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন। এই ইল্‌ম অর্জন সমাপ্ত করিবার পূর্বে ছাত্র যদি হায়েয, তালাক,

রাজস্ব, ফতওয়া ও দাবি- দাওয়া সাব্যস্ত করণে ইল্‌ম অন্বেষণ করে অথবা ধর্ম বিরোধী বিদ্যা, তর্কশাস্ত্রের জ্ঞান কিংবা মুতাযিলা ও কারামিয়া সম্প্রদায়ের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিবার ইল্‌ম অন্বেষণ করে, তবে বুঝিবে যে, সে ধন-সম্পদ ও মান -মর্যাদার অভিলাষী, ধর্ম অন্বেষণ তাহার উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ ছাত্র হইতে দূরে থাকা উচিত। কারণ এইরূপ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলে মহা ক্ষতি হইবে। কেননা, সে যখন তাহাকে ধ্বংস ও বিনাশের প্রতি আহ্বানকারী শয়তান ও কুপ্রবৃত্তিরূপ প্রধান শত্রুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র), হযরত ইমাম শাফিঈ (র) ও মুতাযিলা প্রভৃতি ধর্মীয় জামায়াতসমূহের মতবাদ নিয়া ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করিতে ইচ্ছা করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, শয়তান তাহাকে একেবারে বশীভূত করিয়া লইয়াছে এবং তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া হাস্য-বিদ্রূপ করিতেছে। আর তাহার অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া, আত্মশ্লাঘা, সংসারাসক্তি মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপ্রত্তি এবং ধন-সম্পদের লোভ ইত্যাদি যে সকল দোষ রহিয়াছে, উহা মানব হৃদয়ের অপবিত্রতা। মানুষ এ সমস্ত হইতে নিজকে পবিত্র না করিয়া কেবল বিবাহ-তালাক, দাদনী, কাজ-কারবার কিরূপে অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে তৎসম্বন্ধীয় ফতওয়া লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে উহাই তাহার ধ্বংস ও বিনাশের কারণ হইয়া উঠিবে। কেহ এই শ্রেণীর মাসয়ালা আবিষ্কারে ভুল করিয়া ফেলিলে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি আর কিছু হয় না যে, সে দুইটি সওয়াবের পরিবর্তে মাত্র একটি সওয়াব পাইবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন -হাদীস অবলম্বনে ধর্মবিধান আবিষ্কারের চেষ্টা (ইজতিহাদ) করিয়া সঠিক বিধান আবিষ্কারে সমর্থ হয়, সে দুইটি সওয়াব পাইবে এবং ভুল করিলে একটি সওয়াব পাইবে।

অতএব, মানুষ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অবলম্বন করুক কিংবা ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবই অবলম্বন করুক, তাহাতে অধিক লাভের কিছুই নাই। উপরিউক্ত দোষসমূহ তাহার অন্তর হইতে বিদূরীত না করিলে উহার ফলে তাহার ধর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আজকাল অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বড় বড় শহরেও এমন লোক দুই-একজনের অধিক পাওয়া যায় না যাহারা হৃদয় পবিত্রকারী ইল্‌ম শিক্ষা করিতে আগ্রহশীল। এমতাবস্থায় শিক্ষকের জন্যও নির্জনবাসই অধিকল শ্রেয়ঃ। কারণ যে আলিম দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের অভিলাষী ছাত্রকে ইল্‌ম দান করেন তাহার দৃষ্টান্ত সেই অস্ত্র ব্যবসায়ীরই সমতুল্য যে, লুণ্ঠনেচ্ছু ডাকাতের নিকট তলওয়ার বিক্রয় করে। এস্থলে যদি বলা হয় যে, এইরূপ ছাত্র হয়ত ধর্মপরায়ণ হইতে পারে তবে ডাকাতের বেলাও বলা যাইতে পারে যে, হয়ত এই ডাকাতও একদিন তওবা করিয়া জিহাদে গমন করিতে পারে। আবার যদি বলা হয় যে, তলওয়ার ও ডাকাতকে তওবার দিকে আহ্বান করে না; কিন্তু ইল্‌ম ও

সংসারাসক্ত আলিমকে তওবা ও আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করিয়া থাকে, তবে তদুত্তরে বলা হইবে যে, ইহাও ভুল। কারণ, ফতওয়া সম্বন্ধীয় ইল্‌ম, বিচার-মীমাংসা ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ব্যকরণ ও আভিধানিক বিদ্যা কাহাকেও আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ করে না। কেননা এই সমস্ত বিদ্যা ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না; বরং ইহাদের প্রত্যেকটিই মানুষের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মভিমান, অহংকার, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বীজ বপন করিয়া থাকে। ইহা শুনা কথা নহে; বরং পরিলক্ষিত ব্যাপার এবং শুনা কথা কখনও চাক্ষুস দৃষ্ট বস্তুর সমান নহে। সুতরাং এই সমস্ত বিদ্যা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হইল উহার সত্যতা প্রমাণের মুখপেক্ষী নহে।

যাহারা এই জাতীয় বিদ্যা অর্জনে লিপ্ত ছিল তাহারা কিরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে এবং তাহাদের মৃত্যু কিরূপে ঘটিয়াছিল, একবার ভাবিয়া দেখ। যে ইল্‌ম মানুষকে আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ করে এবং পার্থিব মোহ হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে, তাহা হাদীস-তাফসীরের ইল্‌ম। এই ইল্‌মের বিস্তারিত বিবরণ অত্র গ্রন্থের 'বিনাশন' ও পরিত্রাণ' খণ্ডে প্রদান করা হইবে। অতএব আলিমের কর্তব্য এই ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া। কারণ, ইহা প্রত্যেকের অন্তরেই ক্রিয়া করিয়া থাকে। তবে এমন কঠিন হৃদয় কদাচিৎ দেখা যায় যাহার অন্তরে এই ইল্‌ম কোন ক্রিয়া করে না। সুতরাং উপরিউক্ত শর্তানুসারে কেহ ইল্‌ম শিখিতে চাহিলে তাহাকে শিক্ষা প্রদান না করিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করা মাহাপাপ। আবার যে ব্যক্তি হাদীস-তাফসীর ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ইল্‌ম শিক্ষা করে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে মান-সম্মান, প্রভাব -প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষাও তাহার অন্তরে প্রবল, এমন ব্যক্তিকে শিক্ষাদানে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এইরূপ লোককে শিক্ষা দিলে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইলেও সে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে এবং অপর লোকে তাহাকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবে। এই কথাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকের দ্বারা তাঁহার ধর্মের সাহায্য করাইয়া থাকেন যাহারা ইহা দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হয় না। মোমবাতি ইহার দৃষ্টান্ত। মোমবাতির আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত হয়; কিন্তু সে নিজে পুড়িয়া ও গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

এইজন্যই হযরত বিশরে হাফী (র) বুযর্গানে দীন হইতে শ্রুত হাদীস শরীফের সাতটি কিতাবের বাক্স মাটির নিচে পুতিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং এই হাদীসসমূহ কাহারও নিকট বর্ণনা করেন নাই। আর তিনি বলেন ঃ হাদীস বর্ণনা করিবার বাসনা আমার অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি বলিয়াই আমি এইগুলি বর্ণনা করিতেছি না। চুপ থাকিবার ইচ্ছা অন্তরে প্রবল থাকিলে হাদীস বর্ণনা করিতাম। বুযর্গগণ বলেন ঃ হাদীস বর্ণনা করাও সাংসারিক ব্যাপার। যে ব্যক্তি حَدَّثَنَا বলিয়া হাদীস বর্ণনা করে, তাহার বাসনা এই থাকে যে, লোকে তাহাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসাক।

হযরত আলী (রা) চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন ঃ এই লোকটি বলিতেছে اَعْرِفُوْنِى (তোমরা আমাকে চিনিয়া রাখ) ফজরের নামাযের পর উপস্থিত লোকদিগকে কিছু ওয়ায-নসীহত করিবার জন্য একব্যক্তি হযরত উমর (রা) নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে অনুমিত প্রদান করেন নাই। সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি নসীহত করিতে নিষেধ করেন ? হযরত উমর (রা) বলেলেন ঃ হ্যাঁ, আমার আশঙ্কা হইতেছে, পাছে তোমার অহংকার শেষ পর্যন্ত তোমাকে অত্যন্ত গর্বিত করিয়া না তোলে।

হযরত রাবেআ' আদবিয়াহ্ (র) হযরত সুফিয়ান সওরী (র)-কে বলিলেন ঃ আপনি সংসারের প্রতি আসক্ত না হইলে উত্তম লোক হইতেন। হযরত সুফিয়ান সওরী (র) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি সংসারাসক্ত হইলাম কিসে ? তিনি বলিলেন ঃ আপনি হাদীস বর্ণনা করা পছন্দ করিয়া থাকেন।

হযরত আবূ সুলায়মান খিতাবী (র) বলেন ঃ এ কালে যাহারা তোমার সংসর্গে থাকিয়া বিদ্যা শিখিতে চাহে, তাহাদিগ হইতে সতর্ক হও এবং দূরে সরিয়া থাক। কারণ, তাহাদের নিকট ধনও নাই, হৃদয়ের সৌন্দর্যও নাই। তাহারা বাহিরে তোমার প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, অথচ ভিতরে শত্রুতা বিদ্যমান। সম্মুখে তোমার প্রশংসা করে বটে, কিন্তু পশ্চাতে কুৎসা রটায়। তাহারা সকলেই কপট, পরোক্ষে নিন্দাকারী, প্রতারক ও ছলনাকারী। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা তোমাকে উপলক্ষ করিয়া তোমার সাহায্যে তাহাদের কুমতলবসমূহ সফল করিয়া লয়। তোমাকে তাহাদের গাধা বানাইয়া তাহাদের মতলব সিদ্ধির কাজে তোমাকে শহরের চারিদিকে ঘুরায়। তাহারা তোমার নিকট আগমন করিয়া তোমার উপকার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে এবং ইহার বিনিময়ে তুমি তাহাদের জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ, মান-সম্মান বিলাইয়া দাও- ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। তোমার নিকট তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, তুমি তাহাদের এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের ও বন্ধু-বান্ধবের যাবতীয় হক পালন করিতে থাক। তুমি নির্বোধের মত তাহাদের অনুগত হইয়া থাক এবং তাহাদের শত্রুদের সহিত ধৃষ্টতা কর। বিন্দু বিসর্গ ইহার বিপরীত করিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার ও তোমার বিদ্যার বিরুদ্ধে কেমন অপপ্রচার আরম্ভ করে এবং তোমার সহিত শত্রুতাচরণে কেমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়।

হযরত আবূ সুলায়মান (র)-এর উক্তি বাস্তব সত্য। কারণ এ যুগের কোন ছাত্রই সাংসারিক লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত উস্তাদ গ্রহণ করে না। উস্তাদের সাহায্যে তাহার জীবিকা নির্বাহ হউক, ছাত্র প্রথমত ঃ ইহাই চাহে। আর অসহায় উস্তাদ লোকের দৃষ্টিতে হেয় হইয়া পড়ার আশঙ্কায় শিক্ষা প্রদান কার্য ত্যাগও করিতে পারে না এবং অনাচারী ধনীদের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়াও তাহাদিগকে খোশামেদ না করিয়া ছাত্রদের

ভরণ-পোষণ কার্যও নির্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। ফলে ছাত্রদের কার্য নির্বাহের জন্য নিজের ঈমান হারাইতে হয়। অথচ এইরূপ ছাত্র পড়াইয়া কোন উপকারই হয় না। এই সকল আপদ হইতে দূরে থাকিয়া যদি কোন আলিম শিক্ষাদান কার্য চালাইতে পারেন তবে তাহা নির্জনবাস অপেক্ষ উৎকৃষ্টতর।

জনসাধারণের কর্তব্য ঃ কোন আলিমকে শিক্ষাদান কার্যে প্রবৃত্ত দেখিলে তাঁহার প্রতি এমন মন্দ ধারণা পোষণ করা উচিত নহে যে, তিনি ধন-মানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান করিতেছেন; বরং এইরূপ ধারণা, করিবে যে, তিনি একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিতেছেন। আলিমের প্রতি এইরূপ ধারণা পোষণ করা সর্বসাধারণের উপর ফরয। মানুষের অন্তর অপবিত্র হইলে ইহাতে সৎ সাধণা স্থান পায় না। কারণ, মানুষ নিজের স্বভাব দ্বারাই অপরকে যাঁচাই করিয়া থাকে। এই সমস্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য হইল, আলিমগণ যেন শিক্ষাদানের শর্তসমূহ অবহিত হন এবং জনসাধারণও যেন নিজেদের নির্বুদ্ধিতাবশত ঃ উক্তরূপ বাহানা করিয়া উলামায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোন প্রকার ত্রুটি না করে। কারণ, আলিমগণের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করিলে লোকজন বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয় আপদ ঃ উপকার গ্রহণ ও উপকার সাধন হইতে বঞ্চিত থাকা। এ স্থলে উপকার গ্রহণের অর্থ জীবিকা অর্জন। জনসমাজে মিলামিশা না করিলে তাহা সম্ভব হয় না। পরিবার-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উপার্জন পরিত্যাগ করিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করা উচিত নহে। কারণ, পরিবার-পরিজনকে বিনাশ করা কবীরা গুনাহ্। যাহার ধন-সম্পদ প্রচুর কিংবা যাহার পরিবারবর্গ নাই, তাহার জন্য নির্জনবাসই উত্তম। উপকার সাধন অর্থ সদ্কা-খয়রাত করা ও মুসলমানগণের হক প্রতিপালন করা। নির্জনবাসে গমন করিয়া বাহ্য ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন আধ্যাত্মিক কর্মে প্রবৃত্ত না হইলে তদ্রূপ নির্জনবাস পরিত্যগপূর্বক লোকালয়ে থাকিয়া হালাল উপার্জন করা ও সদ্কা-খয়রাত প্রদান করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাহার অন্তর যদি আল্লাহ্র মারিফাত ও যিকিরের প্রতি উন্মুক্ত থাকে তবে নির্জনবাস সমস্ত সদ্কা-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম। কারণ, উহাই সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য।

তৃতীয় আপদ ঃ অপরের অসৎ ব্যবহার ও হীন আচরণ সহ্য করিলে যে রিয়াযত -মুজাহাদা (আধ্যত্মিক সাধনা) হইয়া থাকে উহা হইতে বঞ্চিত থাকা এবং যে ব্যক্তি এখনও সাধনায় পূর্ণতালাভ করে নাই তাহার জন্য উহা হইতে বঞ্চিত না থাকা নিতান্ত উপাদেয়। কারণ, সৎস্বভাব সকল ইবাদতের মূল এবং মিলামিশা ও সঙ্গ ব্যতীত উহা লাভ করা যায় না। কেননা, মানুষের অসম্ভব আবদারে সহন-শীলতার পরিচয় দেওয়ার

নামই সৎস্বভাব। সূফীগণের খাদিমদের তাঁহাদের সাহচর্যে থাকার কারণ এই যে, তাহারা লোকের নিকট যাচাই করিয়া নিজেদের অহংকার ও আত্মগরিমা চূর্ণ করিবে, সূফীগণের সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া কৃপণতা বিদূরীত করিবে; তাঁহাদের তাবেদারী করিয়া অন্তর হইতে মন্দ স্বভাব দূর করিবে এবং তাহাদের সেবা ও খেদমত করিয়া তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও নেক দু'আর বরকত হাসিল করিবে। প্রাচীনকালে এই উদ্দেশ্যেই মুরীদগণ সূফীগণের খেদমত করিতেন যদিও আজকাল এই উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা অধিকাংশ মুরীদই ওলী-দরবেশগণের দু'আর বরকতে সাংসারিক মান-সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভের আশায় তাঁহাদের খেদমত করিয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি রিয়াযত (আধ্যাত্মিক সাধনা) সম্পন্ন করিয়াছে তাহার জন্য নির্জনবাসই শ্রেয়ঃ। কারণ, আজীবন পরিশ্রম ও কষ্টে নিজকে নিমজ্জিত রাখা রিয়াযতের উদ্দেশ্য নহে; যেমন, তিক্ততা ঔষধের উদ্দেশ্য নহে; বরং রোগমুক্তিই ঔষধের উদ্দেশ্য। রোগ নিরাময় হইলে ঔষধ সেবনের তিক্ততা সহ্য করার আবশ্যকতা রোগীর আর থাকে না। তদ্রূপ রিয়াযতেরও একটি উদ্দেশ্য আছে; ইহা হইল আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র দ্বারা অন্তরের সন্তুষ্টিলাভ করা। এই সন্তুষ্টিলাভের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে উহা নিজ হইতে বিদূরীত করতঃ আল্লাহ্র মহব্বতে নিমজ্জিত থাকাই রিয়াযতের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নিজে রিয়াযত করা যেমন আবশ্যক তদ্রূপ অপরকেও ইহার প্রতি আকর্ষণ করা এবং ইহার নিয়ম-কানূন শিক্ষা দেওয়া ধর্মের অন্যতম স্তম্ভ। নির্জনবাস অবলম্বন করিলে এই কাজ সম্পন্ন করা যায় না। অতএব মুরীদগণের সহিত মেলামেশা করা পীরের কর্তব্য। মুরীদান হইতে দূরে সরিয়া থাকা পীরের উচিত নহে। কিন্তু আলিমগণের যেমন মান-সম্মান ও রিয়ার আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শিক্ষকতা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক শিক্ষক পীরের পক্ষেও শর্তাবলী রক্ষা করিয়া মুরীদানের সহিত মেলামেশা করিতে পারিলে শিক্ষা-দানই নির্জনবাস অবলম্বন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে।

চতুর্থ আপদ ঃ নির্জনবাসে হয়ত নানারূপ অলীক কল্পনার উদ্রেক হইতে পারে এবং আল্লাহর যিকরের প্রতি মনে উদাস ও উচাটন-ভাব জন্মিতে পারে। বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মেলামেশা দ্বারা এই ভাব দূরীভূত হয়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি সন্দেহের আশঙ্কা না করিলে লোকদের নিকট উপবেশন করিতাম না অর্থাৎ নির্জনবাস অবলম্বন করিতাম। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ হে লোকগণ! অন্তরের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইও না। কারণ, হঠাৎ অন্তরের

উপর জবরদস্তি করিলে অন্তর অন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং প্রত্যহ কিছুক্ষণ কোন বন্ধুর সৎসঙ্গে থাকিয়া আনন্দলাভ করিবে। ইহাতে মনের স্ফূর্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই বন্ধু এমন হওয়া উচিত যাহার সহিত একমাত্র ধর্মের আলাপই হইয়া থাকে এবং ধর্ম-কর্মে নিজ নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করিয়া পরস্পরের উহা সংশোধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। সংসারাসক্ত লোকের সংসর্গ মুহূর্তের জন্য হইলেও ক্ষতিকর এবং সারাদিনের সাধনায় মানুষ অন্তরের যে পবিত্রতাটুকু অর্জন করে, মুহূর্তকাল এইরূপ লোকের সংসর্গে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ নিজ বন্ধু ও সঙ্গীর গুণসম্পন্ন হইয়া পড়ে। অতএব কাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে যাইতেছ, এইদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

পঞ্চম আপদ ঃ নির্জনবাস অবলম্বন করিলে রোগীর অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় শরীক হওয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা করা, কাহারও সুখে-সম্পদে অভিনন্দন ও শোকে-দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করা এবং লোকের নানাবিধ হক পালন হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। অপর পক্ষে এই সমস্ত কাযে বহু আপদও রহিয়াছে। অনেক সময় এই সকল কাযে কপটতা ও লৌকিকতা অনুপ্রবেশ করে। কোন কোন লোক এই সমস্ত কার্যের আপদ হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারে না এবং যথাযথ শর্তাবলী পালনপূর্বক এই সকল কার্য সামাধা করিতে সমর্থ হয় না। এমন লোকের জন্য নির্জনবসাই উত্তম। প্রাচীনকালের বহু বুযর্গই এই সমস্ত কার্য পরিত্যাগ পূর্বক নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, ইহাতেই তাঁহারা তাঁহাদের পরিত্রাণের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ আপদ ঃ জনসমাজে বাস করিয়া লোকের হক পালন করাও এক প্রকার বিনয় এবং নির্জনবাস অবলম্বনে এক প্রকার অহংকার রহিয়াছে। আবার নির্জনবাসে হয়ত মনে এমন ভাবেরও উদয় হইতে পারে-আমি শ্রেষ্ঠ, আমি অপর কাহারও সহিত সাক্ষাত করিতে যাইব না। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য মানুষ এখানে আসুক।

কাহিনী ঃ কথিত আছে যে, বনি ইসরাঈল বংশে একজন বড় জ্ঞানী লোক ছিলেন। হিকমত শাস্ত্রে তিনি তিনশত ষাটটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এমন কি পরিশেষে তিনি মনে করিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তিনি বিশেষ মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। ইহাতে তৎকালীন নবী (আ) -এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইল ঃ সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলিয়া দাও যে, সে সমগ্র জগতে সুনাম ও খ্যাতি অর্জনপূর্বক প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার এই খ্যতি আমি কবূল করি নাই। ইহা

শুনিয়া লোকটি ভীত হইয়া পড়িল এবং সেই কার্য পরিত্যাগপূর্বক নির্জনবাস অবলম্বন করিয়া মনে মনে বলিল ঃ এখন হয়ত আল্লাহ্ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পুনরায় নবী (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ হইল ঃ তাহার প্রতি আমি এখনও সন্তুষ্ট হই নাই। অনন্তর সেই ব্যক্তি নির্জনবাস বর্জনপূর্বক বাহিরে আসিল, বাজারের চলাফেরা এবং জনসমাজে মিলামিশা করিতে লাগিল। লোকজনের সহিত উঠা-বসা, পানাহার, অলিগলি ও বাজারে যাতায়াত আরম্ভ করিল। তখন ওহী আসিল ঃ এখন সেই ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টিলাভ করিয়াছে।

কোন কোন লোক অংহংকারের বশীভূত হইয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিয়া থাকে। কারণ, সে ভয় করে যে, জনসমাজে, সভায় ও মজলিসে লোকে তাহার সম্মান করিবে না অথবা তাহার আশঙ্কা হয় যে, জ্ঞানে ও কার্যকলাপে তাহার দোষ-ত্রুটি লোকে জানিয়া ফেলিবে। সুতরাং স্বীয় দোষ-ত্রুটি নির্জনবাসের আবরণে সে ঢাকিয়া রাখে। আর সর্বদা সে কামনা করে, লোকে তাহার দর্শনের জন্য আগমন করুক এবং তাহার নিকট হইতে বরকতলাভ করুক ও তাহার হস্ত চুম্বন করুক। এই প্রকার নির্জনবাস খাঁটি মুনাফিকী।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নির্জনবাস ঃ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নির্জনবাসের দুইটি নিদর্শন আছে। প্রথম নিদর্শন বৃথা সময় নষ্ট না করা এবং যিকর ও ফিকিরে (ধ্যানে) অথবা জ্ঞান চর্চায় ও ইবাদতে লিপ্ত থাকা। দ্বিতীয় নিদর্শন, যাহা হইতে ধর্ম-কর্মে কোন উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই, এমন লোক সাক্ষাত করিতে আসিলে বিরক্ত হওয়া।

তূষ নগরের জনৈক বুযর্গ হযরত খাজা আবুল হাসান হাতেমী (র) একদা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওলী হযরত শায়খ আবুল কাসেম গুর্গানী (র)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়া ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন ঃ আমার ত্রুটি এই যে, আমি আপনার নিকট খুব কম হাযির হইয়া থাকি। হযরত শায়খ (র) বলিলেন ঃ হে খাজা! ত্রুটি স্বীকার করিও না। কারণ, কেহ আসিয়া দেখা-সাক্ষাত করিলে অপর লোক নিজেকে যেমন অনুগৃহীত মনে করে, কেহ না আসিলে আমি নিজেকে তদ্রূপ অনুগৃহীত মনে করিয়া থাকি। কেননা, আমি মালাকুল মউত হযরত আজরাঈল (আ) এর প্রতিক্ষায় আছি। অপর কাহারও আগমনের প্রতিক্ষা করি না।

এক ধনী ব্যক্তি হযরত হাতেম আসম্ম (র)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল ঃ আপনাদের কোন কিছুর আবশ্যকতা আছে কি ? তিনি বলিলেন ঃ আমার এই আবশ্যকতা আছে যে, দ্বিতীয়বার তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিও না; আমিও যেন তোমাকে পুনর্বার না দেখি।

স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে নির্জনবাস অবলম্বন করা নিতান্ত নির্বোধের কাজ। এইরূপ ব্যক্তি অন্ততপক্ষে এতটুকু বুঝিবে যে, নির্জনবাসের ফলে তাহারা অবস্থা কেহই জানিবে না। অথচ সে ব্যক্তি অবগত আছে যে, পর্বতের চূড়ায় অবস্থান করিলেও পরছিদ্রান্বেষীরা বলিবে ঃ এ ব্যক্তি ভণ্ডামী ও মুনাফিকী করিতেছে। পক্ষান্তরে জনসমাজে থাকিয়া শরাবখানায় যাতায়াত করিলেও তাহার বন্ধু-বান্ধব ও মুরীদগণ বলিবে ? লোকচক্ষে হেয় হওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র সাজিতেছেন। মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, একদল লোক সর্বদা তাহার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে এবং একদল লোক তাহার প্রশংসা কীর্তন করিবে। এই দুই পক্ষ সকল অবস্থায়ই থাকিবে। এমতাবস্থায় মানুষের সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজকে সর্বদা ধর্মের দিকে আকৃষ্ট রাখাই কর্তব্য।

হযরত সহল তসতরী (র) এক মুরীদকে কোন কার্যের নির্দেশ দিলে তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ লোকের তিরস্কারের ভয়ে আমি ইহা করিতে অক্ষম। ইহাতে হযরত সহল তসতরী (র) স্বীয় বন্ধু-বান্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ মানুষ দুইটি গুণের কোন একটি অর্জন না করা পর্যন্ত সে উক্ত কার্যের মর্ম অবগত হইতে পারিবে না। প্রথম গুণ এই যে, তাহার যাবতীয় কার্যের লক্ষ্য হইত আল্লাহ্ ব্যতীত আর সকল পদার্থই বাহির হইয়া পড়ে; একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুর প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হয় না হয়। দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাহার 'আমিত্ব' লোপ পাওয়া। লোকে তাহাকে কি বলিবে, না বলিবে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই না করা।

হযরত হাসান বসরী (র)-কে বলা হইল ঃ কতিপয় লোক আপনার সভায় যোগদান করত ঃ আপনার কথার সমালোচনা ও দোষান্বেষণ করিয়া থাকে। তিনি বলিলেন ঃ আমি বুঝিয়াছি আমার মন কেবল সর্বোচ্চ বেহেশত ফিরদাউস ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভের জন্যই ব্যগ্র; লোকের অপবাদ হইতে নিরাপদে থাকার আকাঙ্ক্ষা মোটেই করি না। কারণ, আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ও মানুষের রসনা হইতে অব্যাহতি পান নাই।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে নির্জনবাসের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ। এখন প্রত্যেকেই নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর এবং উক্ত উপকারিতা -অপকারিতাসমূহ বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন্‌টি অবলম্বন করা তোমার জন্য শ্রেয় ঃ

নির্জনবাসের নিময় ঃ নির্জনবাস অবলম্বনকারী এইরূপ নিয়্যত করিবে ঃ এই নির্জনবাসে আমি মানুষকে আমার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিতেছি, মানুষের অনিষ্ট হইতে

নিজের নিরাপত্তা কামনা করিতেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্য অবসর ও একাগ্রতা চাহিতেছি। নির্জনবাসে মুহূর্তকালও অযথা নষ্ট করিবে না, বরং সর্বদা যিকর, ধ্যান, জ্ঞানচর্চা ও ইবাদতে লিপ্ত থাকিবে। অপর লোককে নিকটে আসিতে দিবে না। দেশের অবস্থা, খবরাদি কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিবে না। কারণ, নির্জনবাসে দেশের সংবাদ শ্রবণ করিলে তাহা অন্তরে বীজরূপে পতিত হইয়া অতিদ্রুত অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইতে থাকে। অথচ অন্তর হইতে বাজে চিন্তা-ভাবনা বিদূরীত করিয়া ফেলাই নির্জনাবাসের প্রধান কার্য, যেন আল্লাহ্র যিকর স্বচ্ছ ও অনাবিল হইয়া উঠে। লোকের কথা অন্তরে বাজে চিন্তা উৎপন্ন হওয়ার বীজ স্বরূপ হইয়া থাকে। নির্জনবাসে সামান্য পরিমাণ খাদ্যে ও বস্ত্রে পরিতুষ্ট থাকা উচিত। অন্যথায় লোকের সহিত মেলামেশা করিবার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে।

নির্জনবাসে প্রতিবেশির প্রদত্ত দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য অবলম্বন করিবে। তাহারা তোমার নিন্দাবাদ বা প্রশংসাই করুক, তোমাকে মুনাফিক, রিয়াকার বা বুযর্গই বলুক অথবা তোমাকে অহংকারী ও প্রতারক বলুক, কোন কিছুর প্রতিই কর্ণপাত করিবেনা। কারণ, সেদিকে লক্ষ্য করিলে তোমার সময় বৃথা নষ্ট হইবে। অথচ সর্বদা নিবিষ্ট চিত্তে পরকালের কার্যে লিপ্ত ও নিমজ্জিত থাকাই নির্জনবাসের উদ্দেশ্য।

সপ্তম অধ্যায়

ভ্রমণ (বিলাস)

ভ্রমণ দুই প্রকার। একটি মানসিক ভ্রমণ এবং অপরটি দৈহিক ভ্রমণ। আসমান যমীন, আল্লাহর বিচিত্র ও বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহ এবং ধর্ম পথের বিভিন্ন স্তরে অন্তরের ভ্রমণকে মানসিক ভ্রমণ বলে। ইহাই সিদ্ধ পুরুষ বুযর্গগণের ভ্রমণ। তাঁহারা তো দেহখানিকে লইয়া স্বীয় গৃহে উপবিষ্ট থাকেন। কিন্তু অন্তরে তাঁহারা আসমান-যমীন বিস্তৃত, বরং তদপেক্ষা বৃহত্তর বেহেশত বিচরণ করিয়া থাকেন। কারণ আধ্যাত্মিক জগত অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বেহেশ্ত। এই ভ্রমণে তাঁহাদের জন্য কোনরূপ বাধা বিঘ্ন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা এই ভ্রমণের দিকেই মানবকে আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ

তোমরা আসমানসমূহ ও ভূ-মণ্ডলের রাজ্যসমূহের প্রতি এবং ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি যাহা আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন- চাহিয়া দেখিতেছ না ?

যে ব্যক্তি এই মানসিক ভ্রমণে অক্ষম, তাহার দৈহিক ভ্রমণ করা আবশ্যক। শরীরকে বিভিন্ন স্থানে বহন করিয়া নিয়া প্রত্যেক স্থান হইতে উপকার লাভ করিবে। এইরূপ দৈহিক ভ্রমণকারীকে পদব্রজে মক্কাশরীফে গমনপূর্বক কা'বাশরীফের যিয়ারতকারীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে মানসিক ভ্রমণকারী এমন ব্যক্তি সদৃশ্য যিনি নিজ স্থানে উপবিষ্ট থাকেন, একপদও নড়া-চড়া করেন না; বরং কা'বাশরীফ নিজেই আসিয়া তাঁহার চারিদেকে প্রশিক্ষণ (তওয়াফ) করিতে থাকে এবং নিজ গুপ্ত রহস্যসমূহ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে থাকে। এই দুই ভ্রমণকারীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এইজন্যই হযরত সাঈদ (র) বলিতেন কাপুরুষদের পায়ে কড়া পড়িয়াছে এবং মহাপুরুষদের পাছায় (চূতড়ে) কড়া পড়িয়াছে।

মানসিক ভ্রমণের বিবরণ অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং এই গ্রন্থে উহার বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে না। এই গ্রন্থে দৈহিক ভ্রমণের নিয়মাবলী দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ

ভ্রমণের নিয়্যত, নিয়মাবলী ও শ্রেণীবিভাগ ঃ ভ্রমণ পাঁচ প্রকার। প্রথম প্রকার ভ্রমণ, ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ভ্রমণ। মানুষের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা যখন ফরয তখন তজ্জন্য ভ্রমণ করাও ফরয। ইল্‌ম শিক্ষা করা যখন সুন্নত যখন তজ্জন্য ভ্রমণ করাও সুন্নত। বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ আবার তিন প্রকার।

১. শরীয়াতের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ভ্রমণ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হয় সে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে চলিতে থাকে। হাদীস শরীফে উক্তি আছে ঃ তালিবে ইল্‌মের জন্য ফেরেশতাগণ নিজেদের পালক বিছাইয়া রাখে।

পূর্বকালীন বুযর্গগণের কেহ কেহ এক-একখানি হাদীসের জন্য দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন। হযরত শাআ'বী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধর্ম-বিষয়ে হিতকর একটি বাক্য শ্রবণের উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে ইয়েমেন পর্যন্ত ভ্রমণ করে, তাহার ভ্রমণ বৃথা হইবে না। কিন্তু ভ্রমণ এমন ইল্‌ম লাভের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত যাহা পরকালের পাথেয় হইতে পারে। যে বিদ্যা দুনিয়া হইতে আখিরাতের প্রতি, লোভ হইতে অল্পে পরিতুষ্টির প্রতি, রিয়া হইতে ইখলাসের প্রতি এবং লোকের ভয় হইতে আল্লাহর ভয়ের প্রতি আকর্ষণ করে না, তাহা নিতান্ত ক্ষতির হইবে।

২. সৎস্বভাব সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নিজের মন্দ স্বভাব সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা। এই প্রকার ভ্রমণও নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, মানুষ যখন নিজ গৃহে অবস্থান করিতে থাকে এবং নিজ অভিলাষ অনুযায়ী কার্য নির্বাহ হইতে দেখে তখন সে নিজকে ভাল ও সৎস্বভাবে বলিয়া মনে করে। ভ্রমণে বাহির হইলে স্বভাবের গুপ্ত আবরণ মুক্ত হইয়া প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হইয়া পড়ে। এমন ঘটনা তাহার সম্মুখে আসিয়া ধরা পড়ে যাহাতে সে নিজের হিংসা-বিদ্বেষ, কুস্বভাব ও দুর্বলতা বুঝিতে পারে। মানুষ স্বীয় রোগ বুঝিতে পারিলেই উহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে না সে কাজে-কর্মে নিপুণতা লাভ করে না। হযরত বিশরে হাফী (র) বলেন ঃ হে আলিমগণ! ভ্রমণ কর যেন পবিত্র হইতে পার। কারণ, পানি একস্থানে আবদ্ধ থাকিলে দুর্গন্ধযুদ্ধ হইয়া পড়ে।

৩. জল-স্থল, পাহাড়-পর্বত, উন্মুক্ত মাঠ, নব নব শহর এবং সমস্ত বিশ্বচরাচরে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নানা জাতীয় জীবজন্তু, উদ্ভিদ প্রভৃতি সৃজনে আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল ও শিল্প নৈপূণ্য দর্শন করা এবং এই সমস্তই যে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে ও তাঁহার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, উহা উপলব্ধি করিবার জন্য ভ্রমণ করা। এই সকল নির্জীব পদার্থের অক্ষর ও স্বরবিহীন ভাষা শ্রবণ করিবার এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের চেহারার উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার অক্ষর

ও চিহ্নবিহীন লিপি পাঠ করিবার ক্ষমতা যাহাদের আছে ও আল্লাহ্‌র রাজ্যের নিদর্শনাবলী যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবার আবশ্যকতা তাহার থাকে না; বরং আকাশের রাজ্যসমূহ তথা সৌরজগত দিবারাত্র তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বীয় বিচিত্র দৃশ্য ও কার্যাবলী তাঁহাকে জানাইয়া দিতেছে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ–

আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিচিত্র মহিমার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে যাহাদের উপর তাহারা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহারা সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

মানুষ শুধু নিজের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং গুণারাজির সৃষ্টির প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়া দেখিতে থাকিলে তাহার সমগ্র জীবন তৎসমুদয় পরিদর্শন ও পরিভ্রমণেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। বরং সে নিজে বিচিত্র গুণাবলী তখনই দেখিতে পাইবে যখন সে বাহ্যচক্ষু বন্ধ করিয়া অন্তর চক্ষু উন্মুক্ত করিবে। এক বুযর্গ বলেন ঃ লোক বলে-চক্ষু খোল, তাহা হইলে বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহ দেখিতে পাইবে। কিন্তু আমি বলি চক্ষু বন্ধ কর, তাহলে বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহ দেখিতে পাইবে। এই উভয়বিধ উক্তিই সত্য। কারণ, প্রাথমিক স্তর তো এই বাহ্যচক্ষু উন্মীলিত করিলে মানুষ বাহ্যজগতের বিচিত্র কার্যাবলী দেখিতে পারে। তৎপর দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হইয়া সে অভ্যন্তরীণ বিচিত্র কার্যাবলী দেখিতে পায়। বাহ্য বৈচিত্রসমূহের শেষ সীমা আছে। কেননা উহা জড় জগতের বাহ্য দেহসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহার সীমা আছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বৈচিত্রসমূহের সীমা নাই। প্রত্যেক বাহ্য আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের সহিত একটি গূঢ় তত্ত্ব ও একটি আত্মা হইয়া থাকে। বাহ্য আকৃতি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তু। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রসনাকে বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, উহা একখণ্ড মাংসপিণ্ড মাত্র এবং হৃৎপিণ্ডকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে উহাকে একখণ্ড রক্তপিণ্ড বলিয়া মনে হইবে।

প্রিয় পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখ্‌ত, রসনা ও হৃৎপিণ্ডের প্রকৃতিগত গুণ ও মূল্যতত্ত্বের তুলনায় চর্মচক্ষে দৃষ্ট ইহাদের বাহ্য আকৃতি কত তুচ্ছ! বিশ্ব জগতের প্রতিটি অণূ-পরমাণূ এবং প্রতিটি বস্তুর অবস্থাই এইরূপ। আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে বাহ্য দৃষ্টি ব্যতীত অন্তর দৃষ্টি প্রদান করেন নাই তাহারা প্রায় চতুষ্পদ জন্তুর সমশ্রেণীর। কিন্তু কোন কোন বিষয় বাহ্যচক্ষু অন্তর-চক্ষুর চাবিস্বরূপ। এইজন্য সৃষ্টিকর্তার বিচিত্র সৃষ্টি-নৈপূণ্য দর্শন উপলক্ষে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ নিষ্ফল নহে।

দ্বিতীয় প্রকার ভ্রমণ ঃ ইবাদতের উদ্দেশ্যে যে ভ্রমণ করা হয় উহা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হজ্জ, জিহাদ এবং আম্বিয়া, সাহাবা, তাবেঈন ও আউলিয়ার মাযার যিয়ারত, এমনকি আলিম ও বুযর্গগণের সহিত সাক্ষাতের জন্য ভ্রমণ। কারণ, খাঁটি আলিম ও বুযর্গগণের চেহারা মুবারক দর্শন করা ইবাদতের মধ্যে গণ্য। তাঁহাদের দু'আতে যথেষ্ট বরকত রহিয়াছে। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের অন্যতম উপকারিতা এই যে, তাহাদিগকে অনুসরণের ইচ্ছা জন্মে। সুতরাং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করা ইবাদত ও ইবাদতের বীজ, এই উভয়ই। যখন তাঁহাদের উপদেশবাণী ধর্ম-পথের সহায়ক হয় তখন তাঁহাদের দর্শনের উপকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক বুযর্গগণের মজলিসে ও কবরস্থানে গমন করা দুরস্ত আছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যে বলিয়াছেন ঃ

لَاتَشُدُّوْا الرِّحَالَ اِلاَّ ثَلْثِ مَسَاجِدَ-

মক্কাশরীফ, মদীনাশরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত অপর কোন স্থানের উদ্দেশ্যে যানবাহনে ভ্রমণ করিও না।

এই হাদীস দ্বারা প্রকাশ্যভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ ও মাযারে বরকতের জন্য গমন করিও না। এই তিন মসজিদ ব্যতীত আর সমস্ত মসজিদের মর্যাদা সমান। কিন্তু জীবিত আলিম ও বুযর্গগণের মসলিসে গমনপূর্বক তাঁহাদের সাহচর্য অবলম্বন করা যেমন এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নহে, তদ্রূপ পরলোকগত খাঁটি আলিম ও বযুর্গগণের কবরস্থান যিয়ারত করাও এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নহে। অর্থাৎ এই নিষেধবাণী দ্বারা জীবিত আলিমগণের মজলিসে গমন করা যেমন নিষিদ্ধ হয় নাই, তদ্রূপ মৃত বুযর্গগণের কবর যিয়ারত করাও নিষিদ্ধ হয় নাই। অতএব, এই উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিয়া আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের কবরস্থানে গমণ করা দুরস্ত আছে।

তৃতীয় প্রকার ভ্রমণ ঃ ধর্ম-বিষয়ে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বিষয় হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য ভ্রমণ করা। যেমন, মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ এবং সাংসারিক কার্যে লিপ্ততা প্রভৃতি চিত্ত চাঞ্চল্যকর বিষয় হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহির হইয়া যাওয়া। যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়-আশয় লইয়া ধর্ম-পথে চলিতে পারে না, তাহার জন্য এই ভ্রমণ ফরয। কারণ, সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত এবং হৃদয় প্রশান্ত ও উদ্বেগশূন্য হইলেই মানব ধর্ম-পথে অটলভাবে চলিতে পারে। যদিও মানুষ স্বীয় সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারে না, তথাপি সে নিজকে হালকা করিয়া লইতে পারে।

وَقَدْ نَجَا الْمُخَفِّفُوْنَ

যাহারা দুনিয়ার ঝামেলা হইতে নিজদিগকে হালকা করিয়া লইয়াছে তাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে, যদিও তাহারা সম্পূর্ণরূপে বোঝাশূন্য হয় নাই।

একবার কাহারও ধন-সম্পদ হস্তগত হইলে এবং খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িলে, সচরাচর দেখা যায় যে, উহাই তাহাকে আল্লাহ্ হইতে ফিরাইয়া রাখে।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ ইহা মন্দকাজ এখন নিতান্ত অপরিচিত লোকেরাও বৃথা প্রশংসাবাদে অহংকৃত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, এমতাবস্থায় বিখ্যাত লোকদের কি অবস্থা হইবে ? সুতরাং একালে যেখানে লোকে তোমাকে চিনিতে পাইয়াছে তথা হইতে তুমি পলায়ন কর এবং যেখানে তোমাকে কেহ চিনে না সেখানে চলিয়া যাও। একদিন লোকে দেখিতে পাইল, হযরত সুফিয়ান সওরী (র) পিঠে বোচকা লইয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি কোথায় যাইতেছেন ? তিনি বলিলেন ঃ অমুক গ্রামে যাইতেছি। আমি শুনিয়াছি তথায় তরি-তরকারী খুব সস্তা। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি কি ইহা শ্রেয়ঃ মনে করেন ? তিনি বলিলেন ঃ যেখানে জীবিকা সচ্ছন্দে পাওয়া যায় সেখানে ধর্ম নিরাপদ ও অন্তর উদ্বেগশূন্য থাকে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) চল্লিশ দিনের অধিক কোন নগরে অবস্থান করিতেন না।

চতুর্থ প্রকার ভ্রমণ ঃ সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য বসবাসের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা। এরূপ ভ্রমণ দুরস্ত (মুবাহ্) ব্যবসায়ী নিজকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে পরের গলগ্রহ হওয়ার আপদ হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিলে এইরূপ ভ্রমণ ইবাদত বলিয়া গণ্য হইবে। আর পার্থিব জাঁক-জমক ও ধন-সম্পদ অতিরিক্ত বাড়াইয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিলে ইহা শয়তানের পথে হইতেছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী খুব সম্ভব যে, সারাজীবন ভ্রমণের কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবে। কারণ, প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণের কোন সীমা নাই। পরিশেষে হয়ত একদিন অকস্মাৎ চোর-ডাকাত তাহার সমস্ত ধন লুণ্ঠন করিয়া নিবে অথবা বিদেশে কোন অপরিচিত স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং তাহার সমস্ত ধন রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে ও ইহাই তাহার পক্ষে উৎকৃষ্ট, উত্তরাধিকারগণ তাহা পাইলে নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থে সমস্ত ধন উড়াইয়া দিবে এবং মৃতের কথা স্মরণও করিবে না। তাহার কোন ওসীয়ত থাকিলে তাহাও তাহারা পালন করিবে না; সে ঋণগ্রস্ত থাকিলে সেই ঋণও পরিশোধ করিবে না এবং পরকালে এই ঋণের বোঝা মৃতের স্কন্ধেই থাকিয়া যাইবে। ধন-সম্পদ অর্জনের সকল কষ্ট সে সহ্য করিবে এবং সমস্ত বোঝা নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া পরলোক গমন করিবে,

অথচ তাহার অর্জিত ধন-সম্পদ অপর লোকে ভোগ করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য ও ক্ষতি আর কি হইতে পারে ?

পঞ্চম প্রকার ভ্রমণ ঃ পর্যটন ও আমোদের জন্য ভ্রমণ। এইরূপ ভ্রমণ কম ও কদাচিৎ হইলে মুবাহ্ (নিষিদ্ধ নহে)। কেহ যদি বিভিন্ন শহরে ঘুরাফিরার অভ্যাস করিয়া লয় এবং নূতন নূতন দেশ ও মানুষ দেখা ব্যতীত তাহার অপর কোন উদ্দেশ্য না থাকে তবে এই প্রকার ভ্রমণ সম্বন্ধে আলিমগণের মতভেদ আছে। কতিপয় আলিম বলেন, এইরূপ ভ্রমণে নিরর্থক নিজকে কষ্ট দেওয়া হয়। সুতরাং ইহা উচিত নহে। কিন্তু আমাদের মতে এইরূপ ভ্রমণ হারাম হইবে না। কারণ, আমোদও একটি উদ্দেশ্য, যদিও ভাল নহে। প্রত্যেকের মুবাহ্ কার্য তাহার উপযোগী হইয়া থাকে এবং এই শ্রেণীর লোক নিকৃষ্ট স্বভাবের হইয়া থাকে। এই প্রকার ভ্রমণ তাহারই উপযোগী কিন্তু ছেঁড়া কাপড়ের আলখাল্লা পরিহিত যে সমস্ত ফকীর শহরে শহরে এবং স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভ্যাস করিয়া লইয়াছে কোন কামিল পীর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সাহচর্য অবলম্বন করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে; বরং দেশ ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদই তাহাদের উদ্দেশ্য। কারণ তাহারা ইবাদতে স্থির থাকিতে পারে না এবং তাহাদের অন্তরের দ্বার তাসাউফের মাকামাতের দিকে উন্মুক্ত হয় নাই। অলসতা ও অকর্মণ্যতাবশতঃ কোন পীরের আদেশে কোন এক স্থানে বসিয়া তাহারা ইবাদতে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহারা শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে সুস্বাদু খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে। যেখানে সুস্বাদু খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, সেখানে খাদিমগণের প্রতি কটু ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে। অথচ বাহিরে প্রকাশ করে যে, বুযর্গানে দীনের মাযারী যিয়ারতের জন্য যাইতেছে, সুস্বাদু খাদ্যের লোভে নহে। এই প্রকার ভ্রমণ হারাম না হইলেও মাকরূহ। এ সমস্ত লোক পাপী ও ফাসিক না হইলেও তাহারা যে মন্দ , ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি সুফীগণের খাদ্য ভক্ষণ করে, ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং নিজকে সূফী বলিয়া পরিচয় দেয়, সে পাপী ও ফাসিক হইবে। আর সে ভিক্ষারূপে যাহা কিছু গ্রহণ করে তাহা হারাম। কারণ, প্রত্যেক আলখাল্লা পরিহিত ব্যক্তি কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িলেই সূফী হয় না; বরং সেই ব্যক্তিই সূফী যিনি আল্লাহ্‌কে পাইবার সাধনায় রত আছেন এবং এই কার্যে নিবিষ্ট আছেন অথবা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। বিনা কারণে তাঁহারা চেষ্টায় কখনও ত্রুটি করেন না। এমন লোকও আছে যে, এই দুই শ্রেণীর লোকের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত অপর কাহারও জন্য সূফীগণের খাদ্য ভক্ষণ করা হালাল নহে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত, যাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র অন্বেষণ নাই এবং তাঁহাকে পাওয়ার

চেষ্টাও যে করে না; ও সূফীগণের খিদমতেও যে লিপ্ত থাকে না, সে আলখাল্লা পরিধান করিলেই সূফী হইয়া যায় না। যে সমস্ত দ্রব্য লোকে পকেটমার ও বাটপাড়দের জন্য রাখিয়া দিয়াছে, উহা সে গ্রহণ করিতে পারে। কারণ, নিজকে সূফীগণের সাজে সাজাইয়া রাখা এবং তাঁহাদের গুণ ও স্বভাব অবলম্বন করা নিছক মুনাফিকী ও বাটপাড়ি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তাহারাই নিকৃষ্টতম যাহারা সূফীগণের কতিপয় বচন মুখস্ত করিয়া বেহুদা আওড়াইয়া বেড়ায় এবং মনে করে ভূত-ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞানই তাহারা অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রকার বুলি আওড়াইতে আওড়াইতে উহার আপদ তাহাদিগকে কখন কখন এমন সীমায় নিয়া পৌঁছায় যে, তাহারা উলামায়ে কিরাম ও তাঁহাদের জ্ঞানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে এবং শরীয়তও হয়ত তখন তাহাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে থাকে। আর তখন তাহারা বলিতে থাকে, শরীয়ত দুর্বলদের জন্য। কারণ, যাহাদের তরীকতের পথে সুদৃঢ় হইতে পারিয়াছে, শরীয়ত অমান্য করিলে, তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না। কেননা, তাহাদের ধর্ম একশত বর্গহাত পরিমিত হাউযে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে যাহার পানি কোন কিছুতেই নাপাক হইতে পারে না।

এই শ্রেণীর আলখাল্লাধারী ভণ্ড ফকীরগণ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তাহাদের একজনকে হত্যা করা রোম ও হিন্দুস্তানের হাজার হাজার কাফিরকে হত্যা করা অপেক্ষা শ্রেয়। কারণ, লোকে কাফিরদিগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু এই অভিশপ্তের দল নিজদিগকে মুসলমানরূপে পরিচয় দিয়া ইসলামকে ধ্বংস করিয়া থাকে। বর্তমানকালে শয়তান যত প্রকার ফাঁদ পাতিয়াছে তৎসমূদয়ের মধ্যে এই ফাঁদ সর্বাপেক্ষা দৃঢ় । হাজার হাজার লোক এই ফাঁদে পড়িয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ভ্রমণের বাহ্য নিয়মাবলী ঃ ভ্রমণের শেষ পর্যন্ত আটটি নিয়ম আছে।

প্রথম নিয়ম ঃ প্রথমে ঋণ পরিশোধ করিবে; কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকিলে ক্ষমা লইবে এবং বলপূর্বক কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিলে ফেরত দিবে। কাহারও কোন বস্তু আমানত রাখিয়া থাকিলে ফিরাইয়া দিবে। যে সমস্ত লোকের ভরণ-পোষণ তোমার প্রতি ওয়াজিব, তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং পথ খরচা হালাল মাল হইতে সংগ্রহ করিবে। পথ খরচের জন্য এ পরিমাণ অর্থ সঙ্গে লইবে যাহাতে সঙ্গীদের সাথে সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিতে পার। কারণ, তাহাদিগকে আহার করান ও তাহাদের সঙ্গে সদালাপ ও প্রিয় সম্ভাষণ করা এবং যাহাদের গাড়ী-ঘোড়া ভাড়া লওয়া হয়, তাহাদের আতিথ্য করা সৎস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ এমন সচ্চরিত্র ও নম্র স্বভাবের সঙ্গী গ্রহণ করিবে, যে ধর্ম-কর্মে সাহায্যকারী হইয়া তাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন

এবং বলিয়াছেন যে, তিনজন লোক হইলেই জামায়াত হয়। হুযূর (সা) বলেন ঃ সফরে একজনকে নিজেদের নেতা ও সরদার বানাইয়া লওয়া মুসাফিরদের উচিত। কারণ, সফরে (সহযাত্রীদের মধ্যে) মতানৈক্য হইয়া থাকে এবং যে কার্য একজনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে তাহা বিনষ্ট হইবে। বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা বিধান দুই খোদার উপর ন্যস্ত থাকিলে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যাইত। আর এমন ব্যক্তিকে নেতা বানাইবে যে সৎস্বভাবে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বহুবার ভ্রমণ করিয়াছে।

তৃতীয় নিয়ম ঃ বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার-পরিজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে এবং প্রত্যেকের জন্য নিম্নরূপ দু'আ করিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন।

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ–

তোমার ধর্ম, তোমার আমানত এবং তোমার কার্যাবলীর পরিণাম আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করিলাম।

কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে সফরে যাত্রা করিলে তিনি এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا تَوَجَّهْتَ–

আল্লাহ্ পরহিযগারীকে তোমার পথের সম্বল করুন এবং তোমার গুনাহ্ মাফ করুন ও তুমি যেদিকে মুখ ফিরাও সেদিকেই তোমার মঙ্গল করুন।

ভ্রমণে যাত্রাকারীকে এইরূপ দু'আ করা গৃহে অবস্থানকারীর উপর সুন্নত এবং বিদায়কালে সকলকে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করা উচিত।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে ধন বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার শিশু ছেলেকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ছেলেটিকে দেখিয়া হযরত উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! তোমার আকৃতির সহিত এই ছেলেটির আকৃতির যতটুকু মিল দেখা যাইতেছে, পিতার সহিত পুত্রের আকৃতির এতটুকু মিল আমি আর কখনও দেখি নাই। সেই লোকটি নিবেদন করিল ঃ ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! এই বালকটির কাহিনী বিচিত্র ও অভিনব। ইহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি। এই শিশুটি মাতৃগর্ভে থাকাকালে আমি ভ্রমণে যাইতেছিলাম, এমন সময় স্ত্রী আমাকে বলিল, আমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া তুমি ভ্রমণে যাইতেছ? উত্তরে আমি বলিলাম ঃ

اَسْتَودِعُ اللّٰهَ مَا فِىْ بَطْنِكَ

তোমার গর্ভস্থিত সন্তানকে আমি আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করিলাম।

আমি সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। এক রাত্রে আমি বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলাম। দূরে আগুনের মত দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কি? সঙ্গীরা বলিল ঃ সেখানে তোমার স্ত্রীর কবর। প্রতি রাত্রেই আমরা এইরূপ দেখিয়া থাকি। আমি উত্তর করিলাম ঃ ইহা কিরূপে হইতে পারে? সেও নামায পড়িত, রোযা করিত। যাহাই হউক, আমি সেখানে গেলাম এবং ভিতরে কি আছে, দেখিবার জন্য কবর খুড়লাম। আমি দেখিতে পাইলাম, একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং এই ছেলেটি ইহা লইয়া খেলা করিতেছে। তখন আমি এক বাণী শুনিতে পাইলাম-ওহে! এই ছেলেটিকে তুমি আমার নিকট সোপর্দ করিয়াছিলে, এখন আমি তাহাকে তোমার নিকট সোপর্দ দিয়া দিলাম! তুমি তখন তাহার মাতাকেও আমার নিকট সোপর্দ করিলে আমি তাহাকেও তোমার নিকট দিয়া দিতাম।

চতুর্থ নিয়ম ঃ দুই প্রকার নামায পড়িবে। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বে 'ইস্তিখারা' নামায পড়িবে। এই নামাযের নিয়ম ও দু'আ সর্বজন বিদিত। তৎপর গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় দ্বিতীয় প্রকার নামায পড়িবে। ইহা চারি রাকা'আত। ইহার কারণ এই যে, হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া নিবেদন করিল ঃ আমি ভ্রমণে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আমি একখানি 'ওসীয়ত নামা' লিখিয়াছি। পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার মধ্যে কাহাকে প্রদান করিব? হুযূর (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ ভ্রমণে যাওয়ার প্রাক্কালে যে চারি রাকা'আত নামায পড়া হয় তদপেক্ষা প্রিয়তর ইহার কোন স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি আল্লাহ্‌র নিকট আর কিছুই হইতে পারে না। যখন সফরের সামানপত্র বাঁধিয়া ফেলিবে তখন এই নামাযে (প্রত্যেক রাকা'আতে) সূরা ফাতিহা ও সূরা কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ পড়িবে এবং এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَقَرَّبُ بِهِنَّ اِلَيْكَ فَاخْلُفْنِىْ بِهِنَّ فِىْ اَهْلِىْ وَمَالِىْ–

ইয়া আল্লাহ্! এই নামায দ্বারা আমি তোমার নৈকট্য প্রার্থনা করিতেছি। সুতরাং উহাকে আমার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পত্তির মধ্যে আমার প্রতিনিধি কর।

এই নামায তাহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পত্তিতে তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া থাকে এবং সে গৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত উহা তাহার গৃহের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহারা দেয়।

পঞ্চম নিয়ম ঃ ভ্রমণে যাত্রার সময় গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া এই দু'আ পরিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ–

আমি আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্‌র উপরই আমি নির্ভর করিতেছি। মন্দকার্য হইতে ফিরিবার ক্ষমতা ও সৎকার্যের শক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কাহারও নাই। ইয়া রব্ব! তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই কিংবা কাহাকেও যেন পথভ্রষ্ট না করি, আমি যেন কাহারও প্রতি অত্যাচার না করি কিংবা আমিও যেন অত্যাচারিত না হই আমি যেন অপরকে জ্ঞানহারা না করি কিংবা আমিও যেন কাহারও কর্তৃক জ্ঞানহারা না হই।

আর যানবাহনে আরোহণকালে এই দু'আ পড়িবে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ–

সেই আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন এবং ইতিপূর্বে ইহার উপর আমরা ক্ষমতাবান ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।

ষষ্ঠ নিয়ম ঃ বৃহস্পতিবার সকালের ভ্রমণে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সফরে বাহির হইবার ইচ্ছা করিলে কিংবা দু'আ করিতে হইলে উহা সকালে করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ السَّبْتِ–

ইয়া আল্লাহ্ ! আমার উম্মতগণের জন্য শনিবারের প্রাতঃকালে বরকত দান কর। হুযূর (স) এই দু'আও করিয়াছেন ।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا يَوْمَا الْخَمِيْسِ–

ইয়া আল্লাহ্! আমার উম্মতের জন্য বৃহস্পতিবারের প্রত্যূষে বরকত দান কর। অতএব শনিবার ও বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল মঙ্গলময়।

সপ্তম নিয়ম ঃ বাহন পশুর উপর অল্প বোঝা চাপাইবে। ইহার পিঠের উপর দাঁড়াইবে না ও শয়ন করিবে না। ইহার মুখের উপর আঘাত করিবে না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য পশুর পৃষ্ঠ হইতে নামিবে। ইহাতে নিজের পায়ের জড়তা দূর

হইবে এবং পশুর মালিকের মনও সন্তুষ্ট হইবে। পূর্বকালের কোন কোন বুযর্গ এইরূপ শর্তে পশু ভাড়া করিতেন যে, পথিমধ্যে কোথাও পশু পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহারা অবতরণ করিতেন যেন এই অবতরণ পশুর প্রতি বদান্যতা বলিয়া গণ্য হয়। পশুকে বিনা কারণে প্রহার করিলে অথবা ইহার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাইলে কিয়ামতের দিন ইহা আরোহীর সহিত ঝগড়া করিবে।

হযরত আবু দারদা (রা)-র একটি উট মারা গেলে তিনি ইহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ হে উট ! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিও না। কারণ তুমি জান যে, তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তোমার উপর বোঝা চাপাইয়াছি। পশুর উপর যত বোঝা চাপাইবে, পূর্বেই পশুর মালিককে তাহা জানাইয়া দিবে এবং শর্ত করিয়া লইবে। তাহা হইলে তাহার সন্তুষ্টি লাভ করিবে। আর চুক্তির অতিরিক্ত বোঝা ইহার উপর চাপাইবে না। হযরত ইব্‌ন মুবারক (র) উটের উপর আরোহী থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া অপর কাহারও নিকট দেওয়ার জন্য একটি চিঠি তাঁহার হস্তে দিতে চাহিলে তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই এবং বলিলেন ঃ ভাড়া করিবার সময় পশু মালিকের নিকট এই চিঠির কথা বলি নাই। যদিও চিঠির মত অতি সামান্য ওজনের দ্রব্য সঙ্গে লওয়াতে শরীয়তের ব্যবস্থা অনুযায়ী ক্ষতির কোন কিছুই নাই, তথাপি তিনি শরীয়তের বিধানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এই কার্য পরহিযগারী সম্মত নহে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে , রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে যাওয়ার সময় 'চিরুনী, আয়না, মিসওয়াক, সুর্মাদানী, এবং মুদরী (যদদ্বারা মাথার চুল সোজা করা হয়) নিজের সঙ্গে লইতেন। অপর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, তিনি সফরে নরুন ও শিশিও সঙ্গে লইতেন। সূফীগণ এতদসঙ্গে বালতি এবং রশিও সংযোগ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বকালীন বুযর্গগণের বালতী ও রশি লওয়ার অভ্যাস ছিল না কারণ, তাঁহারা যেখানেই গমন করিতেন পানি না পাইলে তায়াম্মুম করিতেন এবং মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচকার্যের পরিবর্তে প্রস্তর খণ্ড দ্বারা অপবিত্রতা দূর করিতেন। আর যে পানিকে পাক বলিয়া মনে করিতেন তদদ্বারা ওযূ-গোসলের কার্য সমাধা করিতেন। প্রাচীনকালের বুযর্গগণের বালতি ও রশি সঙ্গে লওয়ার অভ্যাস না থাকিলেও একালে উহা লওয়াই উত্তম। কারণ, একালের সফর এমন নহে যে, পবিত্রতা রক্ষার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা যাইবে না। আর সর্তকতা অবলম্বন করাই উত্তম। পূর্বকালের বযর্গগণ জিহাদ ও অন্যান্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য উপলক্ষে সফর করিতেন এবং এই জন্য অতিরিক্ত সতকর্তা অবলম্বনে লিপ্ত হইতেন না।

অষ্টম নিয়ম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে মদীনা শরীফের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ামাত্র এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا وَقْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا-

ইয়া আল্লাহ্! ইহাকে আমাদের জন্য শান্তিময় এবং উৎকৃষ্ট জীবিকাযুক্ত কর।

তৎপর কোন একজনকে প্রত্যাবর্তন-সংবাদ প্রদানের জন্য শহরে পাঠাইতেন এবং খবর না দিয়া হঠাৎ স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিতে সঙ্গীদিগকে নিষেধ করিতেন। একবার এই নির্দেশ অমান্য করিয়া দুই ব্যক্তি তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ গৃহে অপ্রিয় কায দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বপ্রথমে মসজিদে প্রবেশ করত ঃ দুই রাক'আত নামায পড়িতেন এবং গৃহে প্রবেশকালে এই দু'আ পড়িতেন ঃ

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لاَّ يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا-

আমার প্রভুর নিকট তওবা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম। এমন তওবা করিতেছি যাহাতে আমাদের পাপের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে।

প্রত্যাবর্তনের সময় গৃহবাসীদের জন্য উপঢৌকনাদি লইয়া আসা সুন্নতে মুআক্কাদা। হাদীস শরীফে আছে, কোন উপঢৌকন আনিবার মত সামর্থ্য না থাকিলে অন্তত একটি প্রস্তর খণ্ড বোচকার মধ্যে করিয়া আনিবে। এই সুন্নত পালনের প্রতি তাগিদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হুযূর (সা) এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন।

উপরে সফরের বাহ্য নিয়ম বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত আর কতকগুলি আভ্যন্তরীণ নিয়ম আছে যাহা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য পালনীয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভ্রমণের নিয়মাবলী ঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে পর্যন্ত বুঝিতে না পারেন যে, সফরেই তাঁহাদের ধর্মীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি নিহিত রহিয়াছে, সে পর্যন্ত তাঁহারা সফরে বাহির হন না এবং পথিমধ্যে নিজেদের অন্তরে ধর্ম সম্বন্ধে কিছুমাত্র ক্ষতি অনুভব করিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। আর সফরে বাহির হওয়ার সময় এইরূপ নিয়্যত করেন, যে নগরেই গমন করি না কেন, তথাকার, নেক্কার ও বুযর্গগণের কবর যিয়ারত করিব, পীরের অনুসন্ধান করিব এবং সকলের নিকট হইতেই উপকার লাভ করিব। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে পীর অনুসন্ধান করেন না যে, সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, 'অমুক পীরের দর্শন লাভ করিয়াছি" বলিয়া লোকের সম্মুখে গল্প বলিবেন; বরং কোন কামিল পীর পাইলে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, এই জন্যই তাঁহারা পীরের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা দশদিনের অধিক কোন শহরে অবস্থান করেন না। তবে পীরের দরবারে অবস্থানের প্রয়োজন হইলে দশদিনের অতিরিক্ত অবস্থান করেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে তথায় তিনদিনের অধিক থাকা উচিত নহে। কারণ, মেহমানদারীর সীমা এ পর্যন্তই। কিন্তু গৃহস্বামী আরও অধিককাল থাকিবার জন্য আন্তরিকতার সহিত আবদার

করিলে তিনদিনের অধিককালও অবস্থান করা যাইতে পারে। কোন বুযর্গের সহিত শুধু সাক্ষাতলাভের উদ্দেশ্যে গমন করিলে একদিন ও একরাত্রির অধিক তথায় অবস্থান করা উচিত নহে।

কাহারও সহিত সাক্ষাতের জন্য গমন করিলে তাঁহার দরজায় খট্ খট্ করিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ গৃহ হইতে বাহির না হয় ও তাঁহার সহিত সাক্ষাত না হয় ততক্ষণ ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিবে এবং অপর কোন কাজ আরম্ভ করিবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে কিছু বলিবে না। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই বলিবে। তুমি নিজে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলে তাঁহার অনুমতি লইয়া জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাঁহার বস্তিতে যাইয়া কোন আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইবে না। কারণ, ইহাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের বিশুদ্ধ সংকল্প বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যাতায়াতের পথে সর্বদা আল্লাহ্র যিকর ও তস্বীহে মগ্ন থাকিবে এবং কুরআন শরীফ নিম্নস্বরে পড়িতে থাকিবে যেন অপর কেহ শুনিতে না পায়। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তসবীহ বন্ধ করিয়া তাহার জওয়াব দিবে। সফরের যে উদ্দেশ্য, উহা গৃহেই সফল হইলে সফরে বাহির হইবে না। কারণ ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার দানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ভ্রমণে যাত্রার পূর্বে শিক্ষণীয় বিষয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সকল বিষয় মুসাফিরের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছেন (রুখসত) এবং অনুমতি (ইজাযত) প্রদান করিয়াছেন ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বে তৎসমুদয়ের জ্ঞানলাভ করা মুসাফিরের উপর ওয়াজিব। সহজ বিধানানুসারে কার্য করিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও ভ্রমণে এমন কোন আবশ্যকতা দেখা দেওয়া অসম্ভব নহে যাহার কারণে, সহজ বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতে পারে।

ভ্রমণকালে কিবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি ও নামাযের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জ্ঞান ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বেই অর্জন করা কর্তব্য। ভ্রমণকালে উযূ সম্বন্ধে দুইটি সহজ বিধান আছে মোজার উপর মাসেহ করা ও উযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা। ফরয নামাযেরও দুইটি সহজ বিধান আছে, নামাযে কসর করা এবং দুই ওয়াক্তের ফরয নামায একত্রে পড়া। সুন্নত নামাযে দুইটি সহজ বিধান আছে, যানবাহনের উপর অবস্থিত থাকিয়া পড়া এবং পদব্রজে চলিতে চলিতে পড়া। রোযা সম্বন্ধে সহজ বিধান একটি । সফরকালে রোযা না রাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর কাযা করা। সফরকালের ইবাদতের জন্য এই সাতটি সহজ বিধান রহিয়াছে।

প্রথম সহজ বিধান ঃ চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা। মুসাফির পূর্ণ পবিত্রতার সহিত মোজা পরিধান করিয়াছে, এমতাবস্থায় উযূ ভঙ্গ হইলে প্রথমবার উযূ

ভঙ্গ হইবার সময় হইতে তিনদিন তিনরাত্রি পর্যন্ত যতবার উযূ ভঙ্গ হইবে , প্রত্যেক উযূর সময় মোজা হইতে পা না খুলিয়া মোজার উপর মাসেহ করিলেই চলিবে, পা ধুইতে হইবে না। মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত্রি পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করিতে পারে।

মোজার উপর মাসেহের পাঁচটি শর্ত ঃ ১. সম্পূর্ণরূপে উযূ করিয়া মোজা পরিধান করিবে। ডান পা ধুইয়া বাম পা ধুইবার পূর্বে ডান পায়ে মোজা পরিলে হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে মোজার উপর মাসেহ করা সঙ্গত নহে। তবে বাম পা ধৌত করিয়া মোজা পরিবার পূর্বে ডান পায়ের মোজা খুলিয়া পুনরায় একসঙ্গে উভয় পায়ে মোজা পরিলে এই মোজার উপর মাসেহ করা চলিবে।

২. মোজা এমন শক্ত হওয়া আবশ্যক যাহা পরিধান করিয়া কিছু দূর পথ চলা যায়। সুতরাং চামড়ার মোজা না হইলে মোজার উপর মাসেহ দুরস্ত নহে।

৩. পায়ের টাখনুর উপর পর্যন্ত যতটুকু ওযূর মধ্যে ধৌত করা ফরয, সেই পর্যন্ত মোজার কোন স্থানে ছেড়াফাঁটা না হওয়া এবং সেই পর্যন্ত স্থান মোজা দ্বারা আবৃত থাকা। এই পরিমাণ স্থানে মোজার ছিদ্র থাকার কারণে পায়ের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হইলে হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে এইরূপ মোজার উপর মাসেহ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু হযরত ইমাম মালিক (র)-এর মতে মোজা ছেঁড়া হইলেও ইহা পরিয়া যদি হাঁটা যাইতে পারে, তবে উহার উপর মাসেহ করা দুরস্ত আছে এবং পূর্বে হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-র এই মতই পোষণ করিতেন। আমাদের মতে হযরত ইমাম মালিক (র) -এর মতই উৎকৃষ্টতর। কারণ, পথ চলিতে চলিতে অনেক সময় মোজা ফাটিয়া যায় এবং প্রত্যেকবার উহা সেলাই করিয়া লওয়া সম্ভব হয় না। [ক]

৪. মোজা পরিয়া উহার উপর মাসেহ করিলে মোজা খুলিবে না এবং খুলিয়া ফেলিলে আবার নূতনভাবে উযূ করিয়া পুনরায় মোজা পরাই উত্তম। মোজার উপর মাসেহ করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোজা খুলিলে শুধু দুই পা ধুইয়া লইলেই চলিবে।

৫. পায়ের গোছার উপর মাসেহ করিবে না; বরং পায়ের সম্মুখস্থ ভাগে মাসেহ করিবে। পায়ের পাতার উপরিভাগ মাসেহ করাই উত্তম। এক আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করিলেই যথেষ্ট।[খ] কিন্তু তিন আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করাই উত্তম। একবারের অধিক মাসেহ করিবে না। সফরে বাহির হইবার পূর্বে মোজার উপর মাসেহ করিয়া থাকিলে একদিন একরাত্রির অধিককাল পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করিবে না।[গ]

ক. হানাফী মাযহাবমতে মোজা তিন আঙ্গুল পরিমাণ ফাটা হইলে ইহার উপর মাসেহ করা দুরস্ত নহে।

খ. মানাফী মাযহাবমতে তিন আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করা ফরয। এক বা দুই আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করা দুরস্ত নহে।

মোজা পরিধান করিবার সময় উহা উল্টাইয়া ঝাড়িয়া লইয়া পায়ে দেওয়া সুন্নত। কারণ, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একখানা মোজা পরিধান করিতেই অপর মোজাখানি একটি কাক আসিয়া ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল এবং শূন্যে উঠিয়া মোজাখানি ছাড়িয়া দেওয়ামাত্র উহা হইতে একটি সাপ বাহির হইয়া আসিল। তখন হুযূর (স) বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহাকে বলিয়া দাও, মোজা ঝাড়িয়া না ফেলা পর্যন্ত যেন কেহ উহা পরিধান না করে।

দ্বিতীয় সহজ বিধান ঃ তায়াম্মুম। এই গ্রন্থের ইবাদত খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে উযূর বিবরণ প্রসঙ্গে ইহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় পুনরুল্লেখ করা হইল না।

তৃতীয় সহজ বিধান ঃ সফরে চারি রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে কসর (সংক্ষেপ) করিয়া দুই রাকা'আত পড়া। কিন্তু ইহার চারিটি শর্ত আছে।

প্রথম শর্ত ঃ নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া। কাযা পড়িবে কসর পড়িবে না (হানাফী মাযহাবমতে সফরকালীন কসর নামাযের কাযা গৃহে ফিরিয়া আদায় করিলেও কসরই পড়িতে হইবে। অনুরূপভাবে গৃহে থাকাকালীন চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের কাযা সফরে যাইয়া আদায় করিলেও চারি রাকা'আতই পড়িতে হইবে)।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ কসর পড়ার নিয়্যত করিবে। পূরা নামাযের নিয়্যত করিলে অথবা পূরা নামাযের নিয়্যত করা হইল না কসরের নিয়্যত করাই হইল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে পূরা নামায আদায় করিতে হইবে।

তৃতীয় শর্ত ঃ যে ব্যক্তি পূরা নামায পড়িবে তাহার ইকতিদা করিবে না (হানাফী মাযহাবমতে মুসাফির মুকীমের ইকতিদা করিতে পারে এবং মুকীম ব্যক্তি ইমাম হইলে মুসাফির মুকতাদিগকেও পূরা নামাযই পড়িতে হইবে। কিন্তু ইকতিদা করিলে অবশ্যই পূরা নামায পড়িতে হইবে, এমনকি যদি এই ধারণা হয় যে, ইমাম মুকীম ও তিনি নামায পড়াইবেন তবে মুকতাদি সন্দেহে রহিল! এমতাবস্থায় তাহাকে পুরা নামাযই পড়িতে হইবে। কারণ, মুসাফির চিনা দুষ্কর। কিন্তু মুকীম ইমামকে মুসাফির বলিয়া সন্দেহ করত ঃ এই ধারণা করিলে যে, তিনি কসর পড়িবেন এবং পরে তিনি কসর না পড়েন, তবে এইরূপ সন্দেহকারী মুসাফিরের জন্য কসর পড়া দুরস্ত আছে। কেননা, নিয়্যত গুপ্ত বিষয় এবং ইহা অবগত হওয়া শর্তরূপে নির্ধারিত হইতে পারে না।

গ. হানাফী মাযহাবমতে, কোন ব্যক্তি যদি মুকীম অবস্থায় মাসেহ আরম্ভ করিয়া থাকে এবং একরাত ও একদিন অতিবাহিত না হইতেই সে মুসাফির হইয়া যায়, তবে সে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মাসেহ করিবে। কিন্তু যদি মুসাফির হইবার পূর্বেই একরাত্র একদিন অতিবাহিত হইয়া যায় তবে তাহার মুদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া পুনরায় পা ধৌত করিয়া মোজা পরিবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ দূরের পথে এবং শরীয়ত অনুসারে জায়েয সফর হওয়া আবশ্যক। সুতরাং পলাতক দাস-দাসীর সফর, ডাকাতি করিবার জন্য সফর, হারাম আমদানির জন্য সফর এবং মাতাপিতার বিনা অনুমতিতে সফর করা হারাম। এই সকল হারাম সফরে উপরিউক্ত সহজ বিধানসমূহ ভোগ দুরস্ত নহে। অনুরূপভাবে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধের ভয়ে মহাজন হইতে আত্ম-গোপনের উদ্দেশ্যে সফর করাও হারাম। মোটকথা, যে কার্য হারাম, তজ্জন্য সফর করাও হারাম।

ষোল ফরসখের পথকে দূরের পথ বলা হয়। তদপেক্ষা কম পথে কসর দুরস্ত নহে। প্রতি বার হাযার কদমে এক ফরসখ হয় (হানাফী মাযহাবমতে ন্যূনপক্ষে ৪৮ মাইলের পথ হইল কসর দুরস্ত)। শহরের জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে স্বীয় এলাকা অতিক্রম করিলেই সফর আরম্ভ হয়। জনবসতির পরে উহার চারিপার্শ্বে যে, স্বীয় এলাকা অতিক্রম করিলেই সফর আরম্ভ হয়। সমস্ত শস্যক্ষেত্র কিংবা বাগান থাকে, তাহা বস্তির মধ্যে গন্য নহে। সফরকালে কোন বস্তিতে প্রবেশ ও বহির্গত হওয়ার দিন ব্যতীত ৩ দিন (হানাফী মতে ১৫ দিন) বা ততোধিক দিন অবস্থানের নিয়্যত করিলে সফর শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তদপেক্ষা কম সময় অবস্থানের নিয়্যত করিয়া যদি কোন কার্য উপলক্ষে বিলম্ব হইয়া যায় এবং সেই কার্য কোন্ দিন সম্পন্ন হইবে ইহার নিশ্চয়তা না থাকে, প্রত্যেকদিনই আশা করা যায়- অদ্য সম্পন্ন হইবে এবং এইরূপ ৩ দিনের অধিককাল গত হইয়া যায়, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি মুসাফির বলিয়াই গণ্য হইবে এবং তাহাকে কসর পড়িতে হইবে। কারণ, সে নিয়্যত করিয়া সে স্থানে অবস্থান করে নাই এবং এতদিন অবস্থানের উচ্ছাও করে নাই।

চতুর্থ সহজ বিধান ঃ দুই ওয়াক্তের ফরয নামায একই সময়ে পড়িবার অনুমতি। দূরের পথে এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বৈধ সফরে জুহরের নামাযে বিলম্ব করিয়া আসরের নামাযের সহিত অথবা আসরের নামাযকে আগাইয়া আনিয়া জুহরের নামাযের সহিত পড়া দুরস্ত আছে (হানাফী মায্হাবমতে কেবল হজ্জের সফরেই ইহা দুরস্ত)। মাগরিব ও ইশার নামাযের জন্যও এই একই বিধান। আসর ও জুহরের নামায একত্রে পড়িতে হইলে প্রথমে জুহরের নামায পড়িয়া তৎপর আসরের নামায পড়িবে। সুন্নত নামাযগুলিও পড়িয়া লওয়া উত্তম যেন উহার ফযীলত হইতে বঞ্চিত হইতে না হয়। কেননা, উহা হইতে বঞ্চিত থাকিলে সফরের মঙ্গল লাভ হইবে না। প্রয়োজনবোধে ইচ্ছা করিলে সুন্নত নামায বাহনের উপর কিংবা চলিতে চলিতেও পড়া যায়। সুন্নত নামাযসমূহ জুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়িলে প্রথম জুহরের পূর্ববর্তী চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে, তৎপর আসরের ফরযের পূর্ববর্তী চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে। তৎপর আযান ও ইকামত দিয়া জুহরের ফরয নামায পড়িবে এবং তৎপর ইকামত বলিয়া আসরের নামাযের ফরয পড়িবে। তায়াম্মুম করিয়া

নামায পড়িয়া থাকিলে জুহরের ফরয নামায পড়িবার পর আবার নূতন করিয়া তায়াম্মুম করিবে। উভয় নামাযের মধ্যে তায়াম্মুম ও ইকামত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক সময় বিলম্ব করিবে না। অতঃপর জুহরের ফরযের পরবর্তী দুই রাক'আত সুন্নত এই আসরের ফরয নামাযের পরে পড়িবে। জুহরের নামাযকে বিলম্ব করিয়া আসরের নামাযের সহিত একত্রে পড়িলে এই নিয়মে পড়িতে হইবে। সফরকালে এই নিয়মে আসরের নামায পড়িয়া সূর্যাস্তের পূর্বে স্বীয় বস্তিতে প্রবেশ করিলেও আসরের নামায পুনরায় পড়িতে হইবে না। মাগরিব ও ইশার নামাযেরও এই একই বিধান। এক উক্তি অনুসারে ছোট সফরেও দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া যায়।

পঞ্চম সহজ বিধান ঃ কেবল সুন্নত নামায বাহন পশুর পৃষ্ঠের উপর বসিয়া আদায় করা দুরস্ত আছে এবং কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব নহে; বরং পশু যে দিকে মুখ করিয়া পথ চলে সে দিকেই কিবলা। কিন্তু যে দিকে কিবলা নহে, সেদিকে পশুকে ইচ্ছাপূর্বক ফিরাইলে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। ভুলক্রমে অন্যদিকে ফিরাইলে কিংবা চরিতে চরিতে পশু অন্যদিকে মুখ ফিরাইলে আরোহির নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না। বাহনের উপর নামায পড়িবার সময় রুকু-সিকদা ইশারায় সমাধা করিবে। রুকুর জন্য পিঠ কম ঝুঁকাইবে এবং সিজদার জন্য তদপেক্ষা কিছু অধিক ঝুঁকাইবে। যতটুকু ঝুঁকিলে বাহনের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাওয়ার আশংকা হয় ততটুকু ঝুকা আবশ্যক নহে। বাহন-পশুর পৃষ্ঠে শুইবার স্থান করিয়া লইয়া থাকিলে এবং তথায় বসিয়া নামায পড়িলে, রুকু-সিজদা পুরাপুরি আদায় করিবে।

ষষ্ঠ সহজ বিধান ঃ সুন্নত নামায পদব্রজে চলন্ত অবস্থায় পড়িবার অনুমতি। ইহার নিয়ম এই যে, প্রথম তকবীরের সময় কিবলামুখী হইবে (তৎপর গন্তব্য পথের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে পড়িতে পথ চলিবে)। হাঁটিয়া চলার সময় কিবলামুখী হইয়া নামায আরম্ভ করা তাহার পক্ষে কঠিন নহে। অপরপক্ষে নামায আরম্ভ করিবার সময় বাহন পশুকে বিকলামুখী করিয়া রাখা কঠিন। হাঁটা অবস্থায় নামায পড়িতে রুকু-সিজদা ইশারায় সমাধা করিবে এবং চলিতে চলিতে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়িবে। কিন্তু সতর্ক থাকিবে যেন পা অপবিত্র পদার্থের অপর পতিত না হয়। তবে চলিবার পথ অপবিত্রতাপূর্ণ হইলে সে পথ হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অন্য কোন দুর্গম পথ অবলম্বন করা তাহার প্রতি ওয়াজিব নহে। প্রাণভয়ে শত্রু হইতে পলায়মান ব্যক্তি, রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত ব্যক্তি এবং বন্যার প্রখর স্রোত ও ব্যঘ্রাদি হিংস্রজন্তু হইতে পলায়মান ব্যক্তি হাঁটিয়া পথ চলিতে চলিতে কিংবা বাহনের উপর থাকিয়া ফরয নামাযও সেই নিয়মে পড়িতে পারে যাহা সুন্নত নামায সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার কাযা আদায় করা ওয়াজিব হইবে না।

সপ্তম সহজ বিধান ঃ সফরে রোযা না রাখার অনুমতি। মুসাফির রোযার নিয়্যত করিয়া থাকিলেও রোযা ভঙ্গ করিতে পারে। কিন্তু সুবহি সাদিকের পর সফরে বাহির হইলে সে দিনের রোযা ভঙ্গ করা দুরস্ত নহে। মুসাফির রোযা ভঙ্গ করিয়া কোন শহরে প্রবেশ করিলে সেই দিনে পানাহার করা তাহার জন্য দুরস্ত আছে। কিন্তু রোযা ভঙ্গ না করিয়া কোন শহরে প্রবেশ করিয়া থাকিলে সেই দিন রোযা ভঙ্গ করা দুরস্ত নহে। সফরে পূরা নামায পড়া অপেক্ষা কসর করা উত্তম; তাহাতে মতভেদের সন্দেহে পড়িতে হয় না। কারণ, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে মুসাফির অবস্থায় পূরা নামায পড়া দুরস্ত নহে। কিন্তু সফরে রোযা ভঙ্গ করা অপেক্ষা রোযা রাখাই উত্তম। ইহাতে রোযা কাযা আদায়ের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু সফরে ক্লান্তিবশতঃ রোযা রাখিবার ক্ষমতা না থাকিলে রোযা ভঙ্গ করাই উত্তম।

উল্লিখিত সাতটি সহজ বিধানের মধ্যে (১) কসর নামায পড়া, (২) রোযা ভঙ্গ করাও তিনদিন তিনরাত্রি মোজার উপর মাসেহ্ করা একমাত্র লম্বা সফরের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর (১) বাহন পশুর পিঠে ও পদব্রজে চলন্ত অবস্থায় সুন্নত নামায পড়া ; (২) জুমু'আর নামায না পড়া এবং (৩) পানির অভাবে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া পরে পানি পাওয়া গেলেও যাহার কাযা আদায় করিতে হয় না, এই তিনটি ছোট সফরেও দুরস্ত আছে। কিন্তু দুই ওয়াক্তের ফরয নামায একত্রে পড়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে স্পষ্ট কথা এই সে, ছোট সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়াই উচিত। প্রয়োজনমত সময়ে মাস'আলা জানিয়া লওয়ার মত আলিম সঙ্গে না থাকিলে সফরে বাহির হইবার পূর্বে প্রয়োজনীয় সকল মাস'আলা শিখিয়া লওয়া মুসাফিরের অবশ্য কর্তব্য। পথিমধ্যে যদি এমন কোন গ্রাম না পড়ে যেখানে মসজিদ এবং মিহরাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিবলা নির্ণয় করা যাইতে পারে তবে সফরে যাত্রা করিবার পূর্বে কিবলা পরিচয় ও নামাযের ওয়াক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন করা মুসাফিরের অবশ্য কর্তব্য। মুসাফিরের এতটুকু জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, জুহরের নামাযের সময় কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলে সূর্য কোথায় থাকে এবং উদয় ও অস্তের সময় কোন্ দিকে থাকে; আর ধ্রুব নক্ষত্র কোন্ দিকে পড়ে; রাস্তায় কোন পাহাড় থাকিলে উহা কিবলার ডানদিকে পড়ে, না বামদিকে পড়ে। এই পরিমাণ জ্ঞানার্জন করিয়া ভ্রমণে বাহির হওয়া প্রত্যেক মুসাফিরের কর্তব্য।

অষ্টম অধ্যায়

সমা' ১

সমা'জনিত মূর্ছার নিয়ম ও সমা'র বিধান

ইন-শাআল্লাহ্, সমা' সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিব।

(১) সমা' (سماع) আরবী শব্দ। ইহার অর্থ শ্রবণ করা। ইহা সঙ্গীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধুনা প্রচলিত 'কাওয়ালী', নৃত্য-গীত, বাদ্যানুষ্ঠান, ও ক্রীড়া-কৌতুকের সহিত এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমা'-এর কোনই সম্পর্ক নাই। এই অনুচ্ছেদের শেষাংশ ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পাঠে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। অধুনা প্রচলিত 'কাওয়ালী,' নৃত্য-গীত, বাদ্যানুষ্ঠানাদি যে শরীয়তমতে হারাম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাঠকগণ হযরত ইমাম গায্যালী (র)-এর বর্ণনা হইতে মনগড়া ভুল অর্থ গ্রহণ করিয়া মূর্খ ও ভণ্ড ফকীরদের ন্যায় নর্তন-কূর্দন গীত-বাদ্যাদিকে জায়েয বলিয়া নিজেদের ঈমান নষ্ট করিবেন না।

প্রথম অনুচ্ছেদ

কোন্ প্রকারের সমা' বৈধ ও কোন্ প্রকার অবৈধ ঃ এই কথাটি উত্তমরূপে উপলব্ধি কর এবং এই অবস্থাটি ভালরূপে বুঝিয়া লও যে, লৌহ ও প্রস্তরের মধ্যে যেমন অগ্নি নিহিত রহিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব হৃদয়েও তদ্রূপ একটি গূঢ় ভাব গুপ্ত রাখিয়াছেন। লৌহ দ্বারা প্রস্তরের উপর আঘাত করিলে যেমন সেই অগ্নি বাহির হইয়া পড়ে এবং বন-জঙ্গলে লাগিয়া যায়, তদ্রূপ মধুর এবং ছন্দযুক্ত সুর শ্রবণেও মানব হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠে এবং স্বতঃই হৃদয়ে এক গূঢ় ভাবের উৎপত্তি হয়। এই ভাব প্রতিরোধে মানুষের কোন ক্ষমতা নাই।

আলমে আরওয়াহ নামে পরিচিত আধ্যাত্মিক জগতের সহিত মানব আত্মার যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তজ্জন্যই হৃদয়ে আলোড়ন ও সেই ভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জগত সকল শোভা ও সৌন্দর্যের জগত এবং সাদৃশ্যই সকল শোভা ও সৌন্দর্যের উৎস। আর এই জগতের সাদৃশ্যমান বস্তু সেই আধ্যাত্মিক জগতেরই কোন সৌন্দর্যের বিকাশ বটে এবং এই জড় জগতে যে সকল শোভা ও সৌন্দর্য রহিয়াছে উহা

সেই আধ্যাত্মিক জগতের শোভা ও সৌন্দর্যেরই ফল। সুতরাং ইহজগতের ছন্দযুক্ত সুমধুর সুরও সেই আধ্যাত্মিক জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যাবলীর সহিত সাদৃশ্য রাখে। এই জন্যই সুমধুর তান মানব -হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং এক প্রকার আলোড়ন ও উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলে। ইহা যে কি তাহা সম্ভবত মানুষ স্বয়ং উপলব্ধিও করিতে পারে না। যে অন্তর সর্বপ্রকার ভাবাবিল্য হইতে মুক্ত, তাহাতেই এই আলোড়ন ও উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে অন্তর মুক্ত নহে; বরং কোন কিছুর সহিত আসক্ত রহিয়াছে সেই অন্তর যে বস্তুর প্রতি আসক্ত, কোন সুমধুর তান শ্রবণে সেই বস্তুটি তাহার অন্তরে এমনভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠে যেমন অগ্নিতে ফুৎকার দিলে অগ্নি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠে। অতএব যে হৃদয়ে আল্লাহর প্রেমানল বিদ্যমান রহিয়াছে উহাকে আরও প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য সমা' আবশ্যক। অপর পক্ষে যে হৃদয়ে কোন প্রকার কদর্য আসক্তি রহিয়াছে তাহার জন্য সমা' হারাম এবং প্রাণ সংহারক বিষসদৃশ।

সমা' মুবাহ্ না হারাম ঃ সমা' মুবাহ্, না হারাম, এ সম্বন্ধে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যে আলিম হারাম বলিয়াছেন তিনি কেবল সমা'র বাহিরের দিকটাই বিচার করিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা মানব হৃদয়ে সমাবেশ হইতে পারে, ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন না। এই শ্রেণীর বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন আলিম বলিয়া থাকেন, মানুষ কেবল নিজের স্বজাতিকেই ভালবাসিতে পারে। যে বস্তু তাহার স্বজাতীয় নহে এবং যাহার সহিত কোন কিছুরই সাদৃশ্য নাই, তাহাকে মানুষ কিরূপে ভালবাসিতে পারে ? অতএব এইরূপ আলিমের মতে সৃষ্ট পদার্থের ভালবাসা ব্যতীত মানুষের অন্তরে অপর কোন বস্তুর ভালবাসা স্থান পাওয়া সম্ভব নহে। যদি কোন মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভালবাসা স্থানলাভ করিয়া থাকে তবে উক্ত আলিম উহাকে কাল্পনিক ও কোন সাদৃশ্য বস্তুর প্রেম কল্পনায় বাতিল বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন সমা' নিছক আমোদ-প্রমোদ অথবা সৃষ্ট পদার্থের প্রতি আসক্তি হইতে উদ্ভুত। এই উভয়টিই ধর্মমতে মন্দ ও নিন্দনীয়। "আল্লাহ্কে ভালবাসা মানুষের প্রতি ওয়াজিব" এই কথার অর্থ এই শ্রেণীর আলিমকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তরে বলেন, "ইহার অর্থ, আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধসমূহ মানিয়া চলা ও তাঁহার ইবাদত করা।" এই শ্রেণীর আলিমগণ এ স্থলে বড় ভুল করিয়াছেন। অত্র গ্রন্থের 'পরিত্রাণ খণ্ডে' 'মহব্বত' অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হইবে। এখানে আমার বক্তব্য এই যে; সমা' শ্রবণ — সম্বন্ধে নিজের অন্তরের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কারণ, যে বস্তু হৃদয়ে আদৌ নাই, সম' তাহা জন্মাইয়া দিতে পারে না; বরং যাহা অন্তরে বিদ্যমান আছে সমা' শুধু উহাকেই আলোড়িত করে। যাহার অন্তরে এমন ভাব বিদ্যমান যাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এবং যাহাকে শক্তিশালী

করিয়া তোলাও বাঞ্ছনীয়, যদি সমা' শ্রবণে উহা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে তবে শ্রবণকারী সওয়াব পাইবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তির অন্তরে এমন ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও মন্দ, সমা' শ্রবণ করিলে সে শাস্তির উপযোগী হইবে। আবার যে ব্যক্তির অন্তর এই উভয়বিধ ভাব হইতে মুক্ত, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় সমা' শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করে, তাহার জন্য সমা' মুবাহ্। অতএব, অবস্থা-ভেদে সমা' তিন প্রকার।

প্রথম প্রকারঃ অসাবধান গাফিলদের ন্যায় লোকে বিবেচনাশূন্যতা ও অসতর্কতাবশতঃ খেল-তামাশা স্বরূপ সমা' শ্রবণ করিয়া থাকে। যেহেতু গোটা দুনিয়াই একটা বিচিত্র খেলা ও তামাশা, সুতরাং এই শ্রেণীর লোকের জন্য সমা'ও এই ধরনের তামাশারই অন্তর্ভুক্ত। সমা' আনন্দদায়ক এবং ভাল লাগে বলিয়াই হারাম, এইরূপ উক্তি করা সঙ্গত নহে। কারণ, সব আনন্দ হারাম নহে। আনন্দদায়ক বস্তুর মধ্যে যাহা হারাম তাহা আনন্দদায়ক ও ভাল লাগে বলিয়াই হারাম নহে; বরং ইহাতে যে অনিষ্টকারিতা ও ফিতনা-ফাসাদের কারণ রহিয়াছে তজ্জন্যই উহা হারাম হইয়াছে। পাখির সুমিষ্ট সুর আনন্দদায়ক ও চিত্তকর্ষক। অথচ ইহা হারাম নহে। সবুজ প্রান্তরে, প্রবাহিত স্রোতস্বিণীর কিনারে প্রস্ফটিত পুষ্প ও অফুটন্ত পুষ্প কলিকাময় উদ্যানে ভ্রমণ, এই সমস্তই আনন্দদায়ক এবং ভাল লাগে; কিন্তু এই ভ্রমণ হারাম নহে। কর্ণের জন্য সুমধুর তান ঠিক তেমনই আনন্দদায়ক যেমন চক্ষুর জন্য সবুজ বর্ণের বিচিত্র বৃক্ষলতা পরিশোভিত প্রান্তর ও স্রোতস্বিণীর চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আনন্দদায়ক এবং নাসিকার জন্য কস্তুরীর ঘ্রাণ আরামদায়ক; রসনার জন্য উপদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য তৃপ্তিকর এবং বুদ্ধির নিকট সূক্ষ্ম জ্ঞানচর্চা আনন্দদায়ক, এইরূপে চক্ষু, নাসিকা, রসনা ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকেই যথাক্রমে মনোরম দৃশ্য, সুগন্ধি প্রভৃতি হইতে এক-এক প্রকারের স্বাদ লাভ করিয়া থাকে। তবে সমা'র সুমধুর তান শ্রবণের আনন্দ উপভোগ করা কর্ণের পক্ষে কেন হারাম হইবে ? সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ লওয়া, সবুজ প্রান্তরের মনোরম শোভা দর্শন ইত্যাদি তো হারাম নহে।

উহার প্রমাণ এই, হযরত আয়েশা (রা) আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা ঈদের দিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হাবশী বালকগণ মসজিদে ক্রীড়া করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি উহা দেখিতে চাও ? (তখন হযরত আয়েশা (রা) অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন)। আমি বলিলাম ঃ হ্যাঁ, দেখিতে চাই। তিনি দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের পবিত্র বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন। আমি তাঁহার বাহুর উপর আমার চিবুক স্থাপন পূর্বক ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। আমি এইরূপ দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া তাহা দর্শনপূর্বক আমোদ-উপভোগ করিলাম যে, তিনি কয়েকবার আমাকে

বলিলেন ঃ যথেষ্ট হয় নাই কি ? আমি উত্তর করিলাম ঃ না । পূর্বেও এই হাদীসখানা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হাদীস হইতে দেখা যায়;

ক. নির্দোষ ক্রীড়া সর্বদা না হইয়া কখন কখন হইলে তাহা দর্শন ও উপভোগ করা হারাম নহে। আর হাবশীদের উক্ত ক্রীড়া ছিল (প্যারেড) নৃত্য ও বীরত্বগাথা সমা'।

খ. উক্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও সমা' মসজিদে হইয়াছিল।

গ. যে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে ক্রীড়াস্থলের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন তখন তিনি হাবশী বালকদিগকে ক্রীড়া করিতে বলিয়াছিলেন। উহা হারাম হইলে তিনি এরূপ বলিতেন না।[১]

ঘ. হুযুর (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ তুমি কি উহা (ক্রীড়া) দেখিতে চাও ? এই জাতীয় কথাকে (تقاضا) উৎসাহ প্রদান বলে। ঘটনা এমন ছিল যে, হযরত আশেয়া (রা) নিজেই ক্রীড়া দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং হুযূর (সা) নীরব ছিলেন। তাহা হইলে কেহ হয়ত বলিতে পারিত, হুযূর হযরত আয়েশা (রা)-কে মনঃকষ্ট প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কারণ, কষ্ট প্রদান করা মন্দ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. এই ঘটনার সময় পরপুরুষ ও পর-নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবৈধ ছিল না।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ-

"আপনি ঈমানদার নারীদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে।" এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পরপুরুষের ক্রীড়া-কৌতুক দর্শন তো দূরের কথা, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও হারাম হইয়া পড়িয়াছে।

এতদ্ব্যতীত হযরত ইমাম গায্যালী (র) কোন কোন নির্দোষ ক্রীড়া-কৌতুকের বৈধতার প্রমাণ দিতে যাইয়া যে হাদীসখানার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে যেন কোন পাঠক এই ধোঁকায় পতিত না হন যে, অধুনা প্রচলিত যৌন আবেদনপূর্ণ যাবতীয় ক্রীড়া-কৌতুক, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান বৈধ হইবে। উক্ত হাদীসে যে ক্রীড়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে উহার অর্থ যুদ্ধপ্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং প্যারেড অনুষ্ঠান। হাদীসের ব্যাখ্যায় যে সমা'র বিষয় হযরত ইমাম গায্যালী (র) উল্লেখ করিয়াছেন উহা বর্তমানের অশ্লীল ও কুপ্রবৃত্তি জাগরণকারী নৃত্য ও সমা' নহে। উহা ছিল তখনকার দিনের যোদ্ধাদিগকে সমরোত্তেজনা প্রদানের নিমিত্তে প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'জঙ্গে বুআসে' পঠিত উত্তেজনামূলক বীরত্বপূর্ণ কবিতা। কুরআনের যুদ্ধাগ্নি 'আউস' এবং 'খাজরায' গোত্রে একাধারে একশত বিশ বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত ছিল। এই যুদ্ধে আরবের বহু বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কাহিনী কবিতাকারে পুনারাবৃত্তি করিয়া সেনাবাহিনীকে সমরোন্মাদনা প্রদান করা হইত যেন তাহারা সদর্পে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং ইহাতে এতদ্দেশ্যের অনুশীলণ নাচ-গান-বাদ্যের বৈধতার প্রশ্ন মোটেই উঠে না; বরং হানাফী মাযহাব ও অন্য সকল ইমামের সর্ববাদীসম্মত মতে অশ্লীল নৃত্য-গীত, ক্রীড়া-কৌতুক ও বাদ্যানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হারাম। (আইনী শরহে বুখারী দ্রষ্টব্য)

ঙ. স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সহিত অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলেন যদিও তামামা দেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোক ও বালকদের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের নির্দোষ আনন্দ ও আমোদের কার্যে তাহাদের আনুকূল্য করা সৎস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মনিগ্রহ ও ধার্মিকতা প্রদর্শন অপেক্ষা উহা উৎকৃষ্ট।

সহীহ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি যখন ছোট বালিকা ছিলাম তখন বালিকাসুলভ স্বভাববশতঃ কাপড় দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ খেলনা বানাইতাম এবং আরও কতিপয় বালিকা (আমার সহিত যোগদানের নিমিত্তে) আসিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করিলে অন্যান্য বালিকা পলায়ন করিত। হুযূর (সা) আবার তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। একদা তিনি একটি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এই খেলনাগুলি কি ? বালিকাটি নিবেদন করিল ঃ এইগুলি আমার কন্যা। হুযূর (সা) আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ উহাদের মধ্যস্থলে ওটা কি বাঁধা রহিয়াছে ? সে নিবেদন করিল ঃ এইটি এই (পুরুষ) খেলনাগুলির ঘোড়া। হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ঘোড়ার (পিঠের) উপর ওটা কি ? সে উত্তর করিল ঃ উহা ঘোড়ার পাখা। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ঘোড়ার পাখা কোথা হইতে আসিল ? সে উত্তর করিল ঃ আপনি কি শোনেন নাই যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর ঘোড়ার পাখা ছিল? ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, ইহাতে তাঁহার সমুদয় দন্তপাটি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

উপরিউক্ত হাদীস এস্থলে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা হইতে বুঝা যাইবে, পরহিযগারী প্রদর্শন ও নীরসভাব ধারণ করা এবং উল্লেখিত কার্য হইতে নিজকে দূরে সরাইয়া রাখা ধর্ম-কর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। বিশেষতঃ সরলমতি বালক-বালিকা ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাদের উপযোগী যে সকল নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের আনুকূল্য করা যেন অশোভন বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়। অবশ্য এই হাদীস দ্বারা ছবি প্রস্তুত করা দুরস্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ, বালক-বালিকাদের খেলনা কাষ্ঠ ও ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং পূর্ণ আকৃতি ইহাতে প্রস্তুত হইতে পারে না। কেননা, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখ আছে যে, উক্ত ঘোড়াটির কেশর ছিল ছিন্ন বস্ত্রে প্রস্তুত।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ ঈদের দিন দুইটি বালিকা দফ বাজাইয়া আমার নিকট সমা' আবৃত্তি করিতেছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহে আগমন করিলেন এবং অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কাপড় মোড়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে হযরত আবূবকর (রা) আগমন করিলেন এবং সেই বালিকাদ্বয়কে ধমক দিয়া বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর গৃহে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র! ইহা শুনিয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে আবূবকর! তাহাদিগকে বাধা দিও না; কেননা আজ ঈদের দিন। এই হাদীস হইতে বুঝা যায়, দফ বাজাইয়া সমা' আবৃত্তি মুবাহ্ (বৈধ)। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আওয়াজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ণ মুবারকে পৌছিতে ছিল। তাঁহার শ্রবণ এবং হযরত আবূবকর (রা)-কে বাধা প্রদান করিতে নিষেধ করা হইতে বুঝা যায় যে, দফ বাজান ও সমা' আবৃত্তি করা মুবাহ্ (বৈধ)।[১]

দ্বিতীয় প্রকার ঃ হারাম সমা'। হৃদয়ে কোন মন্দভাব থাকিলে, যেমন, কাহারও হৃদয়ে কোন কুলটা রমণী কিংবা কোন ছোক্‌রার প্রতি আসক্তি রহিয়াছে, উক্ত রমণী কিংবা ছোক্‌রাকে সম্মুখে রাখিয়া মিলন-স্বাদ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সমা'র সুমধুর সুর শ্রবণে মত্ত হওয়া; অথবা সেই রমণী বা ছোক্‌রার অনুপস্থিতিতে তাহার সহিত মিলনের আশায় সমা' শ্রবণে প্রবৃত্ত হওয়া যাহাতে অনুরাগ ও আসক্তি বৃদ্ধি পায়; অথবা আলঙকারিক ভাষায় মন, কৃষ্ণ কেশরাশি, অঙ্গ সৌষ্ঠব ও অপরূপ সৌন্দর্য সংবলিত সমা' শ্রবণে লিপ্ত হইয়া নিজের প্রিয়জন অর্থাৎ সেই কুলটা বা ছোক্‌রার রূপ কল্পনায় বিভোর হওয়া-এই সকল সমা' শ্রবণ করা হারাম। যুবক-দলের অধিকাংশ এই শ্রেণীর আপদে নিপতিত থাকে। এই জাতীয় সমা' এইজন্য হারাম যে, ইহাতে শরীয়ত বিরোধী কুৎসিৎ কামাগ্নি উত্তেজিত হইয়া উঠে। অথচ এই শ্রেণীর কামাগ্নি নির্বাপিত করা ওয়াজিব। সুতরাং ইহাকে উত্তেজিত করিয়া তোলা কিরূপে জায়েয হইবে? কিন্তু নিজের স্ত্রী বা ক্রীতদাসীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সমা' শ্রবণ করা পার্থিব ভোগ-বিলাসের অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত এবং ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করিয়া না ফেলা পর্যন্ত এইরূপ সমা' মুবাহ্। স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ও ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার পর অবশ্যই হারাম হইবে।

---

১. আলিমগণের মতে এই হাদীস দ্বারা সমা' মুবাহ্ (বৈধ) বলিয়া প্রমাণিত হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সহীহ্ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, এই শ্রেণীর সমা' মুবাহ্ নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হযরত আবূবকর (রা)-বালিকাদ্বয়কে সমা' হইতে বাধা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই নয় যে, সমা' মুবাহ্; বরং নিষেধের কারণ এই যে, বালিকাদ্বয় অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিল, তখনও তাহাদের উপর শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বর্তে নাই এবং উহা ছিল ঈদের দিন। যেহেতু ঈদ আনন্দ ও খুশির দিন, এই জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত নাবালেগ বালিকাদ্বয়ের সাময়িক আনন্দে ব্যাঘাত পছন্দ করেন নাই। আর বালিকাদ্বয় পেশাগত গায়িকাও ছিল না যে, কেবল গান গাহিয়াই বেড়াইত। এই কারণেই সহীহ্ মুসলিমের অন্য রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ ليستا بمغنيتين "তাহারা গায়িকা ছিল না।" ইহাতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, উহা কেবল ঈদের দিনে অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিশুসুলভ আমোদ-প্রমোদ ছিল মাত্র। ইহাতে সমা' মুবাহ্ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। আর সমা' বা গান বলিতে আজকাল যাহা বুঝা যায়, উহা তাহা ছিল না; বরং উহা ছিল আনসারগণ কর্তৃক 'জংগ বুআসে' পঠিত বীরত্বসূচক কবিতা।

তৃতীয় প্রকার ঃ সদ্ভাব বর্ধক সমা'। হৃদয়ে কোন সদ্ভাব থাকিলে এই মর্মের সমা' উক্ত সদ্ভাবকে সবল করিয়া তোলে। এই প্রকার সমা' চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী ঃ কা'বা শরীফের মাহাত্ম্য, হজ্জের পথস্থিত প্রান্তর ও জঙ্গলের বিবরণ সংবলিত কবিতা আবৃত্তি, যেমন এইরূপ সমা' শ্রবণে শ্রোতার অন্তরে বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় এবং হৃদয়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যাহার জন্য হজ্জ করা জায়েয তাহার পক্ষে এই জাতীয় সমা' শ্রবণে হজ্জের প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া সওয়াবের কারণ বটে। কিন্তু মাতাপিতা যাহাকে হজ্জে গমনের অনুমতি দেন না অথবা কোন কারণ বশত ঃ হজ্জে যাওয়া যাহার অনুচিত, সমা' শ্রবণ করতঃ তাহার অন্তরে হজ্জের বাসনা দৃঢ় ও মজবুত করিয়া তোল দুরস্ত নহে। কিন্তু যাহার মনে এতটুকু বল আছে যে, সমা' শ্রবণে হজ্জের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিলেও সে উহা দমন করিয়া রাখিতে পারিবে এবং নিজের অবস্থায় স্থির থাকিতে পারিবে তবে তাহার জন্য উহা শ্রবণে বাধা নাই।

ধর্ম যোদ্ধাগণের হৃদয়ে জিহাদের প্রেরণা জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে বীরত্বগাঁথা ও সমা'র বিধানও প্রায় একইরূপ। কারণ, এই শ্রেণীর কবিতাবৃত্তি ও সমা' মানুষকে আল্লাহ্‌র মহব্বতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার এবং তাঁহার ধর্ম রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়া তোলে। ইহাও সওয়াবের কাজ। রণোন্মাদনা বর্ধক ও বীরত্বব্যঞ্জক যে সকল গাঁতা সচরাচর যুদ্ধক্ষেত্রে গাহিয়া সৈন্যদের হৃদয়ে সাহস ও যুদ্ধস্পৃহা বৃদ্ধি করিয়া তোলা হয়, যাহার ফলে জীবনের মায়া পরিত্যাগ করতঃ সৈন্যগণ যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেই যুদ্ধ কাফিরদের বিরুদ্ধে হইয়া থাকিলে বীরত্বব্যঞ্জক কবিতার সাহায্যে এইরূপ সাহসবর্ধনে সওয়াব আছে। কিন্তু মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তদ্রূপ সাহস বর্ধক কবিতা আবৃত্তি হারাম।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ অনুতাপবর্ধক সমা' যে সমা' শ্রবণে শ্রোতার হৃদয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপানুষ্ঠানজনিত অনুতাপের বন্যা প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহ্‌র নিকট উচ্চ মর্যাদা ও তাঁহার সন্তুষ্টিলাভে বঞ্চিত থাকার ক্ষোভে অশ্রু নির্গত হইতে থাকে, এইরূপ সমা' শ্রবণেও সওয়াব হয়। হযরত দাউদ (আ)-এর শোক গাঁথা এই রূপই ছিল। কিন্তু যে সকল বিষয়ে শোক ও বিলাপ করা হারাম, সামা'র মাধ্যমে সেই বিষয়ে সুপ্ত শোক জাগাইয়া তোলাও হারাম। যেমন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যুতে শোক ও বিলাপ করা হারাম। কারণ আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ-

যাহা গত হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য তোমরা শোক করিও না।

আল্লাহ্‌র বিধানে অসন্তুষ্ট হইয়া যদি কেহ শোকাতুর হয় এবং সেই শোক-সন্তাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য শোকগাঁথাপূর্ণ সমা' শ্রবণ করে, তবে তাহাও হারাম। এই জন্যই বিলাপকারীর পারিশ্রমিক হারাম এবং সে মহাপাপী। এমনকি, সেই বিলাপ শ্রবণকারীও পাপী হইবে।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ যে সকল বিষয়ে আনন্দিত হওয়া শরীয়ত অনুসারে জায়েয আছে, এইরূপ কোন আনন্দ হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলে তাহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আনন্দ বর্ধক সমা' শ্রবণ করা বৈধ ও মঙ্গলজনক। যেমন, বিবাহ উৎসব, ওলীমা, আকীকা উৎসবে অথবা সন্তান জন্মের সময়ে, খৎনাকরণে কিংবা বিদেশ হইতে প্রিয়জনের প্রত্যাবর্তনে আনন্দ করা বৈধ। মক্কা শরীফ হইতে হিজরত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনা শরীফে পৌঁছিলেন তখন মদীনাবাসিগণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং দফ বাজাইয়া নিম্নোক্ত কবিতাটি গাহিয়া গাহিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন ঃ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعِ– وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعِ–

বিদায়ের সানিয়া পাহাড়ের পথ বাহিয়া আমাদের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। অতএব যতদিন প্রার্থনাকারী আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিবে ততদিন আমাদের উপর শোকর গুযারী করা ফরয হইয়া পড়িয়াছে।

অনুরূপভাবে ঈদের দিনে আনন্দ করা দুরস্ত এবং তজ্জন্য সমা'ও বৈধ। এইরূপে ধর্মবন্ধুগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে একে অন্যকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আনন্দবর্ধক কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণী ঃ ইহাই আসল সমা'। কাহারও হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রবল হইয়া প্রেমের স্তরে উন্নীত হইলে তাহার জন্য সমা' আবশ্যক এবং কতকগুলি গতানুগতিক নেককার্য অপেক্ষা সম্ভবতঃ ইহাই অধিকতর কার্যকরী হইয়া থাকে। আর যে কার্যে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পায় ইহার মুল্য অবশ্যই অধিক। এইজন্য সুফীগণ সমা' শ্রবণ করিতেন। কিন্তু আজকাল যে সকল লোক বাহিরে সূফীগণের বেশ–ভূষা ধারণ করিয়া থাকে, অথচ অন্তরে সূফীগণের গণাবলী হইতে শূন্য, তাহাদের কারণেই এখন সমা' একটি গতানুগতিক প্রথা হইয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ্‌র প্রেমের আগুন অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য সমা'র প্রভাব অত্যাধিক। সূফীগণের মধ্যে এমন অনেক আছেন, সমা'র মোহে তন্ময় থাকাকালে যাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই অবস্থায় তাঁহারা এমন এক সুখাস্বাদ উপভোগ করিয়া থাকেন যাহা সমা' ব্যতীত লাভ করা যায় না। সমা'র প্রভাবে অদৃশ্য জগতের

যে সকল অবস্থা তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে, উহাকে তাঁহারা অজদ বলিয়া থাকেন। রৌপ্য অগ্নিতে পোড়াইলে উহা যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সমা' শ্রবণে তাঁহাদের হৃদয়ও তদ্রূপ পবিত্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সমা' অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দেয় এবং অন্তরের সকল মলিনতা বিদূরীত করে। অন্তরে দহনশীলতা উৎপত্তি করিয়া ইহার মলিনতা দূরীকরণে সমা' দ্বারা যতখানি সাফল্য অর্জন করা যায় বহু সাধনা দ্বারা উহা লাভ করা যায় না।

আধ্যাত্মিক জগতের সহিত মানবাত্মার যে গোপন সম্পর্ক রহিয়াছে, সমা' সে গোপন সম্পর্কের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং আত্মাকে ইহজগত হইতে একেবারে পরজগতে লইয়া যায়। এমনকি ইহজগতে যাহা সংঘটিত হয়, সূফী তখন ইহার কোন টেরই পান না। এমনও হইয়া থাকে যে, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে লুটিয়া পড়েন। এই প্রকার অবস্থাসমূহের মধ্যে যেগুলি সত্য ও প্রকৃত, উহাদের অতি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা রহিয়াছে। সভাস্থ যে ব্যক্তি এই অবস্থাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে পারে সেও উহার বরকত হইতে বঞ্চিত থাকে না। কিন্তু এ সমস্ত অবস্থার মধ্যে অপ্রকৃতের সংখ্যাই অধিক এবং উহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে ভুল-প্রমাদ অনেক ঘটিয়া তাকে। উহাদের মধ্যে কোনটি সত্য ও কোনটি মিথ্যা পরিপক্ব ও অভিজ্ঞ পীর ব্যতীত কেহই তাহা বুঝিতে পারেন না। মুরীদের সমা' শুনিবার বাসনা মুক্ত না হইলে স্বেচ্ছায় ইহা শ্রবণে লিপ্ত হওয়া তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে।

হযরত শায়খ আবুল কাসেম গুরগানী (রা)-এর অন্যতম মুরীদ আলী হাল্লাজ একদা সমা' শ্রবণের অনুমতি চাহিলে হযরত শায়খ (র) বলিলেন ঃ একাধারে তিনদিন উপবাস কর। তৎপর তোমার জন্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করা হউক। এমতাবস্থায় তুমি যদি সেই খাদ্য-দ্রব্য পরিত্যাগ করতঃ সমা' শ্রবণে লিপ্ত হও তবে তোমার সমা' শ্রবণের বাসনা সত্য এবং ইহা শ্রবণের অধিকার তোমার আছে। কিন্তু যে মুরীদের অন্তরের অবস্থা এখনও উন্মুক্ত হয় নাই এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানই লাভ করে নাই অথবা তাহার অন্তরের অবস্থা তো উন্মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি এখনও সম্পূর্ণরূপে সংযত ও পর্যুদস্ত হয় নাই এমন মুরীদকে সমা' শ্রবণ হইতে নিবৃত্ত রাখা পীরের উপর ওয়াজিব। কারণ, সমা' এমন মুরীদের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই করিবে অধিক।

সূফীগণের সমা', অজ্‌দ (ভাবোম্মত্ততা), ও বিশেষ অবস্থা যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহারা কেবল নিজেদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও দৃষ্টিশক্তির অপরিসরতার দরুনই অবিশ্বাস করিয়া থাকে। এ ব্যাপারে তাহারা ক্ষমার্হ (মা'যূর) এবং দোষহীন। কারণ, তাহারা স্বয়ং যাহা লাভ করে নাই, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাহাদের জন্য নিতান্ত

কঠিন। তাহাদিগকে নপুংসকের সহিত তুলনা করা যায়। স্ত্রী সহবাসে কি আনন্দ, নপুংসক তাহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারে না। কারণ, কাম-শক্তির কারণেই মানুষ এই সুখ উপভোগ করিতে পারে। যেহেতু আল্লাহ্ নপুংসকের কামভাবই সৃষ্টি করেন নাই, সুতরাং স্ত্রী সহবাসের আনন্দ সে কিরূপে উপলব্ধি করিবে ? সবুজ প্রান্তর এবং কল কল নাদে প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর শোভা দর্শন করিলে চক্ষু যে আনন্দ লাভ করে, জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ, আল্লাহ তাহাকে সেই ইন্দ্রিয়ই দান করেন নাই যদ্দ্বারা সে মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শনের আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে। নেতৃত্ব, প্রভুত্ব, রাজত্ব এবং দেশ শাসন কার্যে যে সুখ রহিয়াছে, কোন অবোধ বালক উহা অস্বীকার করিলে তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? কারণ, সে কেবল খেল-তামাশাই বুঝে; রাজ্য শাসনে কি আনন্দ তাহা সে কিরূপে বুঝিবে ? প্রিয় পাঠক ! এতটুকু বুঝিয়া লও যে, বিজ্ঞই হউক, আর অজ্ঞই হউক, যাহারা সুফীগণের অনুপম অবস্থাকে অবিশ্বাস করে, তাহারা শিশুসদৃশ্য কারণ, যে বস্তুর মাহাত্য তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহারা উহার অস্তিত্বই অস্বীকার করিতেছে। যাহার বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি আছে, সে স্বীকার করে এবং বলে ঃ যদিও আমি সূফীগণের অবস্থা হইতে বঞ্চিত ; তথাপি এতটুকু বুঝি যে, সূফীগণের পক্ষে সেই অবস্থা প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। তবুও ভাল যে, সে সেই অবস্থার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সূফীগণের সেই অবস্থা প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া মনে করে। কিন্তু নিজে যাহা লাভ করিতে পারে নাই অপরের জন্যও তাহা লাভ করা অসম্ভব -এইরূপ যে মনে করে, সে নিতান্ত মূর্খ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ–

আর যখন তাহারা সেইদিকে পথ পায় নাই তখন তাহারা বলে, ইহা পুরাতন মিথ্যা।

নির্দোষ সমা' ও হারাম হওয়ার কারণসমূহ ঃ যে সমা' উপরে মুবাহ্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, পাঁচটি কারণে তাহাই হারাম হইয়া পড়ে। সুতরাং এই পাঁচ কারণ হইতে সযত্নে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক।

প্রথম কারণ ঃ রমণী বা শ্মশ্রুবিহীন ছোকরার সমা' শ্রবণ করা। যেহেতু তাহাদের সমা' শ্রবণে কামভাব জাগ্রহ হয়; তাই এই সমা' হারাম। শ্রবণকারীর হৃদয় আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেও ইহা হারাম। কারণ, কামভাব প্রকৃতিগত এবং সুদর্শন চেহারা দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ামাত্রই শয়তান সেই কামভাবকে উস্কানি দিতে থাকিবে তখন কামভাব প্রাধান্য লাভ করিবে এবং সমা' ইহার বশীভূত হইয়া পড়িবে। শ্মশ্রুবিহীন বালক কামভাবের পাত্র নহে, তাহার সমা' শ্রবণ করা মুবাহ্।

রমণী কুৎসিত হইলে সমা' গাহিবার সময় সে দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাহার সমা' -ও শ্রবণ করা জায়েয নহে। কারণ, নারী যেরূপই হউক না কেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। কিন্তু পর্দার অন্তরাল হইতে গাহিলে যদি তাহার সুর শ্রবণ করিয়া অবৈধ প্রণয় ও ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এইরূপ সমা' শ্রবণ করাও হারাম; অন্যথায় মুবাহ্। ইহার প্রমাণ এই যে, হযরত আয়েশা (রা)'র গৃহে দুইজন বালিকা সমা' আবৃত্তি করিয়াছিল এবং তাহাদের আওয়াজ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ণে পৌঁছিয়া থাকিবে।

রমণীদের স্বর শ্রবণ করা এবং শ্মশ্রুবিহীন বালকদের চেহারা দর্শন করা হারাম নহে। অর্থাৎ বালকদের উপর যেমন তাহাদের চেহারা ঢাকিয়া রাখা ফরয নহে এবং তাহাদের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও লোকদের জন্য হারাম নহে, তদ্রূপ নারীদের প্রতি তাহাদের কণ্ঠস্বর বন্ধ রাখা ফরয নহে এবং পরপুরুষদের জন্যও নারীদের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা হারাম নহে। কিন্তু ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকিলে বালকদের প্রতিও কামভাবে দৃষ্টিপাত করা হারাম। তদ্রূপ অবৈধ প্রেম ও ব্যাভিচারের আশঙ্কা থাকিলে নারীদের স্বর পর্দার অন্তরাল হইতে শ্রবণ করাও হারাম। তবে মানুষের অবস্থার তারতম্যানুসারে এই বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কারণ, কেহ কেহ কামভাবের তাড়না হইতে একেবারে নিরাপদ ও ভয়শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন; আবার অনেকেই ভয়শূন্য হইতে পারেন নাই। রোযা রাখিয়া স্বীয় স্ত্রীর মুখ-চুম্বন করার বিধানের সহিত এই বিধানের তুলনা করা যাইতে পারে। কামভাবের তাড়না হইতে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও ভয়শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কেবল তাঁহার জন্যই রোযা রাখিয়া স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করা জায়েয। কিন্তু চুম্বন করিলে কামভাব উত্তেজিত হইয়া সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা যাহার রহিয়াছে অথবা চুম্বনমাত্র শুক্র স্খলনের আশঙ্কা রহিয়াছে, রোযা রাখিয়া স্ত্রীকে চুম্বন করা তাহার জন্য জায়েয নহে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ সমা'র সহিত রুবাব, চঙ্গ, বরবত ও ইরাক দেশীয় রূদ ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রের কোন একটি বাজনা থাকিলে সে সমা' শ্রবণ করা হারাম। কারণ রূদ নামক বাদ্য যন্ত্রের বাজনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার বাজনা সুমধুর ও সুমিল, এই জন্য ইহা নিষিদ্ধ হয় নাই; বরং ইহা শ্রুতিকটু এবং বেমিল করিয়া বাজাইলেও হারাম হইবে। ইহা এইজন্য হারাম যে, শরাবখোর লোকে শরাবপানের মজলিসে এই বাদ্য বাজাইতে অভ্যস্ত। শরাবখোরদের সহিত যে বস্তু বিশেষভাবে সম্বন্ধ রাখে, শরাব হারাম করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুও হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, ইহা শরাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে এবং শরাব পানের স্পৃহা হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দিবে। কিন্তু দফ নামক বাদ্য যন্ত্রের সহিত জলাজুল নামক জুড়ি যন্ত্র থাকিলেও অবৈধ

হইবে না। কারণ, এই সম্বন্ধে কোন বিধান প্রদান করা হয় নাই এবং ইহা রুদসদৃশ নহে; কেননা ইহা শরাবখোরদের নিদর্শন নহে। সুতরাং রুদের সহিত ইহার তুলনা করা যায় না। দফ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে বাজান হইয়াছিল। বিবাহাদি উৎসবে প্রচারের জন্য ইহা বাজাইবার অনুমতি আছে। সুতরাং দফের সহিত জলাজুল জুড়িয়া দিলেও অবৈধ হইবে না। দফ বাজান হাজী ও গাযীদের রীতি হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু নপুংসদের তবলচি বাজান জায়েয নহে।[১] কারণ, ইহা বাজানো তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এই তবলচি লম্বা এবং মাঝখানে সরু ও দুই মাথা কিছু চওড়া, কিন্তু শাহীন যে আকৃতিরই হউক না কেন, হারাম নহে। কারণ, সেকালের রাখালগণ ইহা বাজাইতে অভ্যস্ত ছিল।

হযরত ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ শাহীন নামক বাঁশী বাজানো বৈধ হওয়ার প্রমাণই এই যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাহীন-এর আওয়াজ শুনিতে পাইয়া স্বীয় কর্ণ মুবারকে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া হযরত ইব্‌নে উমর (রা) কে বলিলেন, ইহার আওয়াজ থামিলে আমাকে জানাইবে। হুযূর (সা) হযরত ইব্‌নে উমর (রা)-কে শাহীনের আওয়াজ শুনিতে নিষেধ না করায় ইহাই বুঝা যায় যে, এই শাহীন বাজান মুবাহ্। কিন্তু তিনি নিজে উহার আওয়াজ হইতে স্বীয় কর্ণে অঙ্গুলী স্থাপনের কারণ এই যে, তিনি তখন কোনও উন্নত স্তরের আধ্যাত্মিক অবস্থায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, সেই আওয়াজ তাঁহার অবস্থার ব্যাঘাত ঘটাইবে এবং তাঁহার পবিত্র হৃদয়কে সেই মহান অবস্থা হইতে ফিরাইয়া লইবে। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ধ্যান হইতে সাময়িকভাবে দূরে অবস্থিত, তাহাকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করিতে সমা'র প্রভাব অত্যাধিক। কিন্তু যাহারা উন্নততর আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে বঞ্চিত, কেবল তাহাদের জন্যই ইহা আবশ্যক। আর যে সকল মহাপুরুষ আসল কার্যে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমজ্জিত আছেন, সমা' তাঁহাদের কোন হিত সাধন না করিয়া বরং ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং অনিষ্ট করিতে পারে। এই জন্যই হুযূর (সা) স্বীয় কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে শাহীনের আওয়াজ শ্রবণ হারাম বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ, এমন অনেক মুবাহ্ বিষয় আছে যাহা তিনি করিতেন না। কিন্তু তিনি হযরত ইব্‌নে উমর (রা)-কে ইহার আওয়াজ শ্রবণ করিতে নিষেধ না করাতে প্রমাণিত হয়

১. ধর্ম-কর্মে একেবারে উদাসীন চরিত্রহীন অসৎ পাপী লোকেরাই অধুনা গান-বাদ্যে, নর্তন-কুর্দনে লিপ্ত হয়। সুতরাং এই সকল আল্লাহদ্রোহীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য হওয়ার কারণে বৈধ কাজসমূহ হইতেও বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। অন্যথায় গুমরাহী আরও বৃদ্ধি পাইবে।

২. উপরিউক্ত হাদীস হইতে শাহীন নামক আওয়াজ শ্রবণ মুবাহ্ হওয়ার পক্ষে হযরত ইমাম গাযযালী (র) যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কতিপয় শাফিঈ আলিম ও তাঁহার ব্যক্তিগত সাময়িক মত। অন্যান্য সহীহ হাদীস ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শাহীনের সুর হারাম বলিয়াই হুযূর (সা) স্বীয় কর্ন মুবারকে আঙ্গুলি স্থাপন করিয়াছিলেন।

যে, উহা মুবাহ্ এতদ্ব্যতীত উহা জায়েয হওয়ায় পক্ষে অন্য কোন সরাসরি দলীল নাই।[১]

তৃতীয় কারণ ঃ সমা'র মধ্যে অশ্লীলতা, অপরের দুর্ণাম অথবা ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ থাকিলে উহা শ্রবণ করা হারাম। যেমন, হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) সম্বন্ধে শিয়া সম্প্রদায়ের ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক কবিতা অথবা কোন বিখ্যাত রমনীর প্রশংসাসূচক কবিতা। কারণ, পুরুষের নিকট অপর নারীর গুণাবলী বর্ণনা করা অনুচিত; এই সমস্ত কবিতা পাঠ ও শ্রবণ উভয়ই হারাম। কিন্তু যে কবিতায় আশিকগণের অভ্যাস অনুযায়ী সাধারণভাবে কেশরাশি, আকৃতি ও সৌন্দর্যের প্রশংসা এবং মিলন ও বিচ্ছেদের বর্ণনা থাকে, উহা আবৃত্তি ও শ্রবণ হারাম নহে। কিন্তু এমন কবিতা আবৃত্তি করিলে কোন কুলটা রমণী বা শ্মশ্রুবিহীন বালকের প্রণয়ে আসক্ত ব্যক্তি যদি উহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় প্রেমাষ্পদের কল্পনায় মাতিয়া উঠে, তবে উহা হারাম হইয়া পড়ে। তবে এইরূপ কবিতা শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্ত্রী বা ক্রীতদাসীর কল্পনা হৃদয়ে উদিত হইলে উহা হারাম হইবে না। এই শ্রেণীর কবিতা শ্রবণে সূফী ও আল্লাহ্‌র মহব্বতে লিপ্ত ও নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, প্রত্যেকটি শব্দ হইতে তাঁহারা নিজেদের

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

بُعِثْتُ لِكَسْرِ الْمَزَامِيْرِ

বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَرَامِيْرِ–

নিশ্চয়ই বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশীর বিলোপ সাধন করিবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠাইয়াছেন।

তদ্রূপ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

اِسْتِمَاعُ الْمَلَادِىْ مَعْصِيَّةٌ وَالْجُلُوْسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا مِنَ الْكُفْرِ–

গান-বাদ্য শ্রবণ করা কবিরাহ গুনাহ্ এবং ইহার আসরে যোগদান করা ফাসিকী আর গান-বাদ্য হইতে আনন্দানুভব করা কুফরী কার্য।

মুসনাদে আহমদ এবং আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ اِبْنِ عُمَرَ رض فِى طَرِيْقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ فِى اُذُنَيْهِ– وَتَاى عَنِ الطَّرِيْقِ اِلَى الْجَنْبِ الْاٰخَرِ ثُمَّ قَالَ لِىْ بَعْدَ اَنْ بَعْدَ يَا نَافِعُ! هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لَا– فَرَفَعَ اِصْبَعَيْهِ مِنْ اُذُنَيْهِ– قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فَسَمِعَ صَوْتَ يَوْمَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ– قَالَ نَافِعٌ وَكُنْتُ اِذْ ذَاكَ صَغِيْرًا–

মানসিক অবস্থানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ প্রেয়সীর কেশরাশি দ্বারা 'কুফরের অন্ধকার' এবং মুখমণ্ডলের চাকচিক্য দ্বারা 'ঈমানের নূর' বুঝিয়া থাকেন। আর হয়ত তাঁহারা কেশরাশি দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে উহা বুঝিয়া থাকেন। যেমন কোন কবি বলেন ঃ

তাঁহার কেশগুচ্ছের একটিমাত্র কেশাগ্র ধরিয়া হিসাব করিতে লাগিলাম। আশা এই যে, এইরূপে সমগ্র কেশগুচ্ছের বিস্তারিত বিবরণ পাইতে পারি। আমার মনোভাব বুঝিয়া সে হাস্য করিল, মনোরম ভ্রমর -কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের অগ্রভাগে একটি প্যাঁচ লাগাইয়া দিল এবং আমার সমস্ত হিসাব ভুল করিয়া ফেলিল।

সুফীগণ হয়ত এই কবিতায় কেশগুচ্ছ বলিতে আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথে বাধা-বিঘ্নসমূহ বুঝিয়া থাকেন। কবিতার ব্যাখ্যা তাঁহারা এইরূপ করেন যে, কেহ যদি বুদ্ধির সাহায্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিচিত্র মহিমাবলীর কেশাগ্র পরিমাণও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে এবং তখন যদি সেই উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটুমাত্র জটিলতার উদ্ভব হয় তবে তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। হিসাবে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সমস্ত বুদ্ধি হত ও বিফল হইয়া পড়ে।

তদ্রূপ কোন কবিতায় মদ ও মাতলামির উল্লেখ থাকিলে সূফীগণ উহার প্রচলিত বা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া বরং তদ্দারা অনুরাগ ও গভীর প্রেম বুঝিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেহ যদি এই কবিতা পাঠ করে ঃ

'হযরত নাফে' (রা) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন ঃ একদা আমি ইব্‌নে উমর (রা)-এর সহিত পথ চলিতেছিলাম। তখন তিনি বাঁশীর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তৎপর তিনি তাঁহার অঙ্গুলীদ্বয় স্বীয় কর্ণদ্বয়ে স্থাপন করিলেন এবং তিনি ঐ রাস্তা পরিত্যাগপূর্বক অন্যদিকে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর বহু দূর যাওয়ার পর তিনি আমাকে বলিলেন ঃ হে নাফে! তুমি কিছু শুনিতে পাও কি ? আমি বলিলাম, না। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার অঙ্গুলীদ্বয় তাঁহার কর্ণদ্বয় হইতে সরাইলেন। তিনি বলিলেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সহিত ছিলাম। তখন তিনি শাহীন বাঁশীর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। আমি যেরূপ করিলাম তখন তিনি তদ্রূপই করিয়াছিলেন। নাফে' বলিতেছেন-'আর আমি (ইব্‌ন উমর) তখন নাবালেগ ছিলাম।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-কে বাঁশীর সুর শুনিতে নিষেধ না করাতে হযরত ইমাম গায্‌যালী (র) উহা মুবাহ্ হওয়ার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উপরিউক্ত হাদীসে সেই ইব্‌ন উমর (রা)-ই তাঁহার মতের পরিপন্থী রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহা কিছুতেই মুবাহ্ হইতে পারে না। আর হযরত ইব্‌ন উমর (রা) স্বয়ং বলিতেছেন যে, তখন তিনি নাবালেগ ছিলেন এই কারণেই তখন তাঁহার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্তে নাই; যাহার দরুন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে শাহীনের ধ্বনি শুনিতে নিষেধ করেন নাই। যাহাই হউক, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্‌র কিতাবসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহ্‌য়াউল উলূম গ্রন্থে দাওয়াত গ্রহণের শর্তসমূহ বর্ণনা করিতে যাইয়া হযরত ইমাম গায্‌যালী (র) দাওয়াতকারীর গৃহে বাদ্য যন্ত্রাদি থাকিলে দাওয়াত গ্রহণ হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বাদ্য যন্ত্রাদির ধ্বনি শ্রবণ সম্পর্কে হযরত ইমাম গায্‌যালী (র)-এর সঠিক অভিমত অতি স্পষ্টরূপেই অনুধাবন করা যায়।

দুই হাজার মণ মদ ওজন করিলেও কিছু মদ পান না করা পর্যন্ত তুমি মত্ততার স্বাদ পাইবে না।

এই কবিতার অর্থ সূফীগণ এইরূপ করিয়া থাকেন যে, বকবক করিয়া বেড়াইলে ও শিক্ষা প্রদান করিলেই ধর্ম-কর্ম সুসম্পন্ন হয় না; বরং তজ্জন্য অনুরাগ ও আসক্তির প্রয়োজন। কারণ, ভালবাসা, প্রেম, পরহিযগারী তাওয়াক্কুলের কথা দিবারাত্র মুখে মুখে আওড়াইয়া বেড়াইলে এবং এ সকল বিষয়ে ভুরি ভুরি পুস্তক রচনা করিলে ও রাশি রাশি কাগজ মসিলিপ্ত করিয়া ফেলিলেও নিজের অন্তরে সেই সকল গুণ উৎপাদন না করা পর্যন্ত এই সমস্ত বুলি আওড়ান এবং গ্রন্থ-রচনায় কোনই ফল হইবে না।

আবার যে সমস্ত কবিতায় খারাবাত অর্থাৎ মদিরালয়, প্রতিমা মন্দির কিংবা পাশা খেলার গৃহের বর্ণনা থাকে, সূফীগণ উহাতে এই সমস্তের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা খারাবাত বলিতে সে সমস্ত স্থান বুঝিয়া থাকেন, যে স্থানে মানবের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার ইত্যাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া বিনয়, শিষ্টাচার, প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি গুণরাজি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূফীগণ 'খারাবাত' বলিতে মানবসুলভ স্বভাবের বিনাশ বুঝিয়া থাকেন। কারণ, ইহাই ধর্মের মূল অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে সকল মানবসুলভ স্বভাব ও প্রবৃত্তি রহিয়াছে সেগুলির বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই যে সকল গুণ মানবাত্মার আসল রত্নস্বরূপ, সেগুলি তাহার মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের মতে যে ব্যক্তি স্বীয় কুপ্রবৃত্তির বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয় নাই, সে বেদীন। কারণ, এইগুলির বিনাশ সাধনই ধর্মের মূল কথা।

মোটকথা, সূফীগণের মানসিক অবস্থানুযায়ী ভাবার্থ গ্রহণের বিবরণ অতি বিস্তৃত। কারণ, তাঁহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁহারা অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকের অনুভূতি স্বতন্ত্র। কিন্তু এতটুকু বর্ণনা করিবার কারণ এই যে, কতিপয় নির্বোধ ও বিদ'আতী লোক সমস্ত বুযর্গ সূফীগণের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকে, তাঁহারা প্রিয়তমার প্রতিমূর্তি, রমণীর কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, গণ্ডের তিলকবিন্দু, মদমত্ততা, মদিরালয়ের বিবরণ সংবলিত কবিতা আবৃত্তি ও শ্রবণ করেন, অথচ উহা হারাম। আর এই নির্বোধগণ মনে করে তাহাদের এইরূপ উক্তি সূফীগণের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি ও তাহারা তাঁহাদের যে নিন্দা করিল তাহা উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অবিশ্বাসীর দল এই বুযর্গগণের উন্নত অবস্থার বিন্দুমাত্রও খবর রাখে না। অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে; বরং কেবল ধ্বনি শ্রবণে আপনা আপনি এই সকল বুযর্গ মূর্ছিত হইয়া পড়েন। এইজন্যই শাহীন নামক বাঁশীর সুমধুর তানের কোন অর্থ না থাকিলেও ইহাই অনেক সূফীর সংজ্ঞা হারাইবার কারণ হইয়া থাকে। এই কারণেই যে সমস্ত সূফী আরবী ভাষা অনবগত হওয়া সত্ত্বেও আরবী কবিতা শ্রবণে মূর্ছিত হইয়া পড়েন

তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া নির্বোধ লোকেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বলে ঃ উহারা তো আরবী কবিতা মোটেই বুঝে না, অথচ ইহা শ্রবণ করিয়া মূর্ছাগ্রস্ত হইল কিরূপে?

এই নির্বোধেরা এতটুকু বুঝে না যে, উটও আরবী বুজিতে পারে না; কিন্তু উট চালকের আরবী পল্লী -গীতির সুমধুর তানে তন্ময় হইয়া হর্ষোল্লাসে ভারী বোঝা লইয়া অতি দ্রুত গতিতে পথ চলিতে চলিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াই ইহার তন্ময়তা কাটিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইয়া ফেলে। উপরিউক্ত নির্বোধ গর্দভদের এই উটের সহিত এইরূপ ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করা উচিতঃ তুই তো আরবী ভাষা মোটেই বুঝিতে পারিস না। এমতাবস্থায় আরবী কবিতা শ্রবণ করিয়া তোর আনন্দ ও স্ফূর্তি কেমন করিয়া জন্মিল?

সম্ভবত এক বুযুর্গ সুফী مَازَارَنِى فِى النَّوْمِ اِلاَّ خَيَالُكُمْ

আমার নিদ্রিতাবস্থায় তোমাদের কল্পনা ব্যতীত অপর কেহই আমার সহিত সাক্ষাত করে নাই।

আরবী কবিতা উহার অর্থের বিপরীত কোন অর্থ বুঝিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার কল্পনা অনুযায়ী ইহার অর্থ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, কবিতার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। এই কবিতা শ্রবণমাত্র উক্ত সুফী মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আরবী ভাষা জানিতেন না। মজলিসের লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ এই কবিতায় কি বলা হইয়াছে তাহাতো আপনি বুঝেন নাই। এমতাবস্থায় আপনার মূর্ছা হইল কিরূপে? সূফী উত্তর করিলেন ঃ কেন বুঝি নাই ? গায়ক বলিলেন ঃ مارا ريم অর্থাৎ আমরা নিরাশ্রয় ও অক্ষম। গায়ক যথার্থই বলিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে আমরা সকলেই নিরাশ্রয়, অভাবগ্রস্ত ও বিপদজ্জনক অবস্থায় নিপতিত।

ফলকথা, সমা' শ্রবণে এ সমস্ত বুযর্গের মূর্ছার কারণ এই যে, যাঁহার অন্তরে যে ভাব প্রবল থাকে, তিনি যাহাই শ্রবণ করেন না কেন, তাঁহার অন্তরস্থ সেই ভাবের কথাই শুনিয়া থাকেন এবং যাহা কিছু দর্শন করেন, তাঁহার অন্তরস্থ কল্পনার সেই বস্তুই দর্শন করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌র প্রেম অথবা অপর কোন পার্থিব প্রেমে বিদগ্ধ না হইলে এই বিষয়টি কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

চতুর্থ কারণ ঃ সমা' শ্রোতা যুবক হইলে ও তাহার কামভাব প্রবল থাকিলে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত যে কি বস্তু, তাহা তাহার জানা না থাকিলে ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, যখন সে কৃষ্ণবরণ কেশগুচ্ছ, মুখমণ্ডলের তিলকবিন্দু ও অনুপম রূপচ্ছটার বিবরণ শ্রবণ করিবে তখন শয়তান তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিবে, তাহার কাম-প্রবৃত্তিকে সতেজ করিতে থাকিবে এবং সুন্দরী কামিনীদের রূপনেশাকে তাহার অন্তরে সুন্দর সাজে সাজাইয়া উপস্থিত করিবে। এমতাবস্থায় অন্যান্য প্রেমাসক্ত লোকের প্রেমোন্মাদনার

কাহিনী শ্রবণ করিতে তাহার খুব ভাল লাগিবে। সুতরাং প্রবল কামনা লইয়া সে সেই রূপসীর আহ্বানে তৎপর হইবে এবং অবশেষে আসক্তির পুঁতিগন্ধময় গলি-পথে চলিতে আরম্ভ করিবে।

এমন বহু নর-নারী বিদ্যমান যাহারা সূফীগণের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করে; কিন্তু কামরিপুর বশীভূত হইয়া রূপের নেশায় উন্মত্ত হইয়া রূপসী রমনী ও শ্মশ্রুবিহীন সুদর্শন বালকদের পিছে পিছে ঘুরিয়া বেড়ায়। আবার উহার সমর্থনে অর্থহীন ওযর উপস্থাপিত করে; অথচ এই ওযর স্বয়ং গুনাহ হইতে অধিকতর মন্দ। তাহারা বলে ঃ অমুকের অন্তরে প্রেম ও আসক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছে এবং অমুক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেমের কন্টক বিদ্ধ হইয়াছে। তাহারা আরও বলেঃ প্রেম আল্লাহ্‌র একটি ফাঁদ। আল্লাহ্‌র অমুক ব্যক্তিকে এই ফাঁদে ফাঁসাইয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। তাহারা বলে ঃ প্রেমাসক্ত ব্যক্তির মন রক্ষা করা এবং প্রেমাস্পদের সহিত যাহাতে তাহার মিলন ঘটে ইহার চেষ্টা করা উত্তম কার্য। তাহারা বারবণিতালয়ের দালালিকে সৎপথ প্রদর্শন এবং ব্যভিচার ও ছোকরাবাজীকে প্রেম ও আসক্তি নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহারা আবার নিজেদের দোষ স্খালনের উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে ঃ অমুক পীর সাহেব অমুক ছোকরার প্রেমে আসক্ত ছিলেন এবং আবহমানকাল হইতেই বুযর্গগণের চরিত্রে এই প্রকার আসক্তি পরিলক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সুদর্শন বালকদের সহিত কুকর্মে লিপ্ত হওয়াকে তাহারা ছোকরাবাজী বলে না; ইহাকে তাহারা বলে চক্ষুর তৃপ্তি সাধন মাত্র এবং মনমুগ্ধকর রূপরাশি দর্শন করাকে তাহারা আত্মার খোরাক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকে। এইরূপ মিথ্যা, বাজে ও অশ্লীল কথা সত্যের আকারে সাজাইয়া তাহারা নিজেদের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করে। এই প্রকার জঘন্য কার্যকে যাহারা পাপ বলিয়া বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে ইবাহতি বলে (যাহারা হারামকে হালাল বলে, তাহাদিগকে ইবাহতি বলা হয়) তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলাই বিধেয়।

এই মরদূদগণ যে বলিয়া থাকে অমুক অমুক পীর অমুক অমুক বালকের প্রতি আসক্ত ছিলেন, ইহার কতিপয় কারণ থাকিতে পারে।

১. হয়ত তাহারা নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য এইরূপ মিথ্যা উক্তি করিয়া থাকে বা কোন পীর হয়ত কোন বালকের প্রতি প্রীতির চক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন এবং সে দৃষ্টিতে কামভাব ছিল না, যেমন লোকে লাল সেব ফল ও অফুটন্ত কলির সৌন্দর্য দর্শন করিয়া থাকে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, সেই পীর কর্তৃক তদ্রূপ ভুল হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, সকল পীর নিষ্পাপ নহেন। কোন পীর কর্তৃক কোন ভুল বা পাপ সংঘটিত হইলেই সেই পাপ নির্দোষ হইয়া পড়ে না। আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের (আ) কাহিনী এইজন্য বর্ণনা করিয়াছেন, যেন তুমি বুঝিতে পার যে, বুযর্গ হইলেও কেহই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ হইতে নিরাপদ নহে। হযরত

দাউদ (আ) বিলাপ ও তওবার কথাও আল্লাহ্ পাক এই জন্যই বর্ণনা করিয়াছেন যেন প্রমাণ গ্রহণ করিতে পার যে, হযরত দাউদ (আ)-এর ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ নবী যখন রোদন ও তওবা করিয়াছেন তুমি কখনো পাপ হইতে নিরাপদ নহ। অতএব, তোমারও তওবা ও রোদন করা আবশ্যক।

২. সুন্দর বালকের প্রতি কোন কোন পীরের প্রীতির চক্ষে দর্শনের আরও একটি কারণ আছে; ইহা নিতান্ত বিরল। সূফীগণের যে সমস্ত অবস্থা প্রকাশ পায় তন্মধ্যে কোন কোন অবস্থা অদৃশ্য জগতের নানাবিধ বস্তু তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সম্ভবত ফেরেশতাগণের মৌলিক আকৃতি ও আম্বিয়া (আ)-এর পবিত্রাত্মা কোনও আকার ধারণপূর্বক আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই আত্মপ্রকাশ অতীব মনোরম ও সুন্দর আকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ সুন্দর আকৃতি ধারণ করিবার কারণ এই যে, বাহ্যরূপ অবশ্যই আসল পদার্থের অনুরূপ হইয়া থাকে। যেহেতু এ -স্থলে আসল বস্তুটি আত্মিক জগতের, কাজেই তাহা নিতান্ত পূর্ণ। সুতরাং সেই পূর্ণ মনোরম ও পরম সুন্দর বস্তুটির প্রতিচ্ছবিও নিতান্ত সুন্দর ও মনোরম হইবে। সেকালে আরবদেশে দহিয়া কালবী (রা) অপেক্ষা অধিক সুন্দর অপর কেহই ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ) কে তাঁহার আকৃতিতে দেখিতে পাইতেন।

সম্ভবত ঃ আধ্যাত্মিক জগতের কোন বস্তু কোন সুদর্শণ বালকের আকৃতিতে কোন সুফীর নয়নগোচর হয়। এই আকৃতি আধ্যাত্মিক জগতের কোন বস্তুর বহিঃপ্রকাশমাত্র এবং দৃশ্যটির দর্শন লাভ পুনরায় উক্ত সূফীর ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে। সুতরাং উক্ত মনোরম আকৃতির সদৃশ্য সমাকৃতির কোন সুন্দর আকৃতি সেই সূফীর দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হারানো স্বর্গীয় অবস্থাটি এই সুন্দর আকৃতি দর্শনে তাঁহার হৃদয় আবার সতেজ হইয়া উঠে। ফলে তিনি যেন সেই হারানো অবস্থা পুনরায় লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত সুন্দর আকৃতিটি দর্শনে সূফীর মনে ভাবোন্মত্ততার উৎপত্তি হয়। এমতাবস্থায় আধ্যাত্মিক জগতের সেই পবিত্র অবস্থা ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে কোন সূফী কোন বালকের প্রতি প্রীতির চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে না

অতএব, যে ব্যক্তি এই গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নহে, কোন খাঁটি সূফী ব্যক্তিকে সুন্দর আকৃতি দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া সে ইহাই মনে করিবে যে, এই সূফী ব্যক্তি ঐ অজ্ঞ ও মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় কামভাব লইয়াই সুদর্শন আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কারণ, এই অজ্ঞ লোকটি তো সেই আধ্যাত্মিক জগতের পবিত্র ভাব ও অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে।

মোটকথা, সূফীগণের কার্য অতি শ্রেষ্ঠ, বিপদসঙ্কুল এবং নিতান্ত রহস্যপূর্ণ। তাঁহাদের কার্যকলাপে যত ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে অন্য কাহারো কার্যে তত

ভুলভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা নাই। লোকে যেন জানিতে পারে যে, এই সূফীগণ অজ্ঞ জনসাধারণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইতেছেন ইহা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য। কারণ, আজকাল যে ভণ্ড সূফীর দল সাধুর বেশ ধারণপূর্বক শয়তানের ন্যায় মানব -সমাজে ভণ্ডামি করিয়া বেড়াইতেছে, অজ্ঞ জনসাধারণ এই সত্যিকার সূফীগণকেও তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া মনে করে। বাস্তব পক্ষে তাহারাই উৎপীড়িত যাহারা সুফীগণের প্রতি এইরূপ হীন ধারণা পোষণ করে। কারণ খাঁটি সূফীকে ভণ্ডদের ন্যায় মনে করিয়া তাহারা নিজেদের উপরই অত্যাচার করিতেছে।

পঞ্চম কারণ ঃ সর্বসাধারণ লোক অভ্যাশবশত আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে যে সমা' করিয়া থাকে তাহাকে, পেশারূপে গ্রহণ না করিলে এবং সর্বদা না করিলে উহা মুবাহ। কোন কোন ক্ষুদ্র পাপ কার্য পেশারূপে গ্রহণ করিলে যেমন উহা মহাপাপে পরিণত হয়, তদ্রূপ কোন কোন বস্তু সময় সময় অল্পমাত্রায় হইলে মুবাহের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় হইলেই ইহা হারাম হইয়া পড়ে। হাবশী বালকগণ মাত্র একবার মসজিদে সাময়িক কুচকাওয়াজ করিয়াছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে নিষেধ করেন নাই। কিন্তু তাহারা মসজিদকে অনুষ্ঠানাগাররূপে গ্রহণ করিলে রাসুলুল্লাহ্ (সা) অবশ্যই তাহাদিগকে নিষেধ করিতেন। আর মাত্র একবার হওয়ার দরুণই হযরত আয়েশা (রা)-কেও উহা দর্শন করিতে তিনি নিষেধ করেন নাই। কিন্তু কেহ যদি ক্রীড়ামোদীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায় কিংবা উহাকে পেশারূপে গ্রহণ করে, তবে উহা কখনই জায়েয নহে। সময় সময় হাস্য-কৌতুক করা দুরস্ত আছে। কিন্তু অভ্যাসে পরিণত করিয়া লইলে তাহা বিদ্রুপ বলিয়া গণ্য হইবে এবং দুরস্ত হইবে না।

দ্বিতীয় অননুচ্ছেদ

সমা'র নিয়ম ও প্রভাব ঃ সমা'র তিনটি ধাপ আছে। যথা ঃ উপলব্ধি, মূর্ছা ও অঙ্গ-বিক্ষেপ। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম ধাপ ঃ সমা'র উপলব্ধি। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়নায়, পার্থিব মোহে মুগ্ধ হইয়া বা কেবল মানবের রূপের নেশায় মত্ত হইয়া সমা' শ্রবণ করে, সে এইরূপ কলুষিত ও নিকৃষ্ট যে তাহার উপলব্ধি ও মানসিক অবস্থা আলোচনাযোগ্য নহে। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ধর্ম-ভাব ও আল্লাহ্র মহব্বত প্রবল, তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী ঃ মুরীদগণ। কারণ, আল্লাহ্র পথ অন্বেষণ ও সেই পথে চলার সময় তাহাদের হৃদয়ের বিমর্ষতা ও উৎফুল্লতা, সারল্য ও কঠিন এবং গৃহীত হওয়ার ও প্রত্যাখ্যানের নির্দশনাবলী ইত্যাদি অবস্থা হইতে তাহাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার অবস্থা

প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে ধর্ম-পথযাত্রীর মন সম্পূর্ণরূপে জড়িত থাকে। এমতাবস্থায় তিরস্কার ও গ্রহণ, মিলন ও বিচ্ছেদ, নৈকট্য ও দূরত্ব, সন্তোষ ও বিরক্তি, আশা ও নিরাশা, ভয় ও নিরাপত্তার, অঙ্গীকার পালন ও অঙ্গীকার ভঙ্গন এবং মিলন -সুখ ও বিচ্ছেদ -যাতনা, এইরূপ কোন কথা যদি তিনি শুনতে পান অথবা এই প্রকার অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা থাকে, তবে তিনি উহাকে নিজের মানসিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লন। আর ইহাতে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাব প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন প্রকার আনুষঙ্গিক অবস্থা তাঁহার হৃদয়ে উৎপন্ন হয় ও সেই অবস্থাসমূহের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে নানারূপ কল্পনা জাগরিত হয়। মুরীদের জ্ঞান- বিশ্বাসের ধারা সুদৃঢ় না থাকিলে সমা' শ্রবণে তাঁহার মনে এমন কল্পনা আসিতে পারে যাহা কুফরী। যেমন, সমা' শ্রবণ করতঃ আল্লাহ্‌র গুণ সম্বন্ধে এমন কল্পনা উদিত হইতে পারে যাহা তাঁহার সম্বন্ধে একেবারে অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন কেহ এই কবিতা শ্রবণ করে ঃ

زاول ظنت میل بوال حیل کجاست ہ وامرو زملول لشتن
ازبیر حیراست–

ইতিপূর্বে আমার প্রতি তোমার যে অনুরাগ ছিল তাহা আজ কোথায় ? কিজন্য তুমি আজ আমার প্রতি বিরাগ ?

যে মুরীদ সাধনার পথে প্রথম প্রথম খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে ছিল; এখন গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে; উক্ত কবিতা শ্রবণে জ্ঞানের অপরিপক্কতাহেতু সে মুরীদ মনে করিতে পারে যে, প্রথমদিকে আল্লাহ্ তাহার প্রতি অতি অনুগ্রহশীল ছিলেন এবং তাহার সহিত আল্লাহর সংযোগ ছিল প্রগাঢ়, কিন্তু এখন তাঁহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আল্লাহ্‌র শানে এইরূপ পরিবর্তন মনে করা কুফরী। বরং তাহার বুঝা উচিত যে, আল্লাহ্‌তে কোন পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব। কারণ তিনি পরিবর্তনকারী, পরিবর্তনশীল নহেন। মুরীদের ইহাই বুঝা উচিত যে, তাহার নিজের মধ্যেই পবিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহার হৃদয়ের যে অবস্থা ইতিপূর্বে উন্মুক্ত ছিল, যাহাতে আল্লাহর করুণা তাহার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিত এখন তাহার হৃদয়ের সেই পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের দিক হইতে কোন প্রতিবন্ধকতা, পর্দা ও বিরাগ কখনই হয় নাই; বরং তাহার অসীম রহমতের দ্বার চির অবারিত। যেমন, সূর্য; ইহা সকলকেই কিরণ দান করিতেছে কিন্তু যে ব্যক্তি প্রাচীরের আড়ালে গমন করে, সে নিজেই সূর্যের কিরণ হইতে আড়ালে পড়িয়া যায়। সেই সময় লোকটির মধ্যেই পরিবর্তন ঘটে, সূর্য কিরণে কোন পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং তাহাকে বলা উচিত ঃ

خو اثبر محب امراے رگاری دمیرا است ہ بر بنره اگرن
تابرا زاد بیر است–

চাহিয়া দেখ, সূর্য উদিত হইয়াছে। ইহার আলোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। কিন্তু কোন বান্দার উপর যদি এই কিরণ রশ্মি পতিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, সূর্যের কোন দোষ নাই, দুর্ভাগ্য তাহারই।

অতএব মুরীদের পথে কোন পর্দা বা বাধা পড়িলে বুঝিতে হইবে ইহা তাহার নিজের দুর্ভাগ্য ও ত্রুটির কারণেই হইয়াছে। আল্লাহ্‌র দিক হইতে উহা আরোপিত হইয়াছে বলা সঙ্গত নহে। উক্ত উপমার উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম-পথযাত্রীর চলার পথে যে সমস্ত ত্রুটি -বিচ্যুতি ও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, উহাকে নিজের পক্ষ হইতেই ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর পক্ষে তাহার অন্তরে যে সৌন্দর্য ও অসাধারণ গুণ পরিলক্ষিত হয় এবং যে অসীম দান সে লাভ করে, উহা আল্লাহ্‌প্রদত্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। যে মুরীদের এতটুকু বুঝিবার মত জ্ঞান নাই, সে অতি সত্বর কুফরের বিপদে নিপতিত হইবে; অথচ ইহা সে জানিতেও পারিবে না। এইজন্যই আল্লাহর মহব্বতে সমা' শ্রবণে আপদ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ এই শ্রেণীর সমা' শ্রবণকারী মুরীদের শ্রেণী অতিক্রম করত ঃ আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন হালাত (অবস্থা) ও মকামাত (ধাপ) পার হইয়া এমন অবস্থার শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন যাহাকে আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ করিলে উহাকে 'ফানা' ও 'নাস্তির' অবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হয়। আর আল্লাহ্ পাকের সহিত সম্বন্ধ করিলে ইহাকে তাওহীদ ও অন্তরঙ্গতার অবস্থা বলা যায়। এইরূপ ব্যক্তি অর্থ বুঝিবার উদ্দেশ্যে 'সমা' শ্রবণ করেন না; বরং সমা' শ্রবণমাত্রই তাঁহাদের অন্তরে নাস্তি ও অন্তরঙ্গতার অবস্থা সতেজ হইয়া উঠে। তাঁহারা এখন আত্মহারা হইয়া বাহ্যজগত সম্বন্ধে একেবারে অচেতন হইয়া পড়েন। উপমাস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা অগ্নিতে পতিত হইলেও কিছুই টের পান না। যেমন, একদা হযরত শায়খ আবুল হাসান নূরী (র) মূর্ছিতাবস্থায় সদ্য কর্তিত ইক্ষু ক্ষেতের উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ ইক্ষু-মূলগুলি দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় কাটিয়া গিয়া একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহা তিনি বিন্দুমাত্রও টের পাইলেন না। এই শ্রেণীর মূর্ছা (ওয়াজদ) অতি পরিপূর্ণ ও উন্নতস্তরের হইয়া থাকে। কিন্তু মুরীদগণের মূর্ছার সময় একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ) মূর্ছায় মানবসুলভ গুণাবলী লোপ পায় না। পক্ষান্তরে এই শ্রেণীর সূফীগণ রূপ দর্শনে মহিলাগণ এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা নিজদিগকে ভুলিয়া গিয়া নিজ নিজ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল।

এই আত্মহারা অবস্থাকে কখনও অবিশ্বাস করিও না। এবং এইরূপও বলিও না আমি তাহাকে তো দিব্যি দেখিতে পাইতেছি, সুতরাং তাহার সত্তা কিরূপে বিলুপ্ত

হইল? কারণ, তুমি এখন তাহার যে দেহটি দেখিতেছ, উহা সে নহে। এই ব্যক্তি মরিয়া গেলেও তো তুমি তাহার দেহটি দেখিতে পাও। কিন্তু সে উহাতে থাকে না। মানুষের সত্তা একটি অতিসূক্ষ্ম বস্তু। ইহা সমস্ত অনুভূতি ও জ্ঞানের আধার। যখন সকল পদার্থ সেই সূক্ষ্ম বস্তুর জ্ঞান ও অনুভূতি হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন বাস্তবে সমস্ত পদার্থই তাহার নিকট বিলুপ্ত। আর মূর্ছিত অবস্থায় যখন নিজেকেও ভূলিয়া যায়, তখন নিজের সত্তার নিকট সে নিজেও বিলুপ্ত (নিস্ত) হইয়া যায়। তাহার ধ্যান-পটে কেবল আল্লাহ্‌পাক ও তাঁহার স্মরণ ব্যতীত যখন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না তখন সমস্ত নশ্বর বস্তুই তাহার নিকট বিলুপ্ত হয় এবং একমাত্র চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর আল্লাহ্ পাকই তাহার ধ্যান-পটে অবশিষ্ট থাকেন। তাওহীদের অর্থ ইহাই যে, মানুষ যখন স্বীয় ধ্যান-পটে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন বস্তুই দেখিতে পায় না, তখন সে বলে সমস্তই তিনি, আমার অস্তিত্বই নাই। অথবা সে বলে, আমি নিজেই তিনি। একদল এখানে মহা ভুল করিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা এই বিলুপ্তকে দ্রবণ (হুলুল) বলিয়া অভিহত করিয়াছেন। অপর একদল উহাকে মিলন (ইত্তিহাদ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিষয়টি এইরূপ, যে ব্যক্তি কখনও দর্পণ দেখে নাই, সে দর্পণে দৃষ্টি করিয়া যখন নিজের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাইবে তখন সে মনে করিবে, সে স্বয়ং দর্পণে নামিয়া আসিয়াছে অথবা মনে করিবে, সেই প্রতিমূর্তিই দর্পণের আকৃতি। কারণ, দর্পণের ধর্ম এই যে, ইহা রক্তিম ও শুভ্র বর্ণ ধারণ করিতে পারে। যদি মনে করে যে, সে নিজেই দর্পণে নামিয়া আসিয়াছে, তবে ইহা দ্রবণ (হুলুল) হইবে এবং বুঝে যে, স্বয়ং দর্পণই দর্শনকারীর প্রতিমূর্তি ধারণ করিয়াছে, তবে উহা মিলন (ইত্তিহাদ) হইবে। দর্পণ সম্বন্ধে এই উভয়বিধ মতই ভুল। কারণ, দর্পণ কখনও প্রতিমূর্তি হয় না এবং প্রতিমূর্তিও কখনই দর্পণে পরিণত হয় না। কিন্তু দর্শনকারীর দৃষ্টিতে এইরূপই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং যাহার কার্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান নাই, সে এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে। ইহ্‌য়াউল উলুম গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ অর্থ-বোধের পর ভাবোন্মত্ততা (হাল) জন্মে। ইহাকে মূর্ছা বা সংজ্ঞা বিলুপ্তি (ওয়াজ্‌দ) বলে। ওয়াজদ (وجد) শব্দের অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। সুতরাং যে মানসিক অবস্থা পূর্বে ছিল না তাহা লাভ করাকেই ওয়াজ্‌দ বলে। ওয়াজদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। ওয়াজদ কি? যথার্থ কথা এই যে, ইহা এক প্রকার নহে; বরং বিবিধ প্রকারে ইহা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধানত ঃ দুই প্রকার বস্তু হইতেই ইহা হইয়া থাকে। প্রথম, অন্তরে উদ্ভব অবস্থা হইতে এবং দ্বিতীয়, অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত বস্তু হইতে।

প্রথম প্রকার ওয়াজদ ঃ মানসিক অবস্থার কোন একটি প্রবল হইয়া মানুষকে উম্মত্তের ন্যায় করিয়া ফেলিলেই এই শ্রেণীর ওয়াজদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই অবস্থা কখনও হয় আসক্তি, কখনও বা ভয়, কখনও বা প্রেমানল, কখনও যাচঞা, কখনও দুঃখ, কখনও আবার আক্ষেপ হইয়া থাকে। উহা বহু প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু তন্মধ্যে কোন একটি ভাব অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দিলে উহার ধূম্ররাশি মস্তিষ্কে প্রবেশ করত ঃ ইহার ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহকে বিকল করিয়া দেয়। তখন নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় সে দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না। যদিও বা দেখিতে ও শুনিতে পায়, উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় সেই দর্শন ও শ্রবণের প্রতি সে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত ও উদাসীন থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজদ ঃ ইহা অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত বস্তু হইতে জন্মিয়া থাকে। যে সমস্ত অদৃশ্য বস্তু সূফীগণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তন্মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য বস্তুর আকৃতিতে এবং কতকগুলি অবিকল আকৃতিতে তাঁহারা দেখিতে পান। ইহাতে সমা'র প্রভাব এই জন্য যে, ইহা হৃদয়কে পরিষ্কার করে। হৃদয়পট ধূলিমিশ্রিত দর্পণের ন্যায় ঘোলাটে হইয়া থাকে। সমা' এই ধূলিরাশি হইতে হৃদয়কে পরিষ্কার করে, যাহাতে নানাবিধ প্রতিচ্ছবি ইহাতে প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু প্রকাশ করা যায় তাহা একটি জ্ঞান বা অনুমান কিংবা সাদৃশ্য। আর যে ব্যক্তি এই স্তরে উপনীত হইয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কেহই ইহার মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। আবার যিনি যতটুকু পৌঁছিয়াছেন তিনি ততটুকু জানিতে পারেন। যিনি যতটুকু পৌঁছিয়াছেন তিনি ততটকুই অপরের উপর প্রতিফলিত করিতে পারেন। যাহা কিছু অনুমান করা যায় তাহা পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে, যওক (আস্বাদন শক্তি) দ্বারা হয় না। এ সম্বন্ধে এতটুকু বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা এই স্তরে উপনীত হয় নাই তাহারাও যেন উপরিউক্ত অবস্থার প্রতিবিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবিশ্বাস না করে। কারণ, অবিশ্বাস করিলে নিজেদের ক্ষতি হইবে। যে ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার নিজের ভাণ্ডারে যাহা নাই তাহা বাদশাহগণের ভাণ্ডারেও নাই, সে বড় নির্বোধ।

আবার যে ব্যক্তি সামান্য কৃষিকার্য দ্বারা যৎসামান্য শস্যলাভ করিয়া মনে করে, আমি বড় বাদশাহ, আমি সমস্ত মর্যাদাই প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সব কিছুই আমার অর্জিত হইয়াছে ও আমার নিকট যাহা নাই তাহার অস্তিত্বই নাই, সে পূর্ববর্ণিত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক নির্বোধ। এই দুই শ্রেণীর নির্বোধেই সুফীগণের অসাধারণ কার্যাবলী অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিয়া থাকে।

কেহ কেহ আবার মূর্ছার ভান করিয়া থাকে। ইহা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু মূর্ছার উপকরণসমূহ হৃদয়ে আনয়ন করিবে, যেন সত্যিকারের মূর্ছা জন্মে। হাদীস শরীফে আছে, কুরআন শরীফ শ্রবণের সময় তোমরা রোদন কর। রোদন না আসিলে রোদনের ভান কর। ইহার অর্থ এই, চেষ্টা করিয়া দুঃখ-শোকের উপকরণ অন্তরে আনয়ন করিলে হয়ত প্রকৃত দুঃখ-শোকের উপকরণ অন্তরে জন্মিবে।

প্রশ্ন ঃ সমা' শ্রবণ যদি সূফীগণের পক্ষে হিতকর এবং আল্লাহ্‌পাকের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে তবে সূফীগণের মজলিসে গায়কদিগকে সমা' গাহিবার জন্য না বসাইয়া মিষ্টস্বরে কুরআন শরীফ পড়িবার জন্য তাহাদিগকে বসাইয়া দেওয়াই উচিত। কারণ, কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী; ইহা শ্রবণ করাই উত্তম।

উত্তর ঃ কুরআন শরীফের পবিত্র আয়াত শ্রবণের জন্য বহু মজলিসের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং উহাতে বহু লোকের সংজ্ঞা লোপ পাইয়া থাকে। কুরআন শরীফ শ্রবণে বেহুঁশ হইয়া পড়েন এমন অনেক লোক আছেন। এমন কি, বহু লোক কুরআন শরীফ শ্রবণে বেহুঁশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহিনী বর্ণনা করিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। ইহ্য়াউল উলুম গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। কিন্তু সূফীগণ সমা'র মজলিসে কুরআন শরীফ পাঠকদিগকে না বসাইয়া গযল-গায়কদিগকে বসাইবার এবং কুরআন শরীফ শ্রবণ না করিয়া তৎপরিবর্তে সমা' শ্রবণ করিবার পাঁচটি কারণ রহিয়াছে।

প্রথম কারণ ঃ কুরআন শরীফের সকল আয়াত আল্লাহ্- প্রেমিকদের অবস্থার সহিত সম্পর্ক রাখে নাই। কারণ, কুরআন শরীফে কাফিরদের কাহিনী, পার্থিব কাজ-কারবারের বিধি-নিষেধ এবং নানাবিধ বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। কেননা, কুরআন শরীফও সর্বপ্রকার সৃষ্ট জীবনের মুক্তির জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে; সুতরাং পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় আয়াত যখন পাঠ করা হইবে এবং উহাতে বর্ণিত থাকিবে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পাইবে মাতা এবং অর্ধাংশ পাইবে ভগ্নি। আবার কোন আয়াতে উল্লেখ থাকিবে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে চারিমাস দশদিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে, প্রভৃতি। এই প্রকার আয়াতসমূহ প্রত্যেক প্রেমিকের প্রেমানল বৃদ্ধি করিবে না। এই শ্রেণীর আয়াত শ্রবণে কেবল তাঁহাদের প্রেমানলই বৃদ্ধি করিবে যাঁহাদের প্রেম অসীম এবং সুললিত কণ্ঠনিঃসৃত যে কোন সুমিষ্ট স্বর শ্রবণেই যাঁহারা মূর্ছিত হইয়া পড়েন; যদিও শ্রুত বিষয় তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখে না। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রেমিক অতি বিরল।

দ্বিতীয় কারণ ঃ অনেক লোক কুরআন শরীফের হাফেয ও সুদক্ষ ক্বারী। সুতরাং প্রত্যহ কুরআন শরীফের বহু তিলাওয়াত শুনা যায়। আর যাহা বহুবার শ্রুত হয় তাহা অনেক সময় হৃদয়কে ভাবোন্মত্ত করিতে পারে না। এমন কি, কোন কিছু প্রথমবার শুনিলে যে অবস্থা হয়, দ্বিতীয়বার শুনিলে তদ্রূপ হয় না। সমা' নূতন নূতন হইতে পারে; কিন্তু কুরআন শরীফ নূতন হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যখন আরববাসিগণ তাঁহার পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইয়া কুরআন শরীফের নূতন নূতন আয়াত শ্রবণ করিতেন তখন তাঁহারা রোদন করিতেন এবং তাঁহারা তন্ময় হইয়া যাইতেন।

হযরত আবূবকর (রা) বলেন ঃ

كُنَّا كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُنَا-

আমরা তোমার মত ছিলাম। অতঃপর আমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

অর্থাৎ প্রথম প্রথম কুরআন শরীফ শ্রবণে তোমাদের ন্যায় আমাদের মনও বিগলিত হইয়া যাইত, এখন আর তদ্রূপ হয় না। এখন আমাদের মন শান্ত ও স্থির এবং কুরআন শরীফ শ্রবণ অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে জিনিস সদ্য টাটকা ও নূতন ইহার প্রভাবও অধিক হইয়া থাকে। এইজন্যই হযরত উমর (রা) হাজিগণকে শীঘ্র নিজ নিজ শহরে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিতেন এবং বলিতেন ঃ আমার আশঙ্কা হয় যে, ক্বাবা শরীফ দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে ইহার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের অন্তর হইতে বিদূরীত হইয়া যাইবে।

তৃতীয় কারণ ঃ এমন লোক অনেক আছে যাহাদের অন্তরকে সুমিষ্ট সুর ও ছন্দযুক্ত স্বরে আন্দোলিত না করিলে উহা সক্রিয় হইয়া উঠে না। এইজন্যই সোজাসুজি কথায় মূর্ছা কম আসিয়া থাকে এবং তান-লয়যুক্ত সুমধুর সুরেই মূর্ছা আসিয়া থাকে। অধিকন্তু সুললিত কণ্ঠনিঃসৃত সমা'র প্রতিটি রাগিনী ও পদ্ধতির স্বতন্ত্র প্রভাব রহিয়াছে। অথচ তান-লয় যোগপূর্বক সমা'র ন্যায় কুরআন শরীফ পাঠ করা দুরস্ত নহে আবার কুরআন শরীফ গানের সুরে পাঠ না করিলে উহা চলিত কথার মতই হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌প্রেম অত্যন্ত প্রবল থাকিলে কুরআন শরীফ চলিত কথার মত পাঠ করিলেও প্রেমানল উত্তেজিত হইয়া উঠে।

চতুর্থ কারণ ঃ সুমিষ্ট স্বরকে অন্যান্য মধুর সুর দ্বারা সাহায্য করিলে উহার প্রভাব অধিক হইয়া থাকে; যেমন, দফ-শাহীনের সুর কণ্ঠস্বরের সহিত মিলিত হইলে ইহার প্রভাব আরও বর্ধিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রসমূহ খেল-তামাশার অন্তর্ভুক্ত। অপর পক্ষে

কুরআন শরীফ মূল ইবাদত। সুতরাং ইহাকে খেল-তামাশার আবিল্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখা একান্ত কর্তব্য এবং যাহা জনসাধারণের দৃষ্টিতে খেল-তামাশার অন্তর্ভুক্ত, তৎসমন্বয়ে কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া উহাকে খেল-তামাশার রূপ দেওয়া কখনই দুরস্ত নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা মুআওয়াযের কন্যা রুবাইয়ের গৃহে গমন করিলেন। তখন তাহাদের দাসিগণ দফ বাজাইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল। হুযূর (সা)-কে দেখিবামাত্র তাহারা কবিতায় তাঁহার প্রশংসাবাদ গাহিতে আরম্ভ করিল। হুযূর (সা) তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বলিলেন ঃ চুপ কর এবং যাহা পূর্বে আবৃত্তি করিতেছিলে তাহাই আবৃত্তি কর। ইহার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসাবাদ মূলত ঃ ইবাদত। সুতরাং বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে এমন মহান কার্যের অনুষ্ঠান দুরস্ত নহে।

পঞ্চম কারণ ঃ বিভিন্ন লোকের মানসিক অবস্থা বিভিন্নরূপে হইয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজ অবস্থা অনুযায়ী সমা' শ্রবণে অভিলাষী হয়। যে কবিতা শ্রোতার মানসিক অবস্থায় নহে তাহা শুনিতে তাহার ভাল লাগে না। তখন হয়ত সে বলিয়া বসিতে পারে ঃ ইহা আবৃত্তি করিও না; অপর কোন কবিতা বল। শ্রোতার মনে বিরক্তি জন্মে, এমন স্থানে কুরআন শরীফ পাঠ করা উচিত নহে। কুরআন শরীফের সকল আয়াত প্রত্যেকের মানসিক অবস্থার অনুকূলে না-ও হইতে পারে। কবিতার মর্ম শ্রোতার মানসিক অবস্থার অনুকূল না হইলেও সে উহাকে নিজের অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইতে পারে। কারণ, কবি যে মর্মে কবিতা রচনা করিয়াছেন, শ্রোতার জন্য উহা ইহতে অবিকল সেই মর্ম গ্রহণ করা ওয়াজিব নহে। পক্ষান্তরে শ্রোতার জন্য কুরআন শরীফের অর্থকে নিজের অবস্থা ও ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করিয়া লওয়া দুরস্ত নহে।

এই সমস্ত কারণে সূফীগণ তাঁহাদের মজলিসে ক্বারীর পরিবর্তে গযল-গায়কদিগকে মনোনীত করিয়া থাকেন। উপরিউক্ত পঞ্চবিধ কারণের সারমর্ম দুইটি মাত্র। (১) শ্রোতার মানসিক দুর্বলতা ও ত্রুটি -বিচ্যুতি এবং (২) কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব। কাজেই ইহাকে নিজের খেয়াল অনুযায়ী ব্যবহার করা যাইবে না।

তৃতীয় ধাপ ঃ অঙ্গ-বিক্ষেপ, নর্তন ও বস্ত্র ছেঁড়া। যে ব্যক্তি ভাবোন্নত্ততায় আত্ম সংবরণে অক্ষম ও ইচ্ছাশক্তির বহির্ভূত হইয়া এই সমস্ত কার্য করে, তজ্জন্য সে দণ্ডনীয় হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এ সমস্ত কার্য এই উদ্দেশ্যে করে যে, লোকে উহা দেখিয়া তাহাকে সূফী বলিয়া মনে করিবে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে সূফী নহে, তার এইরূপ আচরণ হারাম ও নিছক ভণ্ডামি।

হযরত আবুল কাসেম নাসিরাবাদী (র) বলেন ঃ আমার মতে গীবতে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা আল্লাহর মহব্বতবর্ধক সমা' শ্রবণে ব্যাপৃত থাকা উৎকৃষ্ট। হযরত আবু আমর ইব্ন নজীদ (র) বলেন ঃ সমা' শ্রবণে মিথ্যা ভাবোম্মত্ততার ভান করা অপেক্ষা ত্রিশ বৎসর গীবত (অগোচরে পরনিন্দা) করা উৎকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি সমা' শ্রবণ করেন; অথচ অটল ও শান্ত থাকেন এবং তাঁহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্তন বাহিরে প্রকাশ পায় না, তিনিই অধিকতর কামিল সূফী। তাঁহার মানসিক শক্তি এত অধিক যে, তিনি নিজকে রক্ষা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যাহারা দুর্বল, তাহারাই অঙ্গবিক্ষেপ, চিৎকার ও রোদন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ মনোবল অতি বিরল। হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন যে, كُنَّا كَمَا كُنْتُمْ قَسَتْ قُلُوْبُنَا ইহার অর্থও সম্ভবত ইহাই যে, قَوِيَتْ قُلُوْبُنَا অর্থাৎ আমাদের অবস্থাও প্রথম প্রথম দুর্বল ছিল; তখন আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন বাহিরে প্রকাশ প্রতিরোধ করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের মনোবল এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে ব্যক্তি মানসিক পরিবর্তন বাহিরে প্রকাশ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম, প্রয়োজনের শেষ সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেকে দমন করিয়া রাখা এবং নিজের অবস্থা প্রকাশ পাইতে না দেওয়া তাহার কর্তব্য।

এক যুবক হযরত জুনায়দ (র)-এর দরবারে উপস্থিত হইতেন। সমা'র আওয়ায শ্রবণে এই ব্যক্তি চিৎকার করিয়া উঠিতেন। হযরত জুনায়দ (র) তাঁহাকে বলিলেন ঃ পুনরায় এইরূপ করিলে আমার সংসর্গে অবস্থান করিও না। অতঃপর সেই যুবক ধৈর্যধারণপূর্বক স্বীয় হৃদয়ের সমা' শ্রবণজনিত আবেগ দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। একদা সর্বশক্তি প্রয়োগে হৃদয়ের আবেগ দমন করিলেন এবং নিজকে সামলাইয়া লইলেন। কিন্তু অবশেষে এক বিকট চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ফলে তাঁহার পেট ফাটিয়া গেল এবং তিনি ইন্তিকাল করিলেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নিজ হইতে মানসিক অবস্থা প্রকাশ না করে এবং অনিচ্ছায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নর্তন-কুর্দনে প্রবৃত্ত হয় অথবা চেষ্টা করিয়া নিজের মধ্যে রোদনের ভান আনয়ন করে, তবে দূষণীয় নহে। কারণ, হাবশী বালকেরা মস্‌জিদে কুচকাওয়াজ করিয়াছিল এবং হযরত আয়েশা (রা) ইহা দর্শনের জন্য গমন করিয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলেন ঃ তুমি আমা হইতে ও আমি তোমা হইতে। এই শুভবাণী শুনিয়া হযরত আলী (রা) আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় পবিত্র পদদ্বারা কয়েকবার ভূমিতে আঘাত করিলেন। আরববাসিগণ আনন্দের অতিশয্যে এইরূপ করিতে অভ্যস্ত ছিল। হুযূর (সা) হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) কে বলিলেন ঃ আকৃতি ও স্বভাবে তুমি আমার ন্যায়। ইহা শুনিয়া তিনিও আনন্দে নাচিয়া

উঠিলেন। হুযূর (সা) হযরত যায়দ ইব্‌নে হারিসা (রা) কে বলিলেন ঃ তুমি আমার বন্ধু এবং ভ্রাতা। তিনিও আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। যে নৃত্য এইরূপ সাময়িক আনন্দাতিশয্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র তাহা হারাম নহে। যদি কেহ স্বীয় হৃদয়স্থিত আল্লাহ্‌ প্রেমের ভাবকে দৃঢ় করার চেষ্টা করিতে গিয়া নৃত্য করিয়া উঠে তবে ইহা দোষের নহে; বরং প্রশংসনীয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক সজ্ঞানে পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করা উচিত নহে। ইহা করিলে অর্থের অপচয় হয়। কিন্তু সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বস্ত্র ছিন্ন করিলে অবৈধ নহে, যদিও স্বেচ্ছায় হউক না কেন। কারণ, এইরূপ অবস্থায় সে হয়ত বস্ত্র ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে এবং ছিন্ন করিতে না চাহিলেও নিবৃত্ত থাকিতে পারে না-সে এমন রোগীর ন্যায় যে রোগের তাড়নায় ইচ্ছা করিয়াই রোদন ও চিৎকার করিয়া থাকে। কিন্তু সে রোদন ও চিৎকার দমন করিতে ইচ্ছা করিলেও উহা না করিয়া পারে না। মানুষ স্বীয় ইচ্ছায় ও আগ্রহে যে কার্য করিয়া থাকে তাহা হইতেও সব সময় নিবৃত্ত থাকা তাহার জন্য সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং মানুষ মূর্ছিত অবস্থায় আত্ম-সংবরণে অক্ষম হইয়া এইরূপ কার্য করিলে অপরাধী হইবে না।

সুফীগণ কোন কোন সময় স্বীয় পরিধানের বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া পার্শ্ববর্তী লোকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া থাকেন। একদল লোক ইহাতে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া থাকে-এইরূপ করা উচিত নহে। এইরূপ প্রতিবাদকারী নিজেই ভুলে রহিয়াছে। কারণ, পিরহান প্রস্তুত করিবার জন্যও তো বস্ত্র টুকরা টুকরা করা হইয়া থাকে। বস্ত্র নষ্ট না করিয়া কোন কাজের উদ্দেশ্যে খণ্ড খণ্ড করা অবৈধ নহে। এইরূপে যদি বস্ত্রের টুকরাগুলি নিজের পার্শ্ববর্তী লোকদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় যেন প্রত্যেকেই উহার কিছু কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ জায়নামায ও জুব্বার সহিত সেলাই করিয়া লইতে পারে, তবে তাহাও দুরস্ত আছে। কারণ, কেহ যদি একখানা নেকড়াকে চারিশত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক-একটি খণ্ড এক-একজন দরিদ্রকে দান করে এবং প্রত্যেকটি খণ্ড কাজের উপযোগী থাকে, তবে তাহাও অবৈধ হইবে না।

সমা'র নিয়ম

সমা' শ্রবণের সময় তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; যথা ঃ সময়, স্থান এবং মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ।

সময় ঃ নামাযের সময় উপস্থিত হইলে, আহারের সময় অথবা অপর কোন কারণে মন অস্থির থাকিলে সমা' শ্রবণ নিষ্ফল হইবে।

স্থান ঃ সর্বসাধারণের চলাচলের পথে, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও মন্দ স্থানে কিংবা কোন অত্যাচারী লোকের বাড়িতে সমা' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে শ্রোতৃমণ্ডলীর মন অস্থির ও চঞ্চল থাকে।

মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ ঃ সমা'র মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে অহংকারী, দুনিয়াদার অথবা সমা'তে অবিশ্বাসী কিংবা ভানকারী, যে মিথ্যা ভান করিয়া মূর্ছিত হয় ও নৃত্য করে, কিংবা ধর্ম-কর্মে উদাসীন লোক থাকে যাহারা কুপ্রবৃত্তির খেয়ালে সমা' শ্রবণ করে, অথবা বেহুদা কথা বলে ও এদিক সেদিক তাকায়। মজলিসের মর্যাদা নষ্ট করে : অথবা সভায় যুবক শ্রোতা থাকে ও কামিণিগণও তামাশা দেখিবার জন্য উপস্থিত হয় এবং এমতাবস্থায় যুবক-যুবতিগণ একে অন্যের ধ্যানে থাকে। এইরূপ মজলিসে সমা' শ্রবণ নিষ্ফল।

এই মর্মেই হযরত জুনায়দ (র) বলেন, সমা'র জন্য অনুকূল সময়, স্থান ও উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ শর্ত। আর যে স্থানে যুবতী কামিণিগণ তামাশা দেখিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয় এবং ধর্মে-কর্মে উদাসীন ও কামান্ধ যুবকের দল বিদ্যমান থাকে, তথায় সমা'র অনুষ্ঠান করা হারাম; কারণ, এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের কামাগ্নি প্রজ্বলিত করিবে এবং তাহারা প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করিবে। ফলে হয়ত একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে এবং পরিশেষে ইহা নানাবিধ পাপ ও বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ সমা'র অনুষ্ঠান কখনও উচিত নহে।

সমা'র মজলিসে পালনীয় নিয়ম ঃ নিজ নিজ মস্তক সকলেই অবনত রাখিবে এবং কেহই কাহারও প্রতি তাকাইবে না। সমা' শ্রবণে প্রত্যেকেই নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন রাখিবে এবং মাঝে কখনও কথা বলিবে না, পানি পান করিবে না এবং এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করিবে না। হাত ও মাথা নাড়িবে না এবং ইচ্ছাপূর্বক ভান করিয়া কোন প্রকার অঙ্গ বিক্ষেপ করিবে না; বরং নামাযে 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠের সময় যেরূপ বসিতে হয় তদ্রূপ আদবের সহিত বসিবে এবং স্বীয় হৃদয়কে আল্লাহ্‌র সঙ্গে রাখিবে। আর অন্তরে অদৃশ্য জগতের কি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ইহার প্রতীক্ষায় থাকিবে এবং নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে যেন স্বেচ্ছায় দণ্ডায়মান না হও, নর্তন-কুর্দন ও অঙ্গ-বিক্ষেপ আরম্ভ না কর। ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া কেহ দণ্ডায়মান হইয়া পড়িলে তাহার সহিত সকলেই দাঁড়াইবে। এমতাবাস্থায় কাহারও পাগড়ী পড়িয়া গেলে সকলেই পাগড়ী খুলিয়া ফেলিবে। এই সমস্ত কার্য বিদ'আত (নব প্রবর্তিত) এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন (রা) এইরূপ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ না থাকিলেও বিদ'আতমাত্রই বর্জনীয় নহে। কারণ, অনেক বিদ'আত এমন আছে যাহা পুন্যের কার্য। হযরত ইমাম শাফিঈ (র) বলেন যে, তারাবীহের নামাযে জামায়াত হযরত উমর (রা) কর্তৃক উদ্ভাবিত ও নির্ধারিত এবং ইহা উৎকৃষ্ট বিদ্‌আত। নিন্দনীয় ও মন্দ বিদ'আত কেবল তাহাই, যাহা

সুন্নতের খেলাফ। কিন্তু সকলের সহিত সদ্ব্যবহার এবং মানুষের মনে আনন্দ প্রদান শরীয়াতে প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট কার্য। প্রত্যেক জাতির রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। তাহাদের সহিত তাহাদের আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করা অশিষ্টতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

خَالِقِ النَّاسِ بِاَخْلَاقِهِمْ-

মানুষের সহিত তাহাদের আচার ব্যবহার অনুযায়ী ব্যবহার কর।

সুফীগণের কার্য-কলাপের অনুকরণ করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অন্যথায় তাঁহারা মনঃক্ষুণ্ন হন। কাজেই তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া চলাও শিষ্টাচার বটে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনে তাঁহার সম্মানার্থে সাহাবায়ে কিরাম (রা) দণ্ডায়মান হইতেন না, কারণ তিনি ইহা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু যে স্থানে সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হওয়ার রীতি প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং দণ্ডায়মান না হইলে লোকে মনঃক্ষুণ্ন ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সে স্থানে তাহাদের মন সন্তুষ্ট করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া উত্তম। কারণ, শিষ্টাচার প্রদর্শনের রীতি আরবদেশে একরূপ এবং অন্য দেশে অন্যরূপ। প্রকৃত ব্যাপারে আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন।

নবম অধ্যায়

সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ

সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ ধর্মের মূল বিষয়সমূহের অন্যতম। আল্লাহ্ সকল নবী-রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছেন। এই মূল বিষয় বিলুপ্ত ও মানব -সমাজ হইতে উঠিয়া গেলে শরীয়তের সমস্ত বিধি-নিষেধ রহিত হইয়া যাইবে। আমি এই বিষয় তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ ওয়াজিব ঃ সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব। উপযুক্ত সময়ে যে ব্যক্তি বিনাকারণে উহা বর্জন করে, সে পাপী হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

তোমাদের মধ্যে একদল লোকের পেশাই এই হওয়া উচিত যে, তাহারা লোকদিগকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে এবং নেককার্যে আদেশ করিবে ও পাপকার্যে প্রতিরোধ করিবে।

এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, এই কার্য ফরয। কিন্তু ইহা ফরযে কিফায়া। কিছু সংখ্যক লোক এই কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলেই যথেষ্ট। কিছুসংখ্যক লোকেও ইহা না করিলে সকল মানুষই পাপী হইবে। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

তাঁহাদিগকে আমি জগতে প্রভুত্ব প্রদান করিলে তাহারা নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে এবং নেক কার্যে আদেশ করিবে ও পাপ কার্য প্রতিরোধ করিবে।

এই আয়াতে সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধকে আল্লাহ্ তা'আলা নামায ও যাকাতের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে দীনদার লোকগণের প্রশংসা করিয়াছেন।

হাদীসের সতর্কবাণী ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা নেক কার্যে আদেশ করিতে থাক। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতর ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তোমাদের উপর চাপাইয়া দিবেন। তখন তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতর ব্যক্তির দু'আও আল্লাহ্ কবূল করিবেন না।

হযরত আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে কওমের মধ্যে পাপ হইতে থাকে এবং লোকে ইহা নিবারণ করে না, আল্লাহ্ সেখানে অচিরেই আযাব নাযিল করিয়া থাকেন যাহাতে সকলে নিপতিত হয়। তিনি বলেন ঃ জিহাদের তুলনায় তোমাদের সমুদয় নেককার্য মহাসমুদ্রে একবিন্দু পানি সদৃশ এবং সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধের তুলনায় জিহাদ মহাসমুদ্রে একবিন্দু পানিসদৃশ। তিনি বলেন ঃ মানুষ যত প্রকার কথা বলে তন্মধ্যে সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ এবং আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য সমস্তই তাহার অনিষ্ট করিয়া থাকে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র খাস বান্দাগণের মধ্যে নিষ্পাপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা জনসাধারণের দরুন শাস্তি দিবেন না। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিগণ যখন মন্দকার্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখেন এবং বারণ করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও নীরব থাকেন (প্রতিরোধ করেন না), তখন তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।

তিনি বলেন ঃ যে স্থানে অত্যাচারপূর্বক লোকে কাহাকেও বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে অথবা মারপিট করিতেছে, সেখানে দাঁড়াইও না। কারণ যে ব্যক্তি (অত্যাচার) দর্শন করে এবং প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করে না, তাহার উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। তিনি বলেন ঃ যে স্থানে অন্যায় আচরণ হয়, সেখানে উপবেশন করা এবং প্রতিকার না করা দুরস্ত নহে। কারণ, এইরূপ প্রতিকার তাহার আয়ু ও জীবিকা কমাইবে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, অত্যাচারীদের গৃহে অথবা যে স্থানে শরীয়ত বিরুদ্ধ অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হয়, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে বিনাকারণে তথায় যাওয়া দুরস্ত নহে। এইজন্যই প্রাচীনকালে বুযর্গগণ বাজার ও রাস্তাঘাট অন্যায় ও অত্যাচারমুক্ত নহে বলিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কাহারও সম্মুখে যদি কোন পাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং সে তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হয় তবে যেন সে তথায় উপস্থিতই ছিল না ও তাহার অনুপস্থিতিতে সেই পাপ অনুষ্ঠিত হইল। আর সে যদি সেই পাপ কার্যে সন্তুষ্ট থাকে তবে যেন তাহার

সম্মুখে পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক রাসূলেরই হাওয়ারী (আসহাব) ছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহারা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসারে কার্য করিতেন। তাঁহাদের পর এমন লোক জন্মগ্রহণ করে যাহারা মিম্বারে আরোহণ করিয়া তো সুন্দর সুন্দর উপদেশ প্রদান করে কিন্তু (নিজেরা) মন্দ কার্য করিয়া থাকে। তাহাদের সহিত জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য ও ফরয। হাতে জিহাদ করিতে না পারিলে রসনা দ্বারাই করিবে, রসনা দ্বারা করিতে না পারিলে অন্তর দ্বারাই করিবে (অর্থাৎ সে পাপকে অন্তরে ঘৃণা করিবে)। ইহা হইতে কম হইলে ঈমান থাকিবে না।

হুযূর (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এক ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন ঃ অমুক বস্তি উলটাইয়া দাও। ফেরেশতা নিবেদন করিল ঃ ইয়া আল্লাহ্! সে স্থানে অমুক ব্যক্তি রহিয়াছেন। তিনি কখনই এক নিমেষের জন্যও কোন পাপ করেন নাই। কিরূপে সেই বস্তি উলটাইয়া দিব? আদেশ হইল ঃ তুমি তা উলটাইয়া দাও। কারণ, অপরের পাপানুষ্ঠান দেখিয়া সে কখনও তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, এক শহরের অধিবাসীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা আযাব প্রেরণ করেন। তাহাদের মধ্যে আঠার হাজার লোক এমন ছিল যাহাদের আমল পয়গম্বরগণের ন্যায় ছিল। লোকে নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! কেন তবে তাহাদের উপর আযাব আসিল? হুযূর (সা) বলেন, এই কারণে যে, (পাপ কার্য করিতে দেখিয়া) আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহারা অপরের উপর ক্রুদ্ধ হইত না ও তাহাদিগকে বারণ করিত না। হযরত আবূ উবায়দাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, লোকে রাসূলাল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ (সা)! শহীদগণ হইতে উৎকৃষ্ট কোন্ ব্যক্তি? হুযূর (সা) উত্তরে বলিলেন যে, স্বেচ্ছাচারী বাদশাহের অন্যায় আচরণ দেখিয়া যে ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত ইহাতে নিহত হয়, সে ব্যক্তি (শহীদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট); নিহত না হইলেও (তাহার পাপ লিপিবদ্ধ করিতে) কলম চলিবে না যদিও সে দীর্ঘজীবী হউক।

হাদীস শরীফে উক্তি আছে, হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র হযরত ইউশা (আ)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা ওহী অবতীর্ণ করিলেন ঃ তোমার কওমের একলক্ষ লোক আমি ধ্বংস করিয়া ফেলিব; তন্মধ্যে চল্লিশ হাজার নেককার ও ষাট হাজার বদকার। তিনি নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! নেককারদিগকে কেন ধ্বংস করিবেন? উত্তর আসিল ঃ এইজন্য যে, তাহারা অপরের (পাপীদের) সহিত শত্রুতা পোষণ করে নাই; তাহাদের সহিত পানাহার, উঠা-বসা ও আদান-প্রদানে বিরত থাকে নাই।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অসৎকর্মে প্রতিরোধের শর্ত ঃ পাপের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সকল মুসলমানের উপরই ফরয। অতএব, উহার জ্ঞানার্জন ও শর্তাবলী অবগত হওয়াও ওয়াজিব। কারণ, যে কর্তব্যকর্মের শর্তাবলী জানা থাকে না তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করাও সম্ভব হয় না। প্রতিরোধ কার্য চারটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যথা ঃ (১) প্রতিরোধকারী, (২) সেই পাপ যাহা প্রতিরোধ করিতে হইবে, (৩) সেই ব্যক্তি যাহার পাপ প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং (৪) প্রতিরোধ পদ্ধতি।

প্রথম বিষয়; প্রতিরোধকারী ঃ প্রাপ্তবয়স্ক বোধমান মুসলমান হওয়াই ইহার একমাত্র শর্ত। কারণ, পাপ প্রতিরোধ করা ধর্ম কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব। অতএব, যে ব্যক্তি ধর্মীয় গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত সেই পাপ প্রতিরোধের উপযোগী। প্রতিরোধকারী নিষ্পাপ ও বাদশাহের পক্ষ হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক কিনা, এ সম্বন্ধে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের মতে ইহা শর্ত নহে। কারণ, পাপ নিবারণকারী নিষ্পাপ হওয়া কিরূপে শর্ত হইবে? কেননা, কেবল নিষ্পাপ ব্যক্তিই পাপ নিবারণ কার্যের একমাত্র উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে পাপকার্যে প্রতিরোধ কখনও হইতে পারে না। কারণ, কেহই নিষ্পাপ নহে।

হযরত সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (রা) বলেন ঃ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হওয়ার পর পাপে প্রতিরোধ করিলে প্রতিরোধের কোন উপায়ই দৃষ্টিগোচর হইবে না। হযরত হাসান বসরী (র)-র নিকট লোকে বলিল যে, এক ব্যক্তি বলিতেছে ঃ নিজকে সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত করিয়া না লওয়া পর্যন্ত অপরকে পাপকার্য হইতে বারণ করা উচিত নহে। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ শয়তান তাহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছে যেন পাপ নিবারণের পথই রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

এ সম্পর্কে যথার্থ কথা ও সুবিচার এই যে, পাপ নিবারণ দুই উপায়ে হইয়া থাকে। প্রথম, উপদেশ প্রদান ও বক্তৃতা দ্বারা। ইহার অবস্থা এই, যে ব্যক্তি নিজেই পাপকার্য করিয়া বেড়ায়, সে যদি অপরকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলে ঃ এই কার্য করিও না; তবে এইরূপ উপদেশে নিজকে হাস্যম্পদ করা ব্যতীত আর কিছুই ফল হইবে না। এইরূপ উপদেশ অপরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিবে না। প্রকাশ্যে পাপাচারী ফাসিক যেন এইরূপ উপদেশ প্রদান না করে। বরং সে যদি বুঝে যে, লোকে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবে না, অধিকন্তু তাহাকে উপহাস করিবে, এমতাবস্থায় অপরকে উপদেশ দিলে সে নিজেই পাপী হইবে। কারণ, ফাসিক লোকের ধর্মোপদেশে মানুষের মন হইতে ওয়ায-নসীহতের মাধুর্য ও শরীয়তের মর্যাদা বিদূরীত হয়। এইজন্যই প্রকাশ্যে পাপাচারী আলিমের ওয়াযে লোকের ক্ষতি হইয়া থাকে এবং এইরূপ আলিমও পাপী হইয়া থাকে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মি'রাজের

রাত্রে একদল লোককে দেখিলাম যাহাদের ওষ্ঠ আগুনের কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ তোমরা কে? তাহারা বলিল ঃ আমরা অপরকে সৎকর্মের আদেশ করিতাম অথচ আমরা নিজে তাহা করিতাম না। অপরকে মন্দকার্য হইতে বারণ করিতাম; কিন্তু আমরা নিজে সেই কাজ হইতে বিরত থাকিতাম না।

হযরত ঈসা (আ)-এর উপর আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন ঃ হে মরিয়মের পুত্র! প্রথমে নিজকে উপদেশ প্রদান কর। তুমি নিজে উপদেশ মানিয়া চলিলে অপরকে উপদেশ দাও। অন্যথায় আমার নিকট লজ্জিত থাক।

পাপকার্য প্রতিরোধের দ্বিতীয় পন্থা হইল হাতে ও বল-প্রয়োগে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখা। যেমন, কোথাও মদ দেখামাত্র ফেলিয়া দেওয়া, বীণা, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সুর শ্রবণমাত্র উহা কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা: কেহ ঝগড়া-বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে বল-প্রয়োগে তাহাকে নিবৃত্ত করা। এই শ্রেণীর মন্দকার্যের নিষেধ ফাসিক ব্যক্তিও করিতে পারে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দুইটি কার্য ওয়াজিব। যথাঃ (১) নিজে মন্দ কাজ না করা এবং (২) অপরকে মন্দ কাজ করিতে না দেওয়া। ইহাদের একটি পালনে ত্রুটি হইলে অপরটি পালনেও ত্রুটি করার কি কারণ থাকিতে পারে?

এ স্থলে কেহ যদি প্রতিবাদ করিয়া বলে, যে ব্যক্তি নিজে রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, সে অন্য লোককে এই পোশাক পরিধান করিতে নিষেধ করিয়া তাহার দেহ হইতে রেশমী বস্ত্র ছিনাইয়া লওয়া অথবা নিজে মদ পানে অভ্যস্ত থাকিয়া অপর লোককে উহাতে বাধা প্রদানপূর্বক তাহার হস্ত হইতে মদের পাত্র কাড়িয়া লইয়া ঢালিয়া ফেলা মন্দ ও অশোভন, তবে তাহার উত্তরে এই মন্দকার্য ও মূলত ঃ শরীয়ত বিরুদ্ধ কার্য, এক কথা নহে। অপরকে রেশমী বস্ত্র পরিধান ও মদ্যপানে বাধা প্রধান মূলত ঃ শরীয়ত বিরুদ্ধ কার্য নহে। অপরকে রেশমী বস্ত্র পরিধান ও মধ্যপানে বাধা প্রদান মূলতঃ শরীয়ত বিরুদ্ধ কার্য নহে। তবে এ ক্ষেত্রে সে নিজেও এই সকল মন্দকার্য হইতে বিরত না থাকিয়া নিজ কর্তব্যে অবহেলা করার দরুন অপরকে নিষেধ করায় মন্দ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; মূলত ঃ শরীয়ত বিরুদ্ধ ও মন্দ কার্য বলিয়া নহে। কাজেই স্বয়ং পাপ হইতে বিরত না থাকিয়াও অপরকে পাপকার্যে বাধা প্রদান করা মন্দ ও অশোভন হইতে পারে না। কারণ, কোন ব্যক্তি যদি রোযা রাখে অথচ নামায পড়ে না, তবে তাহার রোযা রাখাকে এইজন্য মন্দ বলিয়া বিবেচনা করা হয় যে, সে রোযা রাখিতেছে অথচ নামাযের ন্যায় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক ইবাদত সে ত্যাগ করিতেছে। রোযা রাখা মূলত ঃ শরীয়ত বিরোধী কাজ বলিয়া তাহার রোযা রাখা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; বরং এইজন্যই যে, নামায অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং সে ইহা ত্যাগ করিতেছে। এইরূপে স্বয়ং শরীয়তের

নির্দেশ পালন করাও অপরকে উপদেশ প্রদান অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক। কিন্তু উভয় কাজই ওয়াজিব। একটি অপরটির শর্ত নহে যে, একটি পালন না করিলে অপরটিও বর্জন করিতে হইবে। একটি অপরটির শর্ত হইলে ব্যাপার এইরূপ হইয়া দাঁড়াইত যে, কাহাকেও মদ্যপানে বাধা প্রদান করা তখনই ওয়াজিব যখন বাধা প্রদানকারী স্বয়ং মদ্যপান করে না; কিন্তু সে যখন নিজে মদ্যপান করিল তখন মদ্যপানে অপরকে বাধাপ্রদান করার ওয়াজিবের দায়িত্ব হইতে সে অব্যাহতি পাইল। অথচ ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পাপ কার্য দমনের জন্য বাদশাহের পক্ষ হইতে অনুমতি ও নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়াও শর্ত নহে। এইজন্যই প্রাচীন বুযর্গগণ স্বয়ং বাদশাহ ও খলীফাগণকে পাপানুষ্ঠান হইতে বারণ করিতেন। ইহার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। পাপ প্রতিরোধের স্তরসমূহ অবগত হইলেই ইহার জন্য বাদশাহের অনুমতি ও নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া শর্ত কিনা, যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে।

পাপ প্রতিরোধের চারিটি স্তরঃ প্রথম স্তর ঃ উপদেশ প্রদান ও আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করা। ইহা সকল মুসলমানের উপরই ওয়াজিব। ইহাতে বাদশাহের অনুমতির কি প্রয়োজন? বরং বাদশাহকে উপদেশ প্রদান এবং আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন করা বড় ইবাদত।

দ্বিতীয় স্তর ঃ পাপাচারীকে তিরস্কার করা ও তৎপ্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা যথাঃ হে ফাসিক, হে অত্যাচারী, ওরে নির্বোধ, ওহে মূর্খ, তোদের কি আল্লাহ্র ভয় নাই যে এমন পাপ কার্য করিতেছিস? ফাসিক সম্বন্ধে এ সমস্ত কথাই সত্য। সত্য কথা বলিতে বাদশাহের অনুমতির কি প্রয়োজন?

তৃতীয় স্তর ঃ বল প্রয়োগে বারণ করা। যেমন, মদ্য ঢালিয়া ফেলা, বাদ্য-যন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা, কাহারও মাথা হইতে রেশমী পাগড়ী টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া। এই সমস্ত কার্য ইবাদতের ন্যায়ই ওয়াজিব। প্রথম অনুচ্ছেদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাদশাহের বিনা অনুমতিতেই শরীয়ত প্রত্যেক মুসলমানকে পাপ কার্য নিবারণের অনুমতি প্রদান করিয়াছে।

চতুর্থ স্তর ঃ মারিয়া-পিটিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া। এমতাবস্থায় পাপাচারী হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং প্রতিরোধকারীও স্বীয় বলবৃদ্ধির জন্য নিজের দলের লোকদিগকে একত্রিত করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে পারে। বাদশাহের অনুমতি না লইয়া মারিয়া-পিটিয়া বল প্রয়োগে পাপ নিবারণ করিতে গেলে এইরূপে ভীষণ বিবাদ -বিসম্বাদ বাধিয়া যাইতে পারে। সুতরাং বাদশাহের অনুমতি ব্যতীত এই পদ্ধতিতে পাপ নিবারণে প্রবৃত্ত না হওয়াই উত্তম।

ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই যে, পাপ নিবারণের উপরিউক্ত স্তরগুলি পরিবর্তিত হইতে পারে। যেমন, পুত্র পিতাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলে নম্রতা ও

ধীরতার সহিত উপদেশ দেওয়া উচিত। নির্বোধ, মুর্খ ইত্যাদি কটুবাক্য প্রয়োগ করতঃ পিতাকে নিজের প্রতি রুষ্ট করিয়া তোলা অবশ্যই অসঙ্গত। পিতা কাফির হইলেও তাহাকে হত্যা করা এবং পুত্র জল্লাদের পদে নিযুক্ত থাকিলেও রাষ্ট্র কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পিতাকে বধ করা পুত্রের জন্য সঙ্গত নহে কিন্তু পিতার মদ ফেলিয়া দেওয়া, তাহার পরিধান হইতে রেশমী বস্ত্র ছিনাইয়া লওয়া, পিতা কাহারও নিকট হইতে হারাম উপায়ে কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা কাড়িয়া লইয়া প্রকৃত মালিককে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া, রৌপ্যের বাসন-পত্র ব্যবহার করিতে থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা, পিতার গৃহের দেওয়ালে কোন ছবি থাকিলে তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলা এই সমস্ত কার্যে বাধা প্রদানে পুত্র সত্যপক্ষে রহিয়াছে এবং ইহাতে পিতার ক্রুদ্ধ হওয়া অন্যায়। এই সকল কার্যে পিতার ব্যক্তিত্বের প্রতি কোনরূপ অমর্যাদা প্রকাশ করা হয় না, যেমন, তাহাকে মারিলে ও গালি দিলে ব্যক্তিত্বের অমর্যাদা করা হইয়া থাকে। কেহ হয়ত বলিতে পারে যে, পিতা রুষ্ট হইলে তাহাকে পাপ হইতে বারণ করা পূত্রের উচিত নহে; যেমন হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে পুত্রের জন্য নীরব থাকা এবং উপদেশ প্রদান না করাই উচিত। পিতাকে পাপ হইতে বারণ করিতে পুত্রের যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত; ভৃত্য স্বীয় প্রভুকে, স্ত্রী আপন স্বামীকে এবং প্রজা বাদশাহকে বারণ করিতে তদ্রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। কারণ, তাহাদের সকলের হকই গুরুতর। কিন্তু শিক্ষককে পাপ কার্য হইতে বারণ করা ছাত্রের পক্ষে খুব সহজ। কেননা, ধর্মের কারণেই শিক্ষকের মর্যাদা রহিয়াছে। শিক্ষকের নিকট ছাত্র যে শিক্ষালাভ করিয়াছে এতদনুযায়ী সে আমল করিতে থাকিলে শিক্ষক বুঝিতে পারিবেন যে, স্বীয় ইলম অনুযায়ী আমল না করিলে তাঁহার মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ যে পাপ প্রতিরোধ করিতে হইবে ঃ যে কার্য মন্দ ও পাপী ব্যক্তির মধ্যে এখনও বিদ্যমান এবং যাহা গোপন অনুসন্ধান ব্যতীত প্রকাশ্যে জানা যায় ও মন্দ বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা আছে, উহা হইতেই প্রতিরোধ করিতে হইবে। অতএব, ইহার চারিটি শর্ত ঃ

প্রথম শর্ত ঃ কার্যটি মন্দ হওয়া। যদিও ইহা পাপের কার্য না হউক অথবা ক্ষুদ্র পাপ হউক। যেমন, উম্মাদ কিংবা নাবালেগ ব্যক্তিকে পশুর সহিত রমণ কার্যে প্রবৃত্ত দেখিলে যদিও উম্মাদ নাবালেগ হওয়ার দরুন তাহাদের পাপ ধর্তব্য নহে, তথাপি তাহাদিগকে বারণ করিতে হইবে। কারণ, কার্যটি মূলত ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে অতিশয় মন্দ। এইরূপে কোন উম্মত ব্যক্তিকে মদ্যপান করিতে দেখিলে অথবা কোন অল্প বয়স্ক বালককে কাহারও মাল নষ্ট করিতে দেখিলে নিষেধ ও দমন করিতে হইবে। পাপের

কার্য ক্ষুদ্র পাপের হইলেও অবশ্যই প্রতিরোধ করিতে হইবে। যেমন- গোসলখানায় লজ্জাস্থান অনাবৃত করা ও স্ত্রীলোকদিগকে দেখান এবং নির্জন স্থানে বেগানা স্ত্রীলোকের সহিত দাঁড়াইয়া থাকা, স্বর্ণের আংটি ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করা, রৌপ্য-পাত্রে পানি পান করা; এইরূপ সকল পাপ দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র নিবারণ করা কর্তব্য।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ পাপ-কার্যটি তখনও বিদ্যমান থাকা। এক ব্যক্তি মদ্যপান শেষ করিয়াছে এমতাবস্থায় তাহাকে উপদেশ প্রদান ব্যতীত কোনরূপ শাস্তি দেওয়া চলে না। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া সরকারের কর্তব্য। তদ্রূপ কেহ অদ্য রাত্রে মদ্যপান করিবে বলিয়া সংকল্প করিলে তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়া উপদেশ দিবে। হয়ত সে ইহা হইতে বিরত থাকিতে পারে। সে পান করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে তাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা দুরস্ত নহে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে নির্জনে বেগানা স্ত্রীলোকের নিকটে উপবিষ্ট দেখিলে ব্যভিচার না করিয়া থাকিলেও তাহাকে শাসন করা চলে। কারণ, পরনারীর সহিত নির্জনে মিলিত হওয়াই গুরুতর পাপ। এমনকি, গোসলখানায় সমাগত নারীদিগকে দেখিবার উদ্দেশ্যে ইহার দ্বারে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকেও শাসন করা কর্তব্য। কারণ, এইরূপে দাঁড়াইয়া থাকাই পাপ।

তৃতীয় শর্ত ঃ গোপন অনুসন্ধান ব্যতীত প্রকাশ্যভাবে পাপটি জানা থাকা। অপরের পাপ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান উচিত নহে। গৃহে প্রবেশপূর্বক যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করিয়া ফেলে তাহার অনুমতি ব্যতীত সেই গৃহে প্রবেশ করা এবং তুমি কি করিতেছ? বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত নহে। কাহারও দরজায় ও ছাদে কান লাগাইয়া ভিতরের শব্দ শুনিবার চেষ্টা করাও দুরস্ত নহে; বরং যে কাজ আল্লাহ্ গোপন রাখিয়াছেন তাহা গোপন রাখাই উচিত। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ও মাতালদিগের হট্টগোল বাহির হইতে শুনিতে পাইলে অনুমতি ব্যতীতই ভিতরে প্রবেশ করত ঃ উক্ত পাপকার্য প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। কোন ফাসিক ব্যক্তিকে বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া কোন জিনিস লইয়া যাইতে দেখা গেলে তাহা মদের বোতল হইলে তাহাকে 'বস্ত্র সরাও, দেখি কি আছে।' এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। এইরূপ করিলে অপরের দোষ অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু যদি এইরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তাহা মদের বোতল না হইয়া অন্য কোন কিছু হইতে পারে তবে দেখিয়াও না দেখার মত থাকিবে। কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া গেলে ইহা কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দেওয়া দুরস্ত আছে। মিহি বস্ত্র দ্বারা আবৃত কোন বৃহদাকার বাদ্যযন্ত্র কাহারও নিকট থাকিলে (ইহার আকৃতি যদি বাহির হইতে দেখা যায় তবে) উহা ছিনাইয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা বৈধ। কিন্তু এইরূপ

মনে করা যদি সম্ভব হয় যে, উহা অন্য কিছু হইতে পারে, তবে এমন ভাব ধারণ করিবে যেন তুমি কিছু টেরই পাও নাই।

হযরত উমর (রা)-এর এক বিখ্যাত ঘটনা এই যে, এক রাত্রে বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনিয়া প্রাচীর উলঙ্ঘনপূর্বক এক গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলার সহিত মদ্য পান রত আছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের উদ্যত হইয়াছিলেন। 'সংসর্গ' অধ্যায় এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত উমর (রা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ বিচারক স্বীয় চক্ষে কাহাকেও মন্দ কার্য করিতে দেখিলে তিনি তাহাকে শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তি দিতে পারেন কিনা? কেহ কেহ মত প্রকাশ করিলেন যে, দণ্ড প্রদান করা সঙ্গত। কিন্তু হযরত আলী (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহু তা'আলা দণ্ড প্রদানকে দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছেন। একজনের দর্শন যথেষ্ট হইবে না। সুতরাং হযরত আলী (রা) মতে বিচারক শুধু নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ড প্রদান করিতে পারেন না; বরং উহা গোপন রাখা বিচারকের উপর ওয়াজিব।

চতুর্থ শর্ত ঃ কার্যটি মন্দ বলিয়া নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত থাকা। অনুমান এবং ইজতিহাদ-উদ্ভাবনা দ্বারা মন্দ বলিয়া জানিলে দণ্ড প্রদান চলিবে না। হানাফী মাযহাবের লোক যখন অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে কোন মেয়ের বিবাহ দেয় কিংবা প্রতিবেশী হইতে অগ্রহ-ক্রয়ের অধিকার গ্রহণ করে অথবা এই প্রকার অপর কোন কার্য তাহাদের মাযহাবের বিধানমতে করিতে থাকে, তখন তদ্রূপ কার্যে প্রতিবাদ করা শাফিঈ মাযহাবের লোকগণের জন্য দুরস্ত নহে। কিন্তু শাফিঈ মাযহাবের কেহ অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে মেয়ে বিবাহ দিলে কিংবা নবীয (খোরমা ভিজান পঁচা পানি) পান করে, তবে তাহাকে নিষেধ করা যাইবে। কারণ, স্বীয় মাযহাবের ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করা কাহারও মতে দুরস্ত নহে।

কোন কোন আলিম বলেন ঃ মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি যে সমস্ত কার্য সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও নিশ্চিতরূপে হারাম বলিয়া অবধারিত রহিয়াছে, ইজতিহাদ দ্বারা হারাম বলিয়া নির্ধারিত হয় নাই, কেবল সেই সমস্ত পাপ কার্য প্রতিরোধ করা চলে। তাঁহাদের এই উক্তি ঠিক নহে। কারণ, আলিমগণের সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, কেহ স্বীয় ইজতিহাদ কিংবা নিজ মাযহাবের ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করিলে সে পাপী হইবে সুতরাং যাহা স্বীয় ইজতিহাদ কিংবা নিজ ইমামের বিরোধী, তাহা বাস্তবিকই হারাম। যেমন, প্রবাসে কেহ ইজতিহাদের দ্বারা কোন

একদিকেই কিবলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়ার পর ইহার বিপরীত দিকে ফিরিয়া নামায পড়িলে সে পাপী হইবে, যদিও অপর লোক তাহাকে দেখিয়া মনে করে যে, সে ঠিক কিবলামুখী হইয়াই নামায পড়িতেছে।

লোকে যে বলিয়া থাকে, 'যাহার যে-ইমামের মাযহার মানিয়া চলিতে ইচ্ছা হয়, সে সেই মাযহাবই অবলম্বন করিতে পারে' ইহা তাহাদের বেহুদা উক্তি ও বিশ্বাসযোগ্য নহে। বরং প্রত্যেকের নিজের বিবেক অনুযায়ী কার্য করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার বিবেচনায় হযরত ইমাম শাফিঈ (র) উত্তম হইলে প্রবৃত্তির তাড়না ব্যতীত অন্য কোন কারণেই সে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ দেহধারী, কুরআন শরীফ সৃষ্ট বস্তু, আল্লাহ্র দর্শন-লাভ অসম্ভব ও এবংবিধ বাজে প্রলাপ উক্তি করিয়া থাকে, এমন বিদ'আতীদিগকে দমন করা উচিত। কারণ, ইহা সুনিশ্চিত যে, বিদ'আতী সম্প্রদায় ভুলিয়া রহিয়াছে। মালিকী ও হানাফী মতাবলম্বী লোকদের কার্য শাফিঈ মাযহাবের বিরোধী হইলেও শাফিঈ মতাবলম্বী লোকদের পক্ষে উক্ত মাযহাবদ্বয়ের লোকদের কার্যাবলী দমন করা উচিত নহে। কেননা, ফেকাহ্শাস্ত্রে বিধানসমূহে মতভেদ হইলেও কোনটি ভুল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। আবার বিদ'আতী সম্প্রদায়ের কার্যাবলী সেই শহরেই দমন করা চলিবে যেখানে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য এবং সুন্নত ওয়াল জামায়াতের লোকের সংখ্যা অধিক। কিন্তু কোন স্থানে বিদ'আতীর সংখ্যা যদি এত অধিক হয় যে, তুমি তাহাদিগকে দমন করিতে উদ্যত হইলে তাহারাও তোমাদিগকেও দমন করিতে সচেষ্ট হয় এবং ফলে বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়, তবে বাদশাহের অনুমতি ও ক্ষমতা ব্যতীত তাহাদিগকে দমনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

তৃতীয় বিষয়, যাহার পাপ প্রতিরোধ করিতে হইবে ঃ ইহার শর্ত এই যে, সেই ব্যক্তি বোধসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক (মুকাল্লাফ) হইতে হইবে যেন সে কোন মন্দকার্য করিলে ইহার পাপ তাহার উপর বর্তে এবং প্রতিরোধকারীর পক্ষে সে ব্যক্তি এমন মর্যাদাসম্পন্ন না হয় যাহা শাসন-কার্যে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, যেমন পিতা। কারণ পিতার মর্যাদা তাহাকে সতর্ক করিতে, শাসন করিতে এবং অপমানজনক ব্যবহার দ্বারা প্রতিরোধ করিতে পুত্রকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু প্রতিরোধকারী উম্মাদ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী দমন করিতে পারে-যেমন পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই নিবারণ কার্যকে পাপ দমন বলা চলে না। বরং ইহা এইরূপ যে, আমরা যখন কোন পশুকে মুসলমানের শস্যক্ষেত্রে শস্য খাইতে দেখি তখন সেই মুসলমানের ধন রক্ষার্থে আমরা সেই পশুকে তাড়াইয়া দিয়া থাকি। ইহা আমাদের উপর ওয়াজিব নহে। কিন্তু

পশুটিকে তাড়াইয়া দেওয়া সহজসাধ্য হইলে এবং ইহাতে কোন ক্ষতি না হইলে ইসলামের দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আমাদের প্রতি ওয়াজিব। যেমন, কোন মুসলমানের ধন বিনষ্ট হইতেছে এবং তুমি স্বয়ং উহার সাক্ষী ও বিচারালয়ে গমনের পথও দূর নহে। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান হিসাবে তোমার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিচারালয়ে গমনপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করা তোমার প্রতি ওয়াজিব নহে। কোন বোধমান ও স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তি কাহারও ধন বিনষ্ট করিলে ইহা অত্যাচার ও পাপ। কষ্ট হইলেও এইরূপ কার্য প্রতেরোধ করা ওয়াজিব। কারণ, গর্হিত কার্য ও পাপ হইতে নিজে বিরত থাকা অথবা অপরকে উহা হইতে প্রতিরোধ করা দুঃখ-কষ্ট ব্যতীত সম্ভব হয় না। অতএব, এইরূপ ক্ষেত্রে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক, কিন্তু দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে তদ্রূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া পাপ দমনে প্রবৃত্ত হওয়া ওয়াজিব নহে। আর পাপ নিবারণ ও শাসনের উদ্দেশ্য হইল ইসলামী রীতি-নীতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা। এইজন্যই উহাতে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা ওয়াজিব। যেমন, যদি কোথাও হতে অধিক পরিমাণে মদ থাকে যে, উহা ঢালিয়া ফেলিতে খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইতে হইবে, তবুও উহা ফেলিয়া দেওয়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কাহারও শস্যক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক ছাগল প্রবেশ করিয়া যদি শস্য নষ্ট করিতে থাকে এবং এইগুলি তাড়াইতে গেলে তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড় এবং উহাতে তোমার মূল্যবান সময়ও বিনষ্ট হয়, তবে এইরূপ কষ্ট সহ্য করা তোমার জন্য ওয়াজিব নহে। কারণ, পরের হকের ন্যায় নিজের হক রক্ষা করাও তোমার উপর ওয়াজিব। এস্থলে সময় তোমার পক্ষে। সুতরাং অপরের ধন রক্ষা করিতে যাইয়া তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করা তোমার প্রতি ওয়াজিব নহে। কিন্তু ধর্মের জন্য সময় ব্যয় ও পাপ প্রতিরোধ করা ওয়াজিব।

ক্ষমতা ও অবস্থাভেদে প্রতিরোধের ব্যবস্থা ঃ পাপ প্রতিরোধ কার্যে সর্ববিধ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা ওয়াজিব নহে। এ সম্বন্ধে ও বিস্তারিত আলোচনা দরকার। কেহ পাপ প্রতিরোধে অক্ষম হইলে সে ক্ষমাহ ও অপারগ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং এমতাবস্থায় সেই পাপের প্রতি আন্তরিক অসম্মতি ও ঘৃনাই কেবল তাহার উপর ওয়াজিব। কিন্তু তুমি যদি অক্ষম না হও অথচ এইরূপ আশংকা হয় যে, পাপ দমন করিতে গেলে পাপী তোমাকে প্রহার করিবে এবং তোমার উপদেশ নিষ্ফল হইবে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে চতুর্বিধ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

প্রথম ঃ যদি নিশ্চিত জান যে, পাপী ব্যক্তি তোমাকে প্রহার করিবে এবং পাপ হইতে সে বিরত হইবে না, তবে প্রতিরোধ তোমার প্রতি ওয়াজিব নহে। কিন্তু মুখে

কিংবা হাতে বাধা প্রদান করা দুরস্ত আছে। পাপী তোমাকে মারধর করিলে ধৈর্য ধারণ করিবে। ইহাতে সওয়াব পাইবে। হাদীস শরীফে উক্তি আছে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে পাপ হইতে প্রতিরোধ করিতে গিয়া নিহত হয়, তাহা অপেক্ষা কোন শহীদই উত্তম নহে।

দ্বিতীয় ঃ তুমি পাপ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ এবং ইহাতে কোন ভয়েরও কারণ নাই; পাপ প্রতিরোধে তোমার সর্ববিধ ক্ষমতা রহিয়াছে, এমতাবস্থায় প্রতিরোধ না করিলে পাপী হইবে।

তৃতীয় ঃ তুমি প্রতিরোধ করিলে মানুষ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় না এবং তাহারা তোমাকে প্রহারও করিতে পারে না, এমতাবস্থায় ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে মুখে উপদেশ প্রদানপূর্বক পাপ নিবারণ তোমার উপর ওয়াজিব। কারণ, এইরূপ স্থলে পাপাচারে আন্তরিক অসম্মতি ও মনে মনে ঘৃণা যেমন দুঃসাধ্য নহে, তদ্রূপ মুখে প্রতিরোধ করাও দুঃসাধ্য নহে।

চতুর্থ ঃ তুমি পাপ দমন করিতে পার বটে; কিন্তু পাপীরা তোমাকে মারপিট করিবে। যেমন, তুমি মদ্যপাত্রে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে এবং অকস্মাৎ উহা ভাঙ্গিয়া গেল; বাদ্যযন্ত্রে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলে এবং উহাও তদ্রূপ ভাঙ্গিয়া গেল এইরূপ ক্ষেত্রে পাপ দমনে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার প্রতি ওয়াজিব নহে। কিন্তু পাপ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করা উত্তম কার্য।

এ স্থলে যদি কেহ বলে, আল্লাহ্ তো বলিয়াছেন যে,

لَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ–

স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তোমরা নিজকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করিও না।

তবে ইহার উত্তর এই ঃ এই আয়াতের মর্মে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ধন ব্যয় কর যাহাতে ধ্বংস না হও। হযরত বরা ইব্‌ন আযেব (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ পাপ করিয়া মনে করে যে, আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করিবেন। ইহাকেই এ স্থলে নিজকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা বলা হইয়াছে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) এই আয়াতের মর্মে বলেন, পাপ করিয়া তৎপর কোন নেক কার্য করাই নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা।

কোন ব্যক্তি একাকী একদল কাফিরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া জায়েয আছে, যদিও সে তাহাদের হস্তে শহীদ হইয়া যায়। কারণ, এইরূপ আক্রমণে সে নিজকে নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেও ইহা নিষ্ফল নহে। ইহাতে হয়ত সেই মুসলমান ব্যক্তি অন্ততঃ একজন কাফিরকেও হত্যা করিতে

পারে। ফলে কাফিরগণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এবং তাহারা মনে করিতে পারে যে, সমস্ত মুসলমানই এইরূপ সাহসী হইয়া থাকে। কাফিরদের মনে এইরূপ ভীতির সঞ্চার করিতে পারিলেও বিশেষ সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন অন্ধ বা খঞ্জ মুসলমানের জন্য একাকী কাফির দলের উপর আক্রমণ করা দুরস্ত নহে। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে বৃথা নিজকে ধ্বংস করা হয়। এইরূপে যদি এমন ঘটনা হয় যে, পাপ প্রতিরোধ করিতে গেলে পাপীরা তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে অথবা কঠিন যন্ত্রণা দিবে, অথচ তাহারা পাপ কার্য পরিত্যাগ করিবে না; আর তুমি ধর্মব্যাপারে যে কঠোরতা অবলম্বন করিবে তাহাতে কাফিরদের মনোবল ভাঙ্গিবে না এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও সৎকর্মের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে পাপ দমনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ, নিরর্থক ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করাতে কি লাভ?

এই পদ্ধতিতে পাপ প্রতিরোধে দুইটি জটিলতা আছে। যথা ঃ (১) তোমার ভীতি ও নৈরাশ্য হয়ত খারাপ ধারণা ও কাপুরুষতা হইতে উদ্ভূত; (২) প্রতিপক্ষ তোমাকে মারধর করিবে এ আশংকা তোমার নাই; বরং তোমার ধন-সম্পদ ও পদ-মর্যাদা বিনষ্ট হওয়া এবং আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ-কষ্টের আশংকা করিয়া থাক।

প্রথম ঃ জটিলতা সম্বন্ধে কথা এই যে, পাপ দমন করিতে গেলে পাপীরা তোমাকে প্রহার করিবেই, এই আশংকা যদি তোমার প্রবল হয় তবে তুমি অপারগ ও ক্ষমার্হ। কিন্তু সেই আশংকা যদি প্রবল না হয়, কেবল সম্ভাবনা থাকে মাত্র, তবে তুমি পাপ দমনে বিরত থাকিলে মার্জনীয় হইবে না। কারণ, এইরূপ সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। আর যদি পাপ দমন করিতে গেলে পাপীরা তোমাকে প্রহার করিবে কিনা, এ সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র থাকে, তবে আমাদের মতে পাপ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হওয়া নিঃসন্দেহে ওয়াজিব এবং সন্দেহের কারণে ওয়াজিবের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। অন্য কথায় বলা যায় যে, যে ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার ধারণা প্রবল, সে ক্ষেত্রে পাপ প্রতিরোধে অগ্রসর হওয়া ওয়াজিব।

দ্বিতীয় ঃ জটিলতা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পাপ প্রতিরোধ করিতে গেলে যদি তোমার ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, নিজদেহ, আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্য-সেবকগণের ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে কিংবা এইরূপ আশংকা থাকে যে, পাপীরা তোমাকে গালি দিবে অথবা তোমার কোন ধর্মীয় বা পার্থিব অনিষ্ট করিবে, তবে ইহাদের বহু প্রকারভেদ আছে এবং প্রত্যেকটির বিধানও বিভিন্ন প্রকারের হইবে। কিন্তু কেবল নিজের সম্বন্ধে আশংকা থাকিলে উহা দুই প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ এই যে, পাপ প্রতিরোধ করিতে গেলে ভবিষ্যতে তুমি কোন স্বার্থ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। যেমন, শিক্ষককে প্রতিরোধ করিতে গেলে তিনি তোমাকে

শিক্ষাধানে বিরত থাকিবেন। সুতরাং তুমি শিক্ষালাভে বঞ্চিত থাকিবে। চিকিৎসককে প্রতিরোধ করিতে গেলে সে তোমার চিকিৎসায় শৈথিল্য প্রদর্শন করিবে, তুমি যাহার অধীনে চাকরি কর, তাহাকে প্রতিরোধ করিতে গেলে সে তোমার বেতন বন্ধ করিয়া দিবে বা প্রয়োজনের সময় সে তোমাকে সাহায্য করিবে না-এ সকল অবস্থায় পাপ প্রতিরোধে বিরত থাকিলে তুমি ইহার ওয়াজিবের দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইবে না। কারণ, এইগুলি কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট নহে; ভবিষ্যতে কোন প্রকার স্বার্থ হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকামাত্র। কিন্তু উপস্থিত সময়েই যদি তুমি সেই সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাক; যেমন স্বয়ং পীড়িত হইয়া পড়িয়াছ এবং চিকিৎসক রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছে। এখন তাহাকে রেশমী বস্ত্র পরিধানে বাধা প্রদান করিলে সে তোমার চিকিৎসা করিবে না; কিংবা তুমি অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ; আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করত ঃ নীরব থাকার মত ধৈর্যও তোমার নাই এবং মাত্র একজন মানুষ তোমার ভরণ-পোষণ চালাইতেছে; তুমি তাহাকে পাপাচারে প্রতিরোধ করিলে সে তোমার ভরণ-পোষণ বন্ধ করিয়া দিবে; অথবা তুমি কোন দুরাচারের কবলে নিপতিত হইয়াছ এবং মাত্র এক ব্যক্তি তোমার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে; কোন পাপ হইতে এই সাহায্যকারীকে বারণ করিলে সে তোমার সাহায্যে বিরত থাকিবে-এই সমস্ত সাহায্য উপস্থিত সময়ে তোমার একান্ত প্রয়োজন। এই সকল ক্ষেত্রে পাপ দমনে প্রবৃত্ত না হইলে হয়ত আমরা তোমাকে ক্ষমার্হ ও অপারগ বলিয়া গণ্য করিতে পারি। কারণ, এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাহায্য না পাইলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ ক্ষতিতে পতিত হইবে। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত ক্ষতির তারতম্য হইবে। ইহা তোমার ধর্মীয় বিবেচনার সহিত সংশ্লিষ্ট; ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিনা কারণে পাপ দমনে বিরত থাকিবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যে বস্তু তোমার অধিকারে রহিয়াছে তাহা তোমার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িবে। যেমন, তোমার ধন কাড়িয়া নিবে, ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে অথবা দৈহিক শান্তি ও নিরাপত্তা হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে অর্থাৎ মারধর করিবেঃ কিংবা মারধর না করিলেও নগ্ন মস্তকে হাটে-বাজারে এবং রাস্তা-ঘাটে তোমাকে ঘুরাইয়া তোমার মান-মর্যাদার হানি ঘটাইবে, এই সব স্থানে পাপ দমনে বিরত থাকিলে তুমি অপারগ ও ক্ষমার্হ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যদি এমন বিষয়ে তোমার আশংকা থাকে যাহাতে তোমার মনুষ্যত্বের কোন ক্ষতি হয় না; বরং তোমার শান-শওকতের লাঘব ঘটে মাত্রঃ যেমন তোমাকে নগ্নপদে বাজারের উপর দিয়া হাঁটায় এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতে না দেয় অথবা তোমার সম্মুখে কটু ও অশ্লীল উক্তি করে, তবে এই সমস্ত ব্যাপারে মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই সকল কারণে পাপ দমনে বিরত

থাকিলে ওয়াজিবের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে না। সর্বদা গৌরবজনক চাল-চলন বজায় রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে শোভন নহে। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া চলা অবশ্য শরীয়তের কাম্য। কিন্তু যদি এইরূপ আশংকা হয় যে, পাপ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইলে পাপীরা তোমার নিন্দা করিবে কিংবা তোমাকে গালি দিবে, তোমার সহিত শত্রুতা পোষণ করিবে এবং কাজেকর্মে তাহারা তোমার আনুগত্য ও অনুসরণ করিবে না, তবে এই সমস্ত কখনই ওয়াজিব পরিত্যাগের উপযুক্ত কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ, কোন পাপ প্রতিরোধকারীর জন্যই এই সমস্ত আপদ হইতে নিরাপদ থাকিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি এমন আশংকা হয় যে, আগোচরে নিন্দাও করিবে এবং পাপও বৃদ্ধি পাইবে তবে পাপ প্রতিরোধ স্থগিত রাখা দুরস্ত আছে।

কিন্তু পাপ দমনে প্রবৃত্ত হইলে তোমার ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি না হইয়া বরং তোমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের তদ্রূপ ক্ষতির আশংকা করিলে; যেমন, লোকে তোমাকে সূফী বলিয়া জানে এবং তুমি অবগত আছ যে, তাহারা তোমাকে মারধর করিবে না ও তোমার এমন ধনও নাই যাহা লোকে কাড়িয়া নিয়া যাইতে পারে তবে তৎপরিবর্তে পাপীরা তোমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে উৎপীড়ন করিবে-এমতাবস্থায় পাপ দমনে প্রবৃত্ত হওয়া দুরস্ত হইবে না। কারণ, নিজের প্রতি উৎপীড়ন হইতে থাকিলে সহ্য করা সঙ্গত বটে; কিন্তু অপরের প্রতি উৎপীড়ন হইতে থাকিলে ধৈর্যধারণ করা সঙ্গত নহে। বরং যাহাতে তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন না হয় ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা অবশ্যই ধর্মীয় কর্তব্য।

চতুর্থ বিষয়, পাপ প্রতিরোধ পদ্ধতি ঃ পাপ প্রতিরোধ পদ্ধতির পর্যায়ক্রমে আটটি স্তর আছে। যথা ঃ (১) পাপীর অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া; (২) পাপীকে তাহার পাপ সম্বন্ধে, অবহিত করা; (৩) উপদেশ প্রদান; (৪) কর্কশ বাক্য প্রয়োগ; (৫) হস্তদ্বারা তাহার মন্দ কার্য সংশোধন করিয়া দেওয়া; (৬) প্রহার করতঃ আহত করার ধমকি প্রদান; (৭) প্রহার করা এবং (৮) সর্বশেষে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দলে-বলে পাপীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

প্রথম স্তর ঃ সর্বপ্রথম পাপীর পাপ কর্মের অবস্থা নিঃসন্দেহরূপে অবগত হওয়া পাপ প্রতিরোধকারীর কর্তব্য। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া, দরজার নিকট কিংবা ছাদের উপর লুকাইয়া শুনিবার এবং প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার চেষ্টা করিবে না। বস্ত্রাঞ্চলে কেহ কোন মন্দ বস্তু লুকাইয়া রাখিলে তাহা টিপিয়া বা হাতড়াইয়া দেখিবে না। কিন্তু অনুসন্ধান ব্যতীত বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শোনা গেলে কিংবা মদের গন্ধ পাওয়া গেলে প্রতিরোধ করা দুরস্ত আছে। এতদ্ব্যতীত দুইজন

ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী সংবাদ দিলে তাহা বিশ্বাস করিবে। দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য পাওয়া গেলে, যে গৃহে অপকর্ম চলিতেছে, গৃহস্বামীর বিনানুমতিতে তথায় প্রবেশ করত ঃ পাপ দমন করা দুরস্ত আছে। কিন্তু একজন সাক্ষীর কথা শ্রবণ করিয়া কাহারও গৃহে প্রবেশ না করাই উত্তম। কারণ, প্রত্যেকেরই স্বীয় গৃহে ইচ্ছানুযায়ী সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার আছে এবং একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত নহে। কথিত আছে যে, লুকমান হাকীমের আংটিতে খোদিত ছিলঃ অনুমানের উপর নির্ভর করতঃ কাহাকেও লাঞ্চিত করা অপেক্ষা প্রকাশ্যে পাপ গোপন করা উত্তম।

দ্বিতীয় স্তর ঃ পাপাচারীকে উহার অপকারিতা বুঝাইয়া দিবে। কারণ সে হয়ত এমন কোন কার্য করে যাহার অপকারিতা সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। যেমন, কোন মুর্খ ব্যক্তি মসজিদে নামায পড়িতেছে এবং রুকূ, সিজদা পুরাপুরি আদায় করিতেছে না অথবা তাহার পরিহিত বস্ত্রে নাপাকিসহ নামায পড়িতেছে। অবহিত থাকিলে সে এইরূপভাবে নামায পড়িত না। সুতরাং তাহাকে অবহিত করা ও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এমন নম্রতার সহিত সহজভাবে শিক্ষা প্রদান করিবে যাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া না উঠে। কোন মুসলামানকে বিনা কারণে ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা উচিত নহে। কারণ, তুমি যখন কাহাকেও কোন বিষয় শিক্ষা দিতে যাইবে প্রকৃতপক্ষে তুমি তখন তাহাকে অজ্ঞ সাজাইবে এবং তাহার ত্রুটি বর্ণনা করিবে। মলম ব্যতীত এই আঘাত কেহই সহ্য করিতে পারে না। মলম এই যে, তুমি তাহাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতঃ বলিবে ঃ মাতৃগর্ভ হইতে কেহই শিক্ষা করিয়া আসে না এবং যাহারা জানে না তাহাদের মাতাপিতা ও উস্তাদ এইজন্য দায়ী। সম্ভবত আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার মত কোন আলিম আপনার আশেপাশে নাই।

মোটকথা এইরূপ কথা দ্বারা পাপাচারীর মন সন্তুষ্ট করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ করে না অথবা (পাপীকে দেখিয়া) বিরক্ত হয়, সে এমন ব্যক্তি সদৃশ যে, রক্তমাখা কাপড় প্রস্রাব দ্বারা ধৌত করিতেছে; একটি পুণ্যের কাজ করিতে গিয়া অপর একটি পাপ করিয়া বসে।

তৃতীয় স্তর ঃ নম্রতার সহিত উপদেশ প্রদান করিবে। কটু কথা বলিবে না। কারণ, পাপী স্বয়ং যে স্থলে পাপকর্মকে হারাম বলিয়া জ্ঞাত আছে, সেখানে উহার দোষ বর্ণনাতে কোন ফল হইবে না। এমন স্থলে সংক্ষেপে বর্ণনা করাই বাঞ্ছনীয়। উহাতে নম্রতা এই যে, মনে কর এক ব্যক্তি অগোচরে পরনিন্দা করিতেছে। তাহাকে বলিবে-দেখ, আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি একেবারে নির্দোষ? সুতরাং পরের দোষ না

গাহিয়া নিজের দোষের দিকে লক্ষ্য করা উচিত। অথবা পরনিন্দার শাস্তি পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইবে। এ স্থলে উপদেশদাতার পক্ষে এমন এক গুরুতর আপদ রহিয়াছে যাহা হইতে আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কেহই রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ, উপদেশ প্রদানকালে উপদেষ্টার প্রবৃত্তি দুইটি শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। প্রথমতঃ নিজের জ্ঞান ও পরহিযগারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয়; নিজের প্রভুত্ব ও প্রাধান্যজনিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। মানবদেহের এই দুইটি পীড়া মান-সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানব প্রকৃতিই এইরূপ যে, অধিকাংশ সময় সে মনে করেঃ আমি ওয়ায-নসীহত করিয়া বেড়াই এবং আমি শরীয়ত অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন উপদেষ্টা মান-সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার দাস হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার এই পাপ অপরের সেই পাপ হইতে জঘণ্য যাহা দূরীকরণার্থে সে ওয়ায-নসীহত করিয়া বেড়াইতেছে। এমতাবস্থায় গভীর মনোনিবেশ সহকারে এই উপদেষ্টার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত-যাহাকে তিনি উপদেশ প্রদান করিতে যাইতেছেন, যদি সেই ব্যক্তি নিজে নিজে অথবা অন্য কোন উপদেষ্টার উপদেশে পাপ পরিত্যাগ করে, তবে উহা তাঁহার উপদেশে পরিত্যক্ত হওয়া অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় বলিয়া তাঁহার নিকট মনে হয় কিনা এবং এইরূপ স্থলে তিনি নিজে তাহাকে উপদেশ প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হন কিনা। যদি তাহাই হয় তবে এইরূপ উপদেষ্টারই ওয়ায-নসীহত করা শোভা পায়। কিন্তু তিনি যদি পছন্দ করেন যে, সে তাঁহার উপদেশেই পাপ বর্জন করুক, তবে এমন উপদেষ্টার আল্লাহ্কে ভয় করা আবশ্যক। কারণ, তাহার এরূপ ওয়ায-নসীহত তাহাকে আত্মশ্লাঘা ও আত্ম-তৃপ্তির দিকে আহ্বান করে, আল্লাহ্র দিকে ধাবিত করে না।

হযরত দাউদ তায়ী (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিলঃ যে ব্যক্তি বাদশাহের দরবারে যাইয়া তাঁহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে, তাঁহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি বলিলেনঃ আমার এই আশংকা হয় যে, বাদশাহ তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিবেন। লোকে বলিল ঃ তিনি তো বেত্রাঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা রাখেন। তিনি বলেন ঃ আমার এই আশংকা হয় যে, বাদশাহ্ তাঁহাকে হত্যা করিবেন। লোকে বলিল ঃ তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলিলেন ঃ আমি তাঁহার জন্য এমন এক আপদের আশংকা করি যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুপ্ত। ইহা হইল 'আমি শ্রেষ্ঠ', এই মনোভাব।

হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন ঃ অমুক খলীফাকে পাপ কার্য হইতে নিবৃত্ত করার আমার ইচ্ছা হইল এবং আমি ভাবিলাম যে, তিনি আমাকে হত্যা করিয়া

ফেলিলেন। ইহাতে আমি ভীত হইলাম না। কিন্তু তাঁহার দরবারে বহু লোক উপস্থিত ছিল। তাই আমার আশংকা হইল যে, তাহারা দেখিবে আমি ঈমানদারীতে অকপট এবং শরীয়তের বিধান লঙ্ঘনকারীদের প্রতি অতীব কঠোরঃ আর ইহা আমার মনে ভাল লাগিবে। ফলে আমি এমন অবস্থায় মরিব যাহাতে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকিবে না।

চতুর্থ স্তর ঃ কর্কশ কথা বলা। ইহার দুইটি নিয়ম আছে। প্রথমতঃ যে পর্যন্ত নম্র ও সদয় উপদেশ ফলদায়ক হয়, সে পর্যন্ত কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দ্বিতীয়তঃ উপদেশ প্রদানে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিবে না এবং যাহা বলিবে সত্য বলিবে। যেমন, পাপাচারীকে জালিম, ফাসিক, জাহিল, আহমক বলিবে; ইহার অতিরিক্ত বলিবে না। কারণ, যে ব্যক্তি পাপ করে সে নির্বোধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ "যে ব্যক্তি নিজের হিসাব-নিকাশ করে এবং মৃত্যুকে দেখিতে থাকে, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং গর্বিত থাকে ও মনে করে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করিবেন, সে নির্বোধ।" ফলপ্রদ হইবে, এইরূপ আশা থাকিলেই উপদেশ প্রদানকালে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ সঙ্গত। আর যখন বুঝিবে যে, ফলপ্রদ হইবে না, তখন কর্কশ মেজাজে ঘৃণার চোখে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে এবং তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে।

পঞ্চম স্তর ঃ হস্ত দ্বারা মন্দ কার্য সংশোধন করিয়া দেওয়া। ইহারও দুইটি নিয়ম আছে। প্রথমত ঃ পাপাচারীকে সংশোধিত হওয়ার জন্য যথাসাধ্য বলিবে। যেমন, রেশমী বস্ত্র পরিধানকারীকে বলিবে, রেশমী বস্ত্র পরিত্যাগ কর। জোরপূর্বক অপরের জমি দখলকারীকে বলিবে অপরের জমি হইতে বাহির হইয়া যাও। মদ্যপায়ীকে বলিবে, মদ ফেলিয়া দাও। নাপাকি অবস্থায় মসজিদে প্রবেশকারীকে বলিবে, মসজিদ হইতে বাহির হও। দ্বিতীয়তঃ মুখের কথা কার্যকরী না হইলে বল প্রয়োগে তাহাকে তথা বাহির করিয়া দিবে। ইহারও একটি নিয়ম আছে। সামান্য বল প্রয়োগ কার্য সিদ্ধ হইলে বাড়াবাড়ি করিবে না। যেমন হাতে ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে পারিলে তাহার ঘাড়ে ধরিবে না এবং পা ধরিয়া হেঁচড়াইবে না। বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিতে হইলে ইহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবে না। রেশমী বস্ত্র আস্তে আস্তে খুলিবে যেন ছিঁড়িয়া না যায়। মদ ফেলিতে পারিলে ইহার পাত্র ভাঙ্গিবে না। কিন্তু পাত্রটি হাতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া ঢালিয়া ফেলিবার উপায় না থাকিলে প্রস্তর নিক্ষেপে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইতে পারে। ইহাতে ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে না। আর মদের পাত্রটির মুখ যদি সংকীর্ণ হয় এবং উহা হইতে মদ ঢালিয়া ফেলিতে ফেলিতে মদ্যপায়ীরা আসিয়া মারধর করিবার আশংকা থাকে তবে পাত্রটি ভাঙ্গিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে।

মদ প্রথম হারাম হওয়ার সময় যে পাত্রে মদ রাখা হইত, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ ছিল। তৎপর এই আদেশ রহিত হইয়াছে। কোন কোন আলিম বলেন, সেকালে মদের যে পাত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নির্দেশ ছিল তাহা মদের জন্য নির্দিষ্ট পাত্র ছিল। আজকাল যেহেতু ইহার জন্য কোন নির্দিষ্ট পাত্র নাই, কাজেই বিনা কারণে মদের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা সঙ্গত নহে। বিনা কারণে ভাঙ্গিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ষষ্ঠ স্তর ঃ ধমকি দেওয়া ও ভয় প্রদর্শন করা। যেমন, মদখোরকে বলিবে, মদ ফেলিয়া দে, অন্যথায় তোর মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব বা তোকে খুব অপমানিত করিব। সহজে কাজ না হইলে এইরূপ ধমক দেওয়া দুরস্ত আছে। কিন্তু ইহারও দুইটি নিয়ম আছে। প্রথমত, শরীয়ত অনুযায়ী না-দুরস্ত কার্যের ভয় দেখাইবে না। যেমন, এইরূপ উক্তি করিবে না যে, তোমার বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিব, তোমার বাড়িঘর ভাঙ্গিয়া দিব এবং তোমার স্ত্রী ও সান্তান-সন্তুতির প্রতি অত্যাচার করিব। দ্বিতীয়ত ঃ ধমকিতে এমন উক্তি করিবে যাহা করিবার ক্ষমতা তোমার আছে যেন উহা মিথা না হইয়া পড়ে। 'তোমার শিরশ্ছেদ করিব, 'তোমাকে শূলে দিব' এইরূপ কথা বলিবে না। কিন্তু যে পরিমাণ শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা আছে, যদি মনে হয় যে, তদতিরিক্ত ভয় দেখাইলে পাপাচারী ভীত হইয়া পাপ বর্জন করিবে, তবে অতিরিক্ত ভয় প্রদর্শন করাও জায়েয আছে। যেমন, বিবদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অপরের অনিষ্ট না হয় এমন অসত্যের আশ্রয় লওয়াও জায়েয আছে।

সপ্তম স্তর ঃ হস্ত-পদ ও লাঠি দ্বারা আঘাত করা। প্রয়োজনের সময় আবশ্যক পরিমাণ ইহা জায়েয আছে। পাপাচারী যখন প্রহার ব্যতীত পাপ বর্জন করে না, তখনই ইহার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাপ ছাড়িয়া দিলে প্রহার করিবে না। পাপ করার পর ইহার জন্য শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করাকে অবস্থাবিশেষে 'তাযীর' ও 'হদ' বলে। এই দুই প্রকার শাস্তি প্রদানের অধিকার কেবল বাদশাহের আছে। প্রহার দ্বারা পাপ প্রতিরোধের নিয়ম এই যে, হস্ত দ্বারা প্রহার করতঃ কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকা পর্যন্ত লাঠি দ্বারা প্রহার করিবে না এবং মুখমণ্ডলে আঘাত করিবে না। ইহাতে ফল না হইলে তলোয়ার বাহির করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবে। কোন পুরুষ কোন বেগানা স্ত্রীলোকের গলা জড়াইয়া ধরিলে যদি মনে কর যে, তলোয়ার বাহির করিয়া ভয় প্রদর্শন না করিলে সে তাহাকে ছাড়িবে না, তবে তলোয়ার বাহির করিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করা সঙ্গত। কিন্তু প্রতিরোধকারী ও সেই ব্যক্তির মধ্যস্থলে কোন নদী ব্যবধান থাকিতে ধনুকে তীর সংযোগ করতঃ তাহাকে ধমকাইয়া বলিবে ঃ স্ত্রীলোকটিকে না ছাড়িলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করা দুরস্ত আছে। কিন্তু উরু কিংবা পায়ের

গোছায় তীর নিক্ষেপ করিবে, সঙ্গিন স্থানে নিক্ষেপ করিবে না।

অষ্টম স্তর ঃ পাপ প্রতিরোধকারী একাকী না পারিলে স্বপক্ষের লোকদিগকে দলবদ্ধ করিয়া পাপীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। এমতাবস্থায় পাপীরাও হয়ত সদলবলে তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে। এইজন্যই কতিপয় আলিম বলেনঃ এইরূপ সম্ভাবনা থাকিলে বাদশাহের অনুমতি ব্যতীত পাপীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে অশান্তি ও বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হইবে। আবার কতিপয় আলিম বলেন ঃ বাদশাহের অনুমতি ব্যতীত যেমন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা দুরস্ত আছে, তদ্রূপ ফাসিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও দুরস্ত আছে। কেননা, পাপ প্রতিরোধকারী ইহাতে মারা গেলে শহীদ হইবে।

পাপ প্রতিরোধকারীর গুণাবলী ঃ পাপ প্রতিরোধকারীর তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। (১) ইল্‌ম, (২) পরহিযগারী ও (৩) সৎস্বভাব। কারণ, ইল্‌ম না থাকিলে তিনি ভাল-মন্দ কার্যে পার্থক্য করিতে পারিবেন না; পরহিযগারী না থাকিলে ভাল-মন্দ কার্যে পার্থক্য করিতে পারিলেও তাহার কার্যে স্বীয় হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিমুক্ত হইবে না এবং সৎস্বভাবী না হইলে লোকে দুঃখ-কষ্ট প্রদান করিলে ক্রোধের বশীভূত হইয়া তিনি আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাইবেন ও সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিবেন। এমতাবস্থায় তিনি প্রত্যেকটি কার্য প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া করিবেন, ধর্মের খাতিরে নহে এবং তখন তাঁহার পাপ প্রতিরোধ কার্য পাপের কারণ হইয়া উঠিবে। এইজন্যই একবার হযরত আলী (রা) যখন এক কাফিরকে পরাজিত করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্তে তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন এবং সে তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে থু-থু নিক্ষেপ করিল তখন তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন ঃ যখন আমার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে তখন আশংকা হইল যে, এখন এই হত্যা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইবে না। আর হযরত উমর (রা) একদা এক পাপীকে দুর্রা মারিতেছিলেন এমন সময় সে হতভাগা তাহাকে গালি দিল। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে প্রহার করা বন্ধ করিয়া দিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ এতক্ষণ আমি তাহাকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রহার করিতেছিলাম। এখন সে আমাকে গালি দিল। সুতরাং এখন তাহাকে প্রহার করিলে ইহা ক্রোধের কারণে হইবে।

হাদীস শরীফ হইতে বুঝা যায় যে, পাপ-প্রতিরোধকারীর মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কেবল এমন ব্যক্তিই মন্দ কার্যে প্রতিরোধ করিবে যে ব্যক্তি যে কাজে আদেশ বা প্রতিরোধ করা হইবে, তৎসম্বন্ধে

আলিম এবং সে কার্যে ধৈর্যশীল ও নম্র। হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেন ঃ তুমি অপরকে যে কাজের আদেশ করিতে ইচ্ছা কর, প্রথমে তদনুযায়ী স্বয়ং তোমার কার্য করা উচিত। সৎকার্যে আদেশ-প্রদানকারীর জন্য ইহা একটি নিয়মমাত্র, শর্ত নহে। কারণ, লোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমরা স্বয়ং আমল না করা পর্যন্ত কি সৎকার্যে আদেশ ও মন্দকার্যে প্রতিরোধে বিরত থাকিব? হুযূর (সা) বলিলেনঃ না, তাহা নহে। যদিও তোমরা সেই কার্য করিতে না পার তথাপি সৎকাজে আদেশ ও মন্দকার্যে প্রতিরোধ করা বর্জন করিও না।

ধৈর্যশীলতা ঃ ধৈর্যশীল হওয়া এবং নিজের উপর যত দুঃখ-কষ্টই আসুক না কেন, উহা অকাতরে সহ্য করা সৎকার্যে আদেশ ও মন্দকার্যে প্রতিরোধের অপর একটি নিয়ম। কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ

সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ।

وَأْمُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ–

আর নেক কাজে আদেশ ও মন্দ কার্যে প্রতিরোধ করিতে থাক এবং তোমার উপর যে বিপদাপদ আসে উহাতে ধৈর্য ধারণ কর।

সুতরাং যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে না পারে তাহার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

লোভ শূণ্যতা ঃ অপর একটি অত্যাবশ্যক নিয়ম এই যে, সংসারের সহিত সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধকারীর সংশ্রব কম থাকিবে এবং তাঁহার লোভও খুব অল্প হইবে। কারণ যে স্থলে প্রতিরোধকারী লোভী ও প্রত্যাশী হইবেন, সেখানেই তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। পূর্বকালীন কোন এক বুযর্গ এক কসাই-এর দোকান হইতে বিড়ালের জন্য গোশতের পর্দা কুড়াইয়া আনিতেন। একদা উক্ত কসাই কর্তৃক কোন মন্দকার্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তিনি প্রথমে স্বীয় গৃহে গমনপূর্বক বিড়ালটিকে ত্যাগ করিলেন এবং তৎপর কসাই-এর দোকানে যাইয়া তাহাকে পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। কসাই তাঁহাকে বলিলঃ আচ্ছা, আপনি কি আর গোশতের পর্দা পাইতে আশা করেন না? তিনি বলিলেনঃ আমি প্রথমেই বিড়ালটি ত্যাগ করিয়া তৎপর তোমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছি। লোকের ভালবাসা, প্রশংসা ও সন্তুষ্টি যে লাভ করিতে চায়, সে পাপ নিবারণে সমর্থ হইবে না।

নম্রতা ও শিষ্টাচার ঃ পাপ প্রতিরোধের আসল নিয়ম এই যে, পাপ করে বলিয়া পাপাচারীর জন্য পাপ প্রতিরোধকারী অন্তর্দাহ ভোগ করিবে, তাহার প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিবে এবং তাহাকে পাপ বর্জনের জন্য এইরূপ স্নেহ ভাষণে উপদেশ প্রদান

করিবে যেমন পিতা স্বীয় সন্তানকে বারণ করিয়া থাকে ও তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করিবে। এক ব্যক্তি খলীফা মামুনকে উপদেশ প্রদান করিতে যাইয়া কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিল। খলীফা বলিলেন ঃ হে যুবক! আল্লাহ্ তোমা অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট মহাপুরুষকে আমা অপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া তাহার সহিত নম্র ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠাইয়া নির্দেশ দিলেন ঃ

তোমরা উভয়ে তাহার সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।"

বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করাই প্রত্যেকের কর্তব্য।

এক যুবক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমাকে যিনা (ব্যাভিচার) করিবার অনুমতি প্রদান করুন। সাহাবা (রা) চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে প্রহার করিতে চাহিলেন। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহাকে মারিও না। তৎপর তিনি তাহাকে নিজের নিকট ডাকিয়া আনিয়া জানুর সহিত জানু মিশাইয়া উপবেশন করাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে যুবক! কেহ তোমার মাতার সহিত এ কাজ করুক, তাহা তুমি পছন্দ কর কি? যুবক বলিল, না। হুযূর (সা) বলিলেনঃ অপর লোকেও ইহা পছন্দ করে না। তৎপর হুযূর (সা) বলিলেনঃ আচ্ছা, তোমার কন্যার সহিত কেহ এইরূপ কুকর্ম করুক, ইহা তুমি পছন্দ কর কি? এইরূপে তাহার বোন, ফুফু ও খালা সম্বন্ধে সে এইরূপ কুকর্ম পছন্দ করে কি না, তিনি তাহাকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যুবকও প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই 'না' বলিতে লাগিল। হুযুর (সা)-ও বলিতেছিলেন যে, তদ্রূপ অপর লোকেও ইহা পছন্দ করে না। অতঃপর হুযূর (সা) যুবকটির বক্ষস্থলে স্বীয় পবিত্র হস্ত বুলাইয়া প্রার্থনা করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তাহার মনকে পবিত্র কর, তাহার গুপ্ত অঙ্গকে পাপ হইতে রক্ষা কর এবং তাহার পাপ ক্ষমা কর। তৎপর যুবক হুযূর (সা)-এর পবিত্র দরবার শরীফ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং চিরজীবন যিনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক শত্রু বলিয়া মনে করিতেন।

হযরত সুফিয়ান উয়াইনাহ্ (র) বাদশাহের উপঢৌকন গ্রহণ করেন বলিয়া লোকে হযরত ফুযায়ল আয়ায (র)-এর নিকট অভিযোগ করিল। তিনি বলিলেন ঃ রাজকোষে তাঁহার প্রাপ্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি। তৎপর হযরত ফুযায়ল (র) হযরত সুফিয়ান (র)-কে নির্জনে দেখিতে পাইয়া বাদশাহের উপঢৌকন গ্রহণের জন্য তাঁহার প্রতিক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। হযরত সুফিয়ান (র) বলিলেন ঃ হে আবূ আলী! যদিও আমি নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত নহি, তথাপি আমি নেককারগণকে

ভালবাসি। হযরত সলত ইব্নে আসীম (র) স্বীয় শাগরেদগণের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় সেই স্থান দিয়া একজন লোক অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। অহংকারী আরববাসীদের অভ্যাস অনুযায়ী তাহার পরিহিত তহবন্দ মাটি ঘেঁসিয়া যাইতেছিল। ইহা শরীয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং শাগরেদগণ তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু তিনি স্বীয় শাগরেদগণকে বলিলেন ঃ তোমরা চুপ থাক। আমি ইহার প্রতিবিধান করিব। তৎপর তিনি লোকটিকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন ঃ ভ্রাতঃ, আপনার সহিত আমার প্রয়োজন আছে। লোকটি কি প্রয়োজন, জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন ঃ আপনার তহবন্দ একটু উপরে উঠাইয়া পরিধান করুন। লোকটি বলিল ঃ বহুত আচ্ছা। তৎপর তিনি শাগরেদগণকে বলিলেন ঃ কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিলে লোকটি আমার কথা মানিত না এবং সে গালি দিয়া বসিত।

এক ব্যক্তি এক মহিলাকে ধরিয়া ছুরি বাহির করিল। কেহই তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস পাইতেছিল না এবং মহিলটি চীৎকার করিতেছিল। হযরত বিশরে হাফী (র) লোকটির নিকটবর্তী হইয়া স্বীয় স্কন্ধ তাহার স্কন্ধের সহিত ঠেকাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ লোকটি বেহুঁশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহার দেহ হইতে ঘর্ম নির্গত হইতে লাগিল। মহিলাটি তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া চলিয়া গেল। লোকটি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ তোমার কি হইয়াছিল? সে বলিল ঃ এতটুকু জানি যে, এক ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া তাহার দেহ আমার দেহের সহিত মিলাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন ঃ আল্লাহ দেখিতেছেন, তুমি কোথায় এবং কি করিতেছ। তাঁহার এতটুকু কথা শুনিয়া আমার মনে এমন ভীতির সঞ্চার হইল যে, আমি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। লোকে তাহাকে জানাইল ঃ তিনি হযরত বিশরে হাফী (র) ছিলেন। লোকটি লজ্জিত হইয়া বলিল ঃ হায়! এই অনুতাপ লইয়া কিরূপে আমি তাঁহার দর্শনলাভ করিব? সেই সময়ই সে ব্যক্তি জ্বরাক্রান্ত হয় এবং সপ্তাহকাল মধ্যে সে প্রাণত্যাগ করে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত মন্দকার্য ঃ বর্তমানে সমস্ত জগত অপকর্মে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং উহা সংশোধন করা দুষ্কর ভাবিয়া লোকে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, মানুষ সকল কাজের ক্ষমতা সমানভাবে রাখে না বলিয়া যে সমস্ত কাজ করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে, উহা হইতেও তাহারা নিজেদের হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া

রাখিয়াছে। ধর্মপরায়ণ লোকদের অবস্থা এইরূপ, অপর পক্ষে ধর্ম-কর্মে উদাসীন লোকেরা স্বয়ং এই সকল অপকর্ম প্রচলনে সন্তুষ্ট রহিয়াছে।

তুমি যাহা করিতে সমর্থ তাহাতে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকা তোমার জন্য দুরস্ত নহে। আজকাল যে সকল মন্দ কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে উহাদের প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে। সুতরাং সেই সমস্ত মন্দ কার্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব মাত্র। এই মন্দ কার্যগুলির কতক মসজিদে, কতক বাজারে ও পথেঘাটে, কতক গোসলখানায় এবং কতক গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মসজিদে অনুষ্ঠিত মন্দ কার্য ঃ মসজিদে অনুষ্ঠিত মন্দ কার্যগুলি এইরূপ ঃ নামায পড়িবার সময় যথারীতি সুন্দরভাবে তা আদায় না করা; গানের সুরে কুরআন শরীফ পাঠ করাঃ একাধিক মুয়াযযিন একযোগে আযান দেওয়া এবং সমস্বরে আযানের আওয়ায খুব চড়াইয়া দেওয়া। এইরূপে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্ ও হায়্যা আলাল ফালাহ্' বলিবার সময় সমস্ত শরীর কিবলার দিক হইতে ফিরাইয়া লওয়া। রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া ও স্বর্ণখচিত তরবারি কোমরে ঝুলাইয়া খুতবা পাঠ করা, এইরূপ কার্য হারাম। মসজিদে সমবেত হইয়া হাঙ্গামা করা, বাজে গল্প করা, কবিতা পাঠ করা, তাবীয বা অন্য কোন বস্তু বিক্রয় করা। শিশু, মাতাল ও উন্মাদকে মসজিদে প্রবেশ করতঃ হট্টগোল করিতে দেওয়া এবং এইরূপে নামাযিগণকে কষ্ট দেওয়া। কিন্তু শিশু চুপ থাকিলে ও মাতাল কাহাকেও কষ্ট না দিলে এবং মসজিদ অপবিত্র না করিলে তাহাদের মসজিদে আগমণ দুরস্ত আছে। কিন্তু কোন শিশু মসজিদে কোন কোন সময় শিশুসুলভ খেলাধূলা করিলে তাহাকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ওয়াজিব নহে। কারণ, মদীনা শরীফের মসজিদে হাবশী বালকগণ কুচকাওয়াজ করিয়াছিল। হযরত আয়েশা (রা) ইয়া দর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু মসজিদকে ক্রীড়া-কৌতুকের স্থান বানাইয়া লইলে তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মসজিদে বসিয়া বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে কাপড় সেলাই করিলে কিংবা কোন কিছু লিখিলে, যদি ইহাতে অপর লোকের কষ্ট না হয় তবে দুরস্ত আছে। কিন্তু সর্বদা মসজিদে বসিয়া এ সমস্ত কার্যের ব্যবসায় করা মাকরূহ।

শাসন কার্য পরিচালনা করা, কবালা লিখন ইত্যাদি যে সকল কার্যে প্রভুত্ব প্রকাশ পায়, এমন কার্য সর্বদা মসজিদে করা সঙ্গত নহে। তবে কখন কখন করা যাইতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখন কখন মসজিদে বসিয়া শাসন কার্য পরিচালনা

করিতেন। কিন্তু এই কার্যের জন্য তিনি কখনও মসজিদকে এজলাস বানাইয়া লাইতেন না। ধোপা মসজিদে কাপড় শুকাইলে এবং রং রজক মসজিদে কাপড় রাঙাইলে বা শুকাইলে তাহাদিগকে নিষেধ করিতে হইবে। কেননা, মসজিদে এ সমস্ত করা অন্যায়। যাহারা বাড়াইয়া-কমাইয়া এমন কাহিনীসমূহ মসজিদে বর্ণনা করে যাহা হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবে উল্লেখ নাই, তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। পূর্বকালীন বুযর্গগণ এইরূপই করিতেন।

যাহারা সর্বদা সাজসজ্জা করিয়া সুন্দর ও পরিপাটি হইয়া থাকে, কামভাব যাহাদের প্রবল, ছন্দময় বুলি আওড়াইয়া কিংবা গান সংযোগে বৃক্তৃতা করে এবং যুবতী মহিলাগণ মসজিদে বিদ্যমান থাকে, এমন ব্যক্তিকে মসজিদে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হারাম। বরং মসজিদের বাহিরেও এমন ব্যক্তিকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। বক্তা এইরূপ হওয়া উচিত যাহার বাহ্য আকৃতি দরবেশজনোচিত বেশভূষায় সজ্জিত এবং যিনি ধার্মিক লোকের ন্যায় পোশাক পরিহিত। কোন অবস্থাতেই যুবতী মহিলাদিগকে পুরুষের সভায়, মধ্যস্থলে পর্দা ব্যতীত এক বৈঠকে মিলিতভাবে বসিতে দেওয়া দুরস্ত নহে। হযরত আয়েশা (রা) তাঁহার যমানায় স্ত্রীলোকদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় স্ত্রীলোকগণ মসজিদে যাইত। হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কালের অবস্থা দর্শন করিলে অবশ্যই তিনি স্ত্রীলোকদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন।

মোটকথা, মসজিদে কাচারী মিলাইয়া বসা, কোন বস্তু ভাগ-বন্টন করিয়া লওয়া, কারবার করা, দেনা-পাওনা ও হিসাব-নিকাশ চুকান অথবা মসজিদে বসিয়া ইহাকে তামাশার স্থানে পরিণত করা, গীবত করা, বাজে বকবক করা ইত্যাদি কার্য করা অসঙ্গত। এই সমস্ত কার্য মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতার পরিপন্থী।

হাটে-বাজারে অনুষ্ঠিত মন্দ কার্য ঃ ক্রেতার সহিত মিথ্যা বলা ও পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা, পাল্লা-বাটখারা, গজ ঠিকমত না রাখা, পণ্যদ্রব্যে লোকদের সহিত প্রতারণা করা, ঈদের মধ্যে শিশুদের জন্য বাদ্যযন্ত্র, প্রাণীর ছবি ও পুতুলাদি বিক্রয় করা, নববর্ষ দিবসে কাষ্ঠ নির্মিত ঢাল-তলোয়ার বিক্রয় করা, 'সদহ' উৎসবের দিন মাটির চুঙ্গা ও পাপিয়া পাখি বিক্রয় করা (পারসিক বৎসরের একাদশ মাস 'বাহমন'-এর দশম তারিখে যে উৎসব করা হয় তাহাকে 'সদহ' বলে)। রিফু করা ও ধোলাই করা পুরাতন বস্তু নুতন বলিয়া বিক্রয় করা। যে সমস্ত ব্যাপারে লোকদিগকে প্রতারিত করা হয়, তৎসমূদয়ের প্রত্যেকটির অবস্থাই একরূপ। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত ধূপদান, পানিপাত্র, দোয়াত, বাসন ইত্যাদি বিক্রয় করা। ইহাদের কতক হারাম,

কতক মাকরূহ্। প্রাণীর ছবি ও মূর্তি নির্মাণ এবং ক্রয়-বিক্রয় হারাম আর কাষ্ঠনির্মিত ঢাল-তলোয়ার, মৃত্তিকা নির্মিত চুঙ্গা প্রভৃতি যাহা কিছু জাতীয় উৎসব ও নববর্ষ দিবস্ উপলক্ষে বিক্রয় করা হয়, সেই সমস্ত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় মূলত ঃ হারাম নহেঃ কিন্তু অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের রীতিনীতি প্রকাশক বলিয়া হারাম। কারণ, যে সমস্ত কার্য কাফির-অগ্নিপূজক-পৌত্তলিকদের রীতিনীতি ও চালচলন প্রকাশক, তৎপরসমূদয়ই শরীয়ত বিরুদ্ধ এবং নাজায়েয। এ সমস্ত দিবসের জন্য যাহাকিছু প্রস্তুত করা হয়, সবই নাজায়েয। বরং নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে হাট-বাজার সজ্জিত করা, মণ্ডা-মিঠাই প্রস্তুত করা এবং জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা ধারণ করা শরীয়ত বিরোধী কার্য। কারণ, নববর্ষ, 'সদহ' প্রভৃতি যে সকল উৎসব অমুসলমান কাফিরগণ করিয়া থাকে, সেই সকলের মূলোৎপাটন করিয়া ফেলাই আবশ্যক; যেন মানুষ উহার নাম পর্যন্ত ভুলিয়া যায়।

প্রাচীনকালের কতিপয় আলিম বলেন ঃ বিজাতীয় ও বিধর্মীদের উৎসব দিবসে মুসলমানগণের রোজা উচিত যাহাতে উক্ত দিবস উপলক্ষে প্রস্তুত মণ্ড-মিঠাই প্রভৃতি মুসলমানের ভক্ষণে অসিয়া না পড়ে এবং সেই সকল উৎসবের রাত্রে মুসলমানদের গৃহে প্রদীপ জ্বালা রাখা উচিত নহে যেন সেই রাতে অগ্নি তাহাদের দৃষ্টিপথেই আসিতে না পারে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন ঃ উক্ত উৎসব-দিবসে রোযা রাখাও উহা স্মরণ করাইয়া দেয়; অথচ কোনরূপই উক্ত দিবসকে স্মরণ পথে আসিতে দেওয়া উচিত নহে; বরং অন্যান্য দিনের মতই উহাকে অতিবাহিত হইতে দেওয়া উচিত তাহা হইলে ইহাদের নাম এবং চিহ্নও আর অবশিষ্ট থাকিবে না।

পথে-ঘাটে অনুষ্ঠিত মন্দ কার্য ঃ রাস্তায় খুঁটি গাড়িয়া দোকান ঘর নির্মাণ করত ঃ চলাচলের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা, রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপন করা, মূল দালান হইতে বারান্দা গাঁথিয়া রাস্তার দিকে বাহির করিয়া দেওয়া, পানি নিকাশের জন্য দালানের ছাদ হইতে পাইপ স্থাপনপূর্বক রাস্তার উপর ঝুলাইয়া দেওয়া ইত্যাদি। কারণ, যানবাহনে আরোহী যাত্রী এই সকলে ধাক্কা লাগিতে পারে। রাস্তার উপর দ্রব্যসম্ভারের স্তূপ লাগইয়া রাখা বা কোন জন্তু বাঁধিয়া রাখিয়া চলাচলের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা ইত্যাদি কার্য দুরস্ত নহে। কিন্তু অত্যাবশ্যক হইলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ করা যাইতে পারে। যেমন পমু বা গাড়ি হইতে মালের বোঝা রাস্তার উপর নামাইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে লইয়া যাওয়া। গাধার পিঠে কাঁটার বোঝা চাপাইয়া সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া চালাইয়া নেওয়া উচিত নহে। কারণ, পথিকের পরিহিত বস্ত্র কাঁটায় লাগিয়া ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই পথ ব্যতীত গাধা চালাইয়া নেওয়ার অন্য কোন পথ না থাকিলে

চালাইয়া নেওয়া যাইতে পারে। পশুর উপর ইহার সাধ্যাতীত ভারবিশিষ্ট বোঝা চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। রাস্তার উপর গরু-ছাগলাদি যবেহ্ করা ও গোশত তৈয়ার করা অসঙ্গত। কারণ, রক্ত লাগিয়া পথিকের বস্ত্র নষ্ট হইতে পারে। বরং যবেহ্ করার ও গোশত তৈয়ার করিবার স্থান দোকান-গৃহে নির্ধারিত করিয়া লওয়া উচিত। রাস্তার উপর তরমুজ, খরমুয ইত্যাদি ফলের খোসা ফেলিয়া রাখা, গৃহ হইতে অধিক পানি লোক চলাচলের পথে নিক্ষেপ করা অন্যায়। ইহাতে পথিক পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি রাস্তায় বরফ নিক্ষেপ করে বা যাহার গৃহের পানি রাস্তায় গড়াইয়া যায়, রাস্তা পরিষ্কার করা তাহার কর্তব্য। কিন্তু সমস্ত লোকের গৃহের পানিই রাস্তার উপর দিয়া গড়াইয়া গেলে রাস্তা পরিষ্কার করা তাহাদের সকলের উপর ওয়াজিব এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের দ্বারা রাস্তা পরিষ্কার করাইয়া লওয়া সরকারের দায়িত্ব। লোকে দেখিয়া ভয় পায় এমন কুকুর কাহারও দরজায় রাখা উচিত নহে। রাস্তা নোংরা করা ব্যতীত কুকুর দ্বারা অন্য কোন অসুবিধা না হইলে তদ্রূপ কুকুর রাখিতে নিষেধ করা উচিত নহে। কারণ, এইরূপ নোংরামি হইতে রাস্তা-ঘাট মুক্ত রাখা সম্ভব নহে। কুকুর যদি রাস্তার উপর শয়ন করিয়া চলাচলের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, তবে এইরূপভাবে কুকুর বাঁধিয়া রাখাও অসঙ্গত। তদ্রূপ কুকুরের মালিক রশিদ্বারা কুকুরকে বাঁধিয়া ইহাসহ নিজে পথের উপর বসিয়া বা শুইয়া থাকাও অনুচিত।

গোসলখানায় অনুষ্ঠিত মন্দ-কার্য ঃ নাভি হইতে জানু পর্যন্ত স্থানের কোন অংশ অনাবৃত রাখা, কাহারও সম্মুখে উরুদেশ মুক্ত করিয়া ধৌত করা এবং লুঙ্গির ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া অপর কাহারও দ্বারা উরুদেশ ধৌত করানো অবৈধ। কারণ, দর্শন করা, আর স্পর্শ করা একই কথা। গোসলখানার দরজায় প্রাণীর ছবি অঙ্কিত করাও মন্দ কার্য। এইগুলি মুছিয়া ফেলা বা অক্ষম হইলে তথা হইতে নিজে বাহির হইয়া চলিয়া আসা ওয়াজিব। হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-র মতে অপবিত্র হাত ও পাত্র অল্প পানিতে ডুবাইয়া দেওয়া অবৈধ। কিন্তু হযরত ইমাম মালিক (র)-র মাযহাব মতে অবৈধ নহে। এইজন্য মালিকী মাযহাবের প্রতিবাদ করা সঙ্গত নহে। গোসলের সময় অতিরিক্ত পানি নষ্ট করাও অন্যায়। এ সম্পর্কে আরও মন্দ কার্য আছে। এগুলি 'পবিত্রতা' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

মেহমানিতে মন্দ কার্য ঃ রেশমী ফরাস, রৌপের ধূপদান, গোলাবপাশ, আতরদান ও ফুলদান এবং প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট পর্দা ব্যবহার করা মন্দ কার্য ও অবৈধ। কিন্তু বালিশে, বিছানায় ছবি থাকিলে ক্ষতি নাই। প্রাণীর আকৃতিতে নির্মিত ধূপদান ব্যবহার

করাও হারাম ও গর্হিত কার্য। মেহমানীর মজলিসে গান-বাদ্যের ব্যবস্থা থাকাও অবৈধ। আবার উহাতে যুবক-যুবতীদের সমাগম হইলে বহু অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এ সমস্ত কার্যের শাসন ও প্রতিরোধ ওয়াজিব। অক্ষম হইলে সেই মজলিস বর্জন করতঃ বাহির হইয়া আসিবে। হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বাল (র) এক মাহফিলে রৌপ্যনির্মিত সুরমাদানী দেখিতে পাইয়া উক্ত মাহফিল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে মজলিসে রেশমী বস্ত্র কিংবা স্বর্ণের আংটি পরিহিত কোন লোক থাকিলে এমন মজলিসে বসাই উচিত নহে। বোধসম্পন্ন নাবালেগও উক্ত পোশাকে সজ্জিত থাকিলে তথায় উপবেশন করা উচিত নহে। কারণ, মদ্যপান করা যেমন মুসলমানের জন্য হারাম্ তদ্রূপ রেশমী বস্ত্র পরিধান করাও পুরুষের জন্য হারাম। নাবালেগকে নিষিদ্ধ পোশাক ব্যবহার করিতে দিলে দোষ এই যে, ইহা পরিধানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে যৌবনেও ইহার লোভ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু অবোধ শিশু যদিও রেশমী বস্ত্রের আস্বাদন উপভোগ ও উপলব্ধি করিতে পারে না তথাপি উহা তাহার জন্য হারাম না ইহলেও মাকরূহ। মাহ্‌ফিলে যদি এমন কোন ভাঁড় উপস্থিত থাকে, যে মিথ্যা ও অশ্লীল বকিয়া বকিয়া লোকদিগকে হাসায়, তবে সেই মজলিসে বসা সঙ্গত নহে।

মোটকথা, সমাজে প্রচলিত মন্দ কার্যসমূহের বিবরণ বহু বিস্তৃত। উপরে যাহা বর্ণিত হইল উহার উপর অনুমান করিয়া তুমি মাদ্‌রাসা, খানকাহ্ বিচারালয়, রাজদরবার প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত মন্দ কার্যসমূহ বুঝিয়া লইতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন

রাজ্য শাসন একটি মহান কার্য। ন্যায় বিচারের সহিত করিলে ইহা ইহজগতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব এবং ন্যায় বিচারশূন্য ও করুণাহীন হইলে ইহাই আবার শয়তানের প্রতিনিধিত্ব হইয়া পড়ে। কারণ, শাসকের অবিচার ও অত্যাচার অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারিতা অপর কোন অপকর্মেই নাই। শরীয়তের জ্ঞানলাভ করতঃ তদনুযায়ী রাজ্য শাসন করাই রাজ্যশাসনের মূলনীতি।

রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি বিস্তৃত হইলেও ইহার ভূমিকা এই যে, শাসককে সর্বপ্রথম এতটুকু জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এ জগতে কি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান কোথায়। এ জগত তাঁহার পান্থশালা মাত্র; স্থায়ী বাসস্থান নহে বরং মুসাফিরের ন্যায় তিনি ইহলোকে আছেন। মাতৃগর্ভ হইতে সফল আরম্ভ হইয়াছে এবং কবর ইহার শেষ সীমা। এই পথ অতিক্রম করিয়া তাহার বাসস্থান। যে বৎসর, যে মাস ও যে দিন তাঁহার আয়ুষ্কাল হইতে অতিবাহিত হইয়া যায়, উহাদের প্রত্যেকটি তাঁহার ভ্রমণ পথের এক-একটি মন্‌যিলস্বরূপ। এইগুলি অতিক্রম করতঃ তিনি তাঁহার চিরস্থায়ী বাসস্থানের নিকটবর্তী হইতেছেন। যে ব্যক্তি পুল পার হইতে যাইয়া স্বীয় গন্তব্যস্থানের কথা ভুলিয়া পুলের নির্মাণ কার্য দর্শনে সময় নষ্ট করে, সে নিতান্ত নির্বোধ। বরং সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে দুনিয়ারূপ পান্থশালা হইতে পরকালের পাথেয় ব্যতীত আর কিছুই অন্বেষণ করে না এবং যাহা নিতান্ত আবশ্যক তাহা পাইয়াই দুনিয়াতে পরিতুষ্ট থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস-পত্র প্রাণসংহারক হলাহলস্বরূপ এবং মৃত্যুকালে উহার অধিকারীর ইচ্ছা হইবে যে, তাহার সমস্ত ধনভাণ্ডার মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হউক এবং স্বর্ণ-রৌপ্য উহাতে কিছুই না থাকুক। সুতরাং সে যত অধিক ধন-সম্পদই সঞ্চয় করুক না কেন, উহা হইতে কেবল আবশ্যক পরিমাণই তাহার ভোগে আসে; বাকি সমস্তই দুঃখ ও দুশ্চিন্তার বীজ হইয়া দাঁড়ায় এবং মৃত্যুকালে প্রাণ বাহির হওয়ার সময় তজ্জন্য তাহাকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। হালাল উপায়ে অর্জিত মালের দরুনই এই অবস্থা হইবে। আবার হারাম উপায়ে অর্জিত মাল হইলে এতদ্ব্যতীত তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক পরকালীন শাস্তি তো তাহার জন্য নির্ধারিত রহিয়াছেই।

দুঃখ-কষ্ট ভোগ ব্যতীত পার্থিব লোভ-লালসা দমন করা সম্ভব নহে। কিন্তু মানব যদিও এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, ইহলৌকিক ক্ষণস্থায়ী আমোদ-আহ্লাদ, ভোগ-বিলাস ভীষণ ক্লেদ ও ক্লেশে পরিপূর্ণ এবং এইজন্য পরকালের চিরস্থায়ী রাজত্ব-সুখ ও অনন্ত অনাবিল শান্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত থাকিতে হইবে তবে পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী লোভ-লালসা দমন করা তাহার জন্য নিতান্ত সহজ হইবে।

উহার দৃষ্টান্ত এইরূপঃ যেমন, এক ব্যক্তি কোন রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহার মিলন কামনায় অধীর হইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় যদি তাহাকে বুঝাইয়া বলা যায় যে, তুমি অদ্য রজনী তোমার প্রেয়সীর সহবাস উপভোগ করিলে জীবনে আর কখনও তাহার দর্শনলাভ তোমার ভাগ্যে জুটিবে না; অপরপক্ষে অদ্য রজনী ধৈর্যধারণপূর্বক তাহার সহবাসে বিরত থাকিলে তোমার প্রেয়সীকে হাজার হাজার রজনী প্রতিদ্বন্দ্বীবিহনি নিরঙ্কুশ সহবাসের জন্য তোমার হাতে অর্পন করা হইবে, তবে এই ব্যক্তির মিলনাকাঙ্ক্ষা সীমাহীন ও দুর্দমনীয় হইলেও ভবিষ্যতের হাজার হাজার রজনীর সুদীর্ঘ মিলন-সুখের বাসনায় এই এক রাত্রির বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করা তাহার জন্য অতি সহজ হইবে। আর পরকালের অনন্ত জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন সহস্রভাগের এক ভাগও নহে। বরং পরলোকের অনন্ত জীবনের সহিত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কোন তুলনাই হইতে পারে না।

পরলোকের অনন্ত জীবন যে কত দীর্ঘ, মানুষ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। কারণ, মনে কর, সপ্ত আস্‌মান ও সপ্ত যমীনের বিস্তীর্ণ স্থানকে ক্ষুদ্র সরিষা দ্বারা পরিপূর্ণ করত ঃ একটি পাখিকে এইরূপে নিযুক্ত করা হইল যে, ইহা সহস্র বৎসরান্তে একটি করিয়া সরিষা খুটিয়া লইতে থাকিবে, ইহাতেও সমস্ত সরিষা নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তথাপি পরকালের অনন্ত জীবনের কিছুমাত্রও হ্রাস পাইবে না। কাহারও আয়ুষ্কাল যদি একশত বৎসর হয় এবং সমগ্র জগতের নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র আধিপত্য তাহাকে প্রদান করা হয় তথাপি সমগ্র পৃথিবীর উপর তাহার আজীবনের আধিপত্য সুখ পরজগতের অনন্ত রাজ্য সুখের তুলনায় ইহা কত তুচ্ছ ও নগণ্য! অথচ এ জগতে কাহারও ভাগ্যে সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য জুটে না। যত বড় নরপতিই হউক না কেন, পৃথিবীর অতি সামান্য অংশের আধিপত্যই তাহার ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। আবার ইহাও কন্টকশূন্য হয় না; বরং তজ্জন্য সর্বদা উদ্বেগপূর্ণ ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। সুতরাং পরলোকের অসীম আনন্দপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন বাদ্‌শাহীকে এমন হীন ও আবিলতাপূর্ণ আধিপত্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

অতএব শাসক হউক কিংবা শাসিত হউক, সকলেরই কর্তব্য সর্বদা উপরিউক্ত কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করা এবং হৃদয়ে এ বিষয়টিকে সর্বদা জাগ্রত রাখা। তাহা হইলেই পার্থিব জীবনের এই কয়েকদিনের লোভ-লালসা দমন করা, প্রজাগণের সহিত

সদয় ব্যবহার করা, আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে সুন্দররূপে প্রতিপালন করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করা সহজ হইয়া পড়িবে। এতটুকু উপলব্ধি করার পর মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে রাজ্যশাসন করা এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণে দুনিয়ার সহিত তাল মিলাইয়া রাজদণ্ড পরিচালনা না করা। কারণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুবিচারের সহিত রাজ্যশাসন পরিচালনা অপেক্ষা অপর কোন ইবাদতও নৈকট্যই আল্লাহ্‌র নিকট এত উৎকৃষ্ট ও মহান নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বাদশাহের একদিনের ন্যায় বিচার একাধারে ষাট বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে সাত শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়ায় অবস্থান করিবেন বলিয়া হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি সুবিচারক বাদ্‌শাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ন্যায়বিচারক বাদ্‌শাহের জন্য ফেরেশতাগণ ষাটজন সিদ্দীকের ইবাদতের সমপরিমাণ আমল আসমানে লইয়া যায়। হুযূর (সা) বলেন যে, ন্যায়বিচারক বাদ্‌শাহ্ আল্লাহ্‌র অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বড় বন্ধু এবং অত্যাচারী বাদশাহ্ আল্লাহ্‌র ভীষণ শাস্তি ভোগের উপযোগী ও তাঁহার বড় শত্রু। হুযূর (সা) আরও বলেন ঃ সেই আল্লাহ্‌র শপথ যাঁহার হস্তে মুহম্মদের প্রাণ, সুবিচারক বাদ্‌শাহের জন্য সমস্ত প্রজার আমলের সমপরিমাণ আমল প্রত্যহ ফেরেশ্‌তাগণ আস্‌মানে লইয়া যায় এবং তাহার এক নামায সত্তর হাজার নামাযের সমান।

ন্যায়বিচারের সহিত রাজ্যশাসনের ফযীলত যখন এত অধিক, তখন ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে বাদ্‌শাহী প্রদান করিয়াছেন তাহার একঘন্টা অন্যান্য লোকের সারাজীবনের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এই নিয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি না করিয়া অত্যাচারে ও স্বীয় বাসনা-কামনা চরিতার্থকরণে লিপ্ত হয়, বুঝিতে হইবে যে, তাহার অদৃষ্টে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। শাসনকর্তা দশটি নিয়ম পালনে তৎপর হইলেই তাঁহার দ্বারা সুবিচার সম্ভব।

শাসকের পালনীয় নিয়মাবলী ঃ প্রথম নিয়ম ঃ উপস্থিত মুকদ্দমায় বিচারক মনে করিবেন যেন তিনি নিজেই একজন প্রজা এবং অপর কোন ব্যক্তি বিচারক। সুতরাং উপস্থিত মুকদ্দমায় যেরূপ বিচার তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেন না, তাহা যেন তিনি অপর মুসলমানের জন্যও পছন্দ না করেন। পছন্দ করিলে তিনি শাসনক্ষমতার অপব্যবহার করত ঃ প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হইবেন। বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছায়ায় উপবিষ্ট এবং সাহাবা কিরাম (রা) রৌদ্রে ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি ছায়াতে এবং সাহাবাগণ রৌদ্রে! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এতটুকু ব্যাপারেও সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দোযখ হইতে অব্যাহতি পাইতে ও বেহেশ্‌তে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহার উচিত কালেমা 'লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ'

পড়িতে পড়িতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করা এবং যে বস্তু সে নিজের জন্য পছন্দ না করে তাহা অপর মুসলমানের জন্যও পছন্দ না করা। হুযূর (সা) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে স্বীয় হৃদয়কে লিপ্ত করে, সে আল্লাহ্ ভক্ত বান্দা নহে এবং মুসলমানের কাজে ও সেবায় অমনোযোগী থাকে, সে মুসলমান নহে।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ প্রয়োজনে যাহারা আগমন করিয়াছে, তাহাদিগকে অযথা নিজ দ্বারে প্রতীক্ষমান রাখাকে তুচ্ছ কার্য বলিয়া মনে করিবেন না এবং এইরূপ করার বিপদ হইতে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিবেন। উপস্থিত কোন মুসলমানের কাজ বাকি রাখিয়া কোন নফল ইবাদতে লিপ্ত হইবেন না। কারণ, মুসলমানের অভাব-অভিযোগ পূরণ করা সমস্ত নফল ইবাদত হইতে উত্তম।

একদা হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) জুহরের সময় পর্যন্ত প্রজাদের কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এরবং সামান্য বিশ্রামের জন্য নিজ গৃহে গমন করিলেন। তখন তাঁহার পুত্র বলিলেন ঃ কি কারণে আপনি নিশ্চিত হইলেন? অসম্ভব নহে যে, এখনই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে এবং ইত্যবসরে অভাব-অভিযোগ লইয়া কোন ব্যক্তি আপনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। এমতাবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে আপনার কর্তব্যে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। তিনি বলিলেনঃ তুমি ঠিক বলিয়াছ। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় নিয়ম ঃ প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া এবং উত্তম খাদ্য ভোজনে ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত হওয়া শাসকের উচিত নহে। বরং সর্ব বিষয়ে অল্পে পরিতুষ্ট হওয়া আবশ্যক। কারণ, অল্পে পরিতুষ্ট না হইলে সুবিচার করা সম্ভব নহে। হযরত উমর (রা) হযরত সাল্‌মান ফারসী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমার সম্বন্ধে আপনার অপছন্দনীয় কি কথা শ্রবণ করিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ আমি শুনিয়াছি, আপনার দস্তরখানে একই সময়ে দুই প্রকার ব্যঞ্জন উপস্থিত থাকে এবং আপনি দুইটি পিরহান রাখিয়া থাকেন-একটি রাত্রে ও অপরটি দিনে পরিধানের জন্য। হযরত উমর (রা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা, ইহাছাড়া আরও কিছু শুনিয়াছেন কি? তিনি উত্তর করিলেন ঃ না। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ এই দুইটি কথাই মিথ্যা।

চতুর্থ নিয়ম ঃ প্রত্যেক কার্যে যথাসাধ্য নম্র ব্যবহার করিবেন, কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে শাসক প্রজাদের সহিত নম্র ব্যবহার করে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করিবেন। আর হুযূর (সা) দু'আ করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! যে শাসক প্রজাদের সাথে নম্র ব্যবহার করে, তুমি তাহার সহিত নম্র ব্যবহার কর এবং যে ব্যক্তি কঠোর ব্যবহার করে, তুমিও তাহার সহিত

কঠোর ব্যাবহার কর। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে শাসক শাসন কার্যের দায়িত্ব পালন করে, তাহার জন্য শাসনকার্য উত্তম কাজ। আর যে ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে, তাহার জন্য শাসনকার্য মন্দ।

খলীফা হিশাম ইব্‌নে আবদুল মালিক শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত আবূ হাযেম (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ শাসনকার্যের গুরু দায়িত্ব হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় কি? তিনি উত্তর করিলেন ঃ উপায় এই যে অর্থ তুমি গ্রহণ কর তাহা হালাল মাল হইতে গ্রহণ কর এবং যে অর্থ তুমি ব্যয় কর তাহা এমন স্থানে ব্যয় কর যে স্থানে ব্যয় করা সঙ্গত। খলীফা বলিলেন ঃ ইহা কি কেহ করিতে পারে? তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরের আযাব সহ্য করিতে অক্ষম এবং বেহেশতে প্রবেশের জন্য উদ্‌গ্রীব, সে ইহা করিতে পারে।

পঞ্চম নিয়ম ঃ শরীয়ত অনুযায়ী সকল প্রজাই যেন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, শাসনকর্তা এই চেষ্টা করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ শাসকগণের মধ্যে তাঁহারাই উত্তম যাঁহারা তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমরাও তাঁহাদিগকে ভালবাস। আর যে শাসক তোমাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করেন এবং তোমারও তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া থাক, এইরূপ শাসনকর্তা শাসকদের মধ্যে নিকৃষ্টতম।

লোকে প্রশংসা করিলে শাসনকর্তার গর্বিত হওয়া সঙ্গত নহে এবং এইরূপ মনে করাও উচিত নহে যে, সকলেই তৎপ্রতি সন্তুষ্ট। হয়ত ভয়ের কারণে সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে। বরং বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করত ঃ নিজের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব গোপনে অনুসন্ধানপূর্বক জানিয়া লওয়া শাসকের কর্তব্য। কারণ, মানুষ স্বীয় দোষ-ত্রুটি লোক মুখেই জানিতে পারে।

ষষ্ঠ নিয়ম ঃ শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শাসক কাহারও সন্তুষ্টিলাভের চেষ্টা করিবেন না। কারণ, শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়, তাহার অসন্তুষ্টি শাসকের কোনই ক্ষতি করে না। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ প্রত্যুষে যখন আমি গাত্রোত্থান করি তখন অর্ধেক লোক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ অবশ্যই ঘটিবে। কারণ, শাসক অত্যাচারীকে শাস্তি দিলে সে তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইবে। সুতরাং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। যে ব্যক্তি লোকের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বর্জন করে, সে নিতান্ত বোকা।

হযরত মুআবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা) নিকট এক পত্র দ্বারা সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। হযরত আয়েশা (রা) উত্তরে লিখিলেন ঃ আমি সৃষ্টির সেরা জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি , যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ্ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকে

তাহার প্রতি সন্তুষ্ট করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য না করিয়া মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া দেন।

সপ্তম নিয়ম ঃ শাসনকর্তার উপলব্ধি করা উচিত যে, রাজ্য শাসন একটি বিপদসঙ্কুল কার্য এবং মানব জাতির শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নহে। আল্লাহ্ যাহাকে ইহার দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা অর্পণ করেন তিনি এমন সৌর্ভাগ্য লাভ করেন যাহার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর সৌভাগ্য আর কিছুই নাই। আর যে ব্যক্তি শাসন-কার্যে ত্রুটি করে, সে এমন দুর্ভাগ্যে নিপতিত হয় যে, কুফরের পর এমন দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিলাম তিনি আগমন করতঃ কা'বা শরীফের বেষ্টনী ধারণ করিলেন এবং তখন কুরায়শগণ হেরেম শরীফে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, যে পর্যন্ত তিনটি কার্য করিবে সে পর্যন্ত কুরায়শ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে শাসনকর্তা ও বাদশাহ্ হইতে থাকিবে। কেহ তোমাদের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইলে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেঃ বিচারপ্রার্থী হইলে ন্যায়বিচার করিবে; অঙ্গীকার করিলে তাহার পূর্ণ করিবে। যে ব্যক্তি এইগুলি না করে তাহার প্রতি আল্লাহ্র ফেরেশেতাগণের ও সকলের অভিশাপ বর্ষিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তাহার ফরয-সুন্নত, কোন ইবাদতই কবূল করেন না। অতএব, ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে, এই তিনটি কার্য না করা কত বড় গুরুতর পাপ যদ্দরুণ আল্লাহ্ তাহার কোন ইবাদতই কবূল করেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুইজন লোকের বিচার করে, আর (ইহাতে) অন্যায় করে, তাহার উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন। হুযূর (সা) বলেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে দৃষ্টিপাতও করিবে না। (১) মিথ্যাবাদী সুলতান (শাসকর্তা বা বাদশাহ্), (২) ব্যভিচারী বৃদ্ধলোক; (৩) গর্বিত ও দর্পকারী দরিদ্র ব্যক্তি। তৎপর হুযূর (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বলিলেন ঃ অতি সত্বর পূর্ব-পশ্চিমের রাজ্য তোমাদের দখলে আসিবে এবং তথাকার শাসনকর্তাগণ দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করিবে, পরহিযগারী অবলম্বন করিবে এবং আমানতদার হইবে (তাহারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে না)। হুযূর (সা) আরও বলেন ঃ যে শাসনকর্তার উপর আল্লাহ্ প্রজাপালনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে সস্নেহে এবং প্রজাপালন না করে তবে আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্ত হারাম করিয়া দিবেন। হুযূর (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ যাহাকে মুসলমানগণের উপর নেতৃত্ব দান করিয়াছেন সে যদি তাহাদিগকে নিজের পরিবার-পরিজনের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ না করে তবে তাহাকে বলিয়া দাও সে যেন

নিজের বাসস্থান দোযখে অনুসন্ধান করিয়া লয়। হুযূর (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দুই প্রকার লোক আমার শাফায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে ঃ (১) অত্যাচারী বাদ্শাহ; (২) যে বিদ্আতী ধর্ম-বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করিয়া সীমা অতিক্রম করে। হুযূর (সা) বলেন ঃ অত্যাচারী বাদশাহের উপর কিয়ামতের দিন ভীষণ আযাব হইবে।

হুযূর (সা) বলেন ঃ পাঁচ প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। তিনি ইচ্ছা করিলে দুনিয়া হইতেই তাহাদের উপর শাস্তি আরম্ভ করেন। অন্যথায় তাহাদের জন্য তো দোযখে স্থান অবধারিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম, সম্প্রদায়ের আমীর (শাসক) যে অধীনস্থ লোকদের নিকট হইতে নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়, কিন্তু তাহাদের প্রতিদান দেয় না এবং তাহাদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করে না। দ্বিতীয়, এমন নেতা লোকে যাহার অনুসরণ করিয়া থাকে কিন্তু সে সবল-দুর্বলকে এক নজরে দেখে না; বরং (সবলের) পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকে। তৃতীয়, যে ব্যক্তি (মজুরী প্রদানের অঙ্গীকারে) শ্রমিক নিযুক্ত করে কিন্তু শ্রমিক তাহার কার্য সামাধা করিয়া দেওয়ার পরও তাহাকে মজুরী দেয় না। চতুর্থ, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্র নির্দেশ মানিয়া চলিবার জন্য আদেশ করে না এবং তাহাদিগকে ধর্মের বিধান শিক্ষা দেয় না ও তাহাদের আহার কোথা হইতে দিবে সে চিন্তা করে না। পঞ্চম, যে ব্যক্তি মাহরের ব্যাপারে নিজের স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে।

হযরত উমর (রা) একদা জানাযার নামায পড়াইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইয়া দিলেন। দাফনের পর কবরের উপর হাত রাখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! পাপের দরুন যদি এই মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান কর তবে তাহা উপযুক্তই হইবে। আর তুমি যদি তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ কর তবে সে তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। হে মৃত ব্যক্তি! তুমি কখনও আমীর (শাসক) ছিলে না, সরকারী ঘোষণাকারী বা তাহার সাহায্যকারী ছিলে না, দলীল লেখক বা তহ্শীলদারও ছিলে না। অতএব, শান্তিতে অবস্থান কর। এই বলিয়া সেই ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর। কিন্তু তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তিনি ছিলেন হযরত খিযির আলায়হিস সালাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমীর (শাসক), নকীব (সরকারী ঘোষণাকারী) ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আফসোস। কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে তাহাদের কেশগুচ্ছ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইবে। কারণ, তাহারা কখনই তাহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিত না। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্তত ঃ দশজন লোকের উপরও শাসন ক্ষমতা লাভ করে, কিয়ামতের দিন তাহাদের হস্ত শিকল দ্বারা

বাঁধিয়া তাহাকে আনয়ন করা হইবে। সে যদি নেককার হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকে তবে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। অন্যথায় আরও একটি শিকল দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত উমর (রা) বলেন যে, মহাবিচারক আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে দুনিয়ার শাসকবৃন্দের যে দুর্গতি ঘটিবে তাহা বড়ই আফসোসের বিষয়। কিন্তু যাহারা সুবিচার করিয়াছে, নিজের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করিয়াছে, লোভের বশীভূত হইয়া কোন রায় প্রদান করে নাই, আত্মীয়-স্বজনের পক্ষপাতিত্ব করে নাই; বরং ভয় বা লোভের বশীভূত হইয়া কোন হুকুমের পরিবর্তন করে নাই; বরং আল্লাহ্‌র কিতাবকে দর্পণের ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া তদনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছে, তাহাদের কোন দুর্গতি হইবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিবস শাসকদিগকে আহ্‌কামুল হাকিমীন আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির করিয়া বলা হইবে ঃ তোমরা আমার বকরীসমূহের রাখাল ছিলে (অর্থাৎ আমার নিরীহ দুর্বল বান্দাগণের শাসনভার তোমার উপর অর্পিত ছিল) এবং তোমরা আমার জগত রাজ্যের রাজকোষসমূহের কোষাধ্যক্ষ ছিলে। আমার বিধানের অতিরিক্ত দণ্ড ও শাস্তি তাহাদিগকে কেন দিলে ? তাহারা নিবেদন করিবে ঃ হে মহাবিচারক আল্লাহ্! তাহারা আপনার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের প্রতি আমাদের ক্রোধের কারণ। আল্লাহ্ বলিবেন ঃ কেন তোমাদের ক্রোধ কি আমার ক্রোধ অপেক্ষা অধিক ছিল ? অপর এক দল শাসককে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেনঃ তোমরা আমার বিধান অপেক্ষা কম শাস্তি দিলে কেন ? তাহারা নিবেদন করিবে ঃ হে বিশ্ব প্রভু! আমরা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াছিলাম। আল্লাহ্ বলিবেন ঃ কেন, তোমরা কি আমা হইতে অধিক দয়ালু ছিলে ? তৎপর অধিক শাস্তি ও কম শাস্তি প্রদানকারী উভয় দলকে ধৃত করা হইবে এবং দোযখের কোণসমূহ তাহাদের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে।

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ শাসনকর্তা সৎই হউক, আর অসৎই হউক, আমি তাহাদের কাহারো প্রশংসা করি না। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কিয়ামত দিবস ন্যায়বিচারক ও অত্যাচারী সকল শাসককে একত্র করিয়া পুলসিরাতের উপর দণ্ডায়মান করা হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা পুলসিরাতকে নির্দেশ দিবেন-একবার তাহাদিগকে ঝাঁকি দাও। যাহারা বিচার-মীমাংসায় অন্যায় করিয়াছিল অথবা ঘুষ গ্রহণ করিয়া অন্যায় বিচার করিয়াছিল কিংবা এক পক্ষের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিল (এবং অপর পক্ষের কথা শ্রবণ করে নাই) তাহারা সকলেই (এই ঝাঁকিতে পুলের উপর হইতে)

দোযখে পতিত হইবে এবং সত্তর বৎসর ধরিয়া পড়িতে পড়িতে দোযখের গভীরতম গহ্বরে যাইয়া ঠেকিবে। উহাই তাহাদের বাসস্থান হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ) ছদ্মবেশে বাহির হইতেন এবং যাহার সহিত সাক্ষাত হইত তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ ভ্রাতঃ বল তো দাউদের স্বভাব কিরূপ ? একদা হযরত জিব্রাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করতঃ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকেও তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ দাউদ (আ) যদি বায়তুল মাল হইতে নিজের ভরণ-পোষণ গ্রহণ না করিয়া নিজের অর্জিত ধনে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন তবে তিনি ভাল লোকই বটে। ইহা শুনিয়া হযরত দাউদ (আ) স্বীয় ইবাদতখানায় গমন করিলেন এবং রোদন করিতে করিতে মুনাজাত করিতে লাগিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাকে এমন কোন শিল্পকর্ম শিক্ষা দিন যদ্দারা আমি স্বহস্তে উপার্জিত ধনে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারি। আল্লাহ্ তাঁহাকে লৌহ-বর্ম নির্মাণকার্য শিখাইয়া দিলেন।

হযরত উমর (রা) চৌকিদারের পরিবর্তে স্বয়ং রাত্রিকালে শহরে টহল দিতেন যেন কোন স্থানে কোন প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ দেখিতে পাইলে উহা নিবারণ করিতে পারেন এবং তিনি বলিতেন ঃ লোকে যদি চর্মরোগ বিশিষ্ট একটি ছাগকে ফোরাত নদীর তীরে একাকী অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আসে এবং দেহে তৈল মর্দন না করার দরুন ছাগটি কষ্ট পায়, তবে আমার আশঙ্কা হয় কিয়ামত দিবস তজ্জন্যও আমাকে জবাবদিহী করিতে হইবে। যদিও উমর (রা) প্রজাপালন বিষয়ে এত সামান্য ব্যাপারের প্রতিও এমন কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করিতেন এবং তাঁহার সুবিচার এত উচ্চস্তরের ছিল যে, কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তথাপি তাঁহার ইন্তিকালের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আস (রা) বলেন ঃ আমি হযরত উমর(রা) কে স্বপ্নে দেখিবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিতাম। বার বৎসর পর স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি যেন এইমাত্র গোসল করিয়া লুঙ্গি পরিধান পূর্বক আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। আমি নিবেদন করিলাম ঃ ইয়া আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে আবদুল্লাহ্! আমি তোমার নিকট হইতে আসিয়াছি কতদিন হইল ? আমি বলিলাম ঃ বার বৎসর। তিনি বলিলেন ঃ এতদিন আমি হিসাব -নিকাশে ব্যস্ত ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি রহমত না করিলে আমার সর্বনাশ হইত। অথচ হযরত উমর (রা)-এর নিকট শাসনকার্যের উপকরণের মধ্যে একটি দুর্রা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

পারস্য সম্রাট হযরত উমর (রা)-এর আকৃতি প্রকৃতি দেখিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দূত মদীনা শরীফ পৌঁছিয়া মুসলমানগণকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনাদের বাদশাহ কোথায় ? তাঁহারা বলিলেন ঃ আমাদের বাদশাহ নাই। আমাদের একজন

আমীর আছেন। তিনি অল্পক্ষণ হয় বাহিরে গিয়াছেন। দূত বাহিরে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, হযরত উমর (রা) মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্রে দুর্রা শিয়রে দিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন এবং নূরানী চেহারা হইতে ঘাম বাহির হইয়া মাটি ভিজিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া দূত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। নিখিল বিশ্বের সমস্ত রাজা -বাদশাহ্ যাঁহার প্রতাপে ভীত ও সন্ত্রস্ত রহিয়াছে, তাঁহার এই অবস্থা! তৎপর দূত নিবেদন করিল ঃ হে, আমীরুল মুমিনীন ! আপনি ন্যায়বিচার করিয়াছেন। এইজন্যই আপনি নিঃশংকচিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন। আর আমাদের রাজা-বাদ্শাহগণ অত্যাচার করে। সুতরাং তাঁহারা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত থাকিতে বাধ্য। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনাদের ধর্ম সত্য। দূতরূপে আগমন না করিয়া থাকিলে আমি এখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতাম। পুনরায় আসিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইব।

মোটকথা, শাসনকার্যের বিপদসমূহের সামান্য বর্ণনা উপরে প্রদত্ত হইল। এ বিষয়ের জ্ঞান বহু বিস্তৃত। শাসনকর্তার কর্তব্য, সর্বদা ধর্মপরায়ণ অভিজ্ঞ আলিমগণের সংসর্গ লাভ করা, তাঁহাদের নিকট হইতে সুবিচারের সহিত প্রজাপালন ও রাজ্য-শাসনের পদ্ধতি অবগত হওয়া এবং সর্বদা তদনুযায়ী আমল করিবার জন্য সচেষ্ট থাকা। তাহা হইলে তাহারা অব্যাহতি পাইতে পারে। আর ধোকাবাজ আলিমগণের সংসর্গ তাহাদের বর্জন করা উচিত। কারণ, ধোকাবাজ আলিম শয়তানস্বরূপ।

অষ্টম নিয়ম ঃ সর্বদা ধর্মপ্রাণ অভিজ্ঞ আমিলের সাক্ষাতলাভের জন্য উদ্গ্রীব থাকা এবং তাঁহাদের উপদেশ অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা ও সংসারাসক্ত লোভী আলিমের সংসর্গ সতর্কতার সহিত বর্জন করিয়া চলা; কারণ সংসারাসক্ত আলিম শাসনকর্তাকে প্রতারিত করিবে, তাঁহার প্রশংসা করিবে এবং তাঁহার মন যোগাইয়া চলিবে যেন তাঁহার হস্তস্থিত মৃতদেহ অর্থাৎ পার্থিব ভোগ-বিলাসের সামগ্রী হইতে চাতুরী-বাহানা করিয়া কিছু লাভ করিতে পারে। যে আলিম রাজা-বাদ্শাহের নিকট হইতে কোন কিছুর প্রত্যাশা করেন না, দোষ-ত্রুটি দেখিলে তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে ভয় করেন না এবং সর্বদা ন্যায়-নীতি পালন করিয়া চলেন তিনিই ধর্ম-পরায়ণ আলিম।

হযরত শফীক বলখী (র) খলীফা হারুনুর-রশীদের নিকট উপস্থিত হইলে খলীফা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে শফীক! আপনি কি সংসারবিরাগী দরবেশ ? তিনি বলিলেন ঃ আমি শফীক, দরবেশ নহি। খলীফা বলিলেন ঃ আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আসনে আসন দান করিয়াছেন। এখন তিনি তোমার নিকট হইতে তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ততা, সত্যনিষ্ঠতা ও অকপটতা দেখিতে ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে

হযরত উমর ফারুক (রা)-র আসনে বসাইয়াছেন। আল্লাহ্ যেমন তাঁহার নিকট হইতে সত্য ও অসত্যের পার্থক্যকরণ চাহিয়াছিলেন, তোমার নিকট হইতেও তিনি তদ্রূপ আশা করেন। আল্লাহ্ তোমাকে হযরত উস্মান যুন্-নূরায়ন (রা)-র আসনে স্থান দান করিয়াছেন। এখন তিনি তোমার নিকট হইতে তাঁহার ন্যায় লজ্জাশীলতা ও বদান্যতা আশা করেন। আল্লাহ্ তোমাকে হযরত আলী (রা)-র স্থানে আসন দান করিয়াছেন। এখন তিনি তোমার নিকট হইতে তাঁহার ইল্‌ম ও সুবিচার প্রত্যাশা করেন। খলীফা আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা 'দোযখ' নামক একটি স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তোমাকে ইহার দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন ও তোমাকে তিনটি বস্তু দান করিয়াছেন ঃ (১) সরকারী কোষাগারের ধন, (২) তলওয়ার ও (৩) বেত্রদণ্ড। আর এই তিনটির সাহায্যে প্রজাবৃন্দকে দোযখ হইতে রক্ষা করিবার নির্দেশ তিনি তোমাকে প্রদান করিয়াছেন। অভাবগ্রস্ত তোমার নিকট আসিলে তাহাকে সেই ধন হইতে বঞ্চিত রাখিও না; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে, তাহাকে বেত্রদণ্ড দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবে এবং অন্যায়ভাবে কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে নিহত ব্যক্তির ওলীর অনুমতিক্রমে হত্যাকারীকে তলওয়ার দ্বারা হত্যা করিবে। এইরূপ না করিলে তোমাকেই সর্বাগ্রে দোযখে প্রবেশ করিতে হইবে। অপরাপর লোক তোমার পিছনে দোযখে প্রবেশ করিবে। খলীফা আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ তুমি একটি ঝরণাস্বরূপ এবং তোমার কর্মচারীবৃন্দ ইহা হইতে উদ্ভূত নদী-নালা সদৃশ। ঝরণাটি স্বয়ং নির্মল থাকিলে ইহা হইতে নিঃসৃত নদী-নালার মলিনতা কোন ক্ষতি করিতে পারে না কিন্তু স্বয়ং ঝরণাটি মলিন ও অপরিষ্কার হইয়া পড়িলে নদী-নালাসমূহ পরিষ্কার থাকিবে এইরূপ আশা করা উচিত নহে।

খলীফা হারুনুর-রশীদ তাঁহার অন্যতম সহচর আব্বাসকে সঙ্গে লইয়া হযরত ফুযায়ল ইয়ায (র)-র সাক্ষাত করিতে গেলেন। তাঁহারা যখন তাঁহার গৃহদ্বারে পৌছিলেন তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّئٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ-

তাহারা যে মন্দ কার্য করিতেছে, তাহারা কি ধারণা করে যে, আমি তাহাদিগকে সেই সমস্ত লোকের সমকক্ষ রাখিব যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং নেককার্য করিয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হইয়া পড়িবে ? তাহারা ইহা অন্যায় দাবি করিতেছে।

এই আয়াত শুনিয়া হারুনুর -রশীদ বলিলেন ঃ আমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহিলে এই আয়াতই আমাদের জন্য যথেষ্ট। খলীফা অতঃপর আব্বাসকে দ্বারে

খট্‌খটি দিতে বলিলেন। আব্বাস দরজায় খট্‌খটি দিয়া বলিলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন আসিয়াছেন; দরজা খুলুন। হযরত ফুযায়ল (র) গৃহের ভিতর হইতে বলিলেন ঃ আমার নিকট তাহার কি প্রয়োজন ? আব্বাস বলিলেন ঃ আমীরুল মুমিনীনের মর্যাদা রক্ষা করুন। তখন তিনি দরজা খুলিলেন ঃ তখন রাত্রিকাল ছিল; কিন্তু তিনি প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিলেন। মুসাফাহা করিবার জন্য হারুনুর -রশীদ অন্ধকারেই স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। হযরত ফুযায়লও স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। উভয় হস্ত মিলিত হইলে হযরত ফুযায়ল (র) বলিলেন ঃ এমন কোমল হস্ত দোযখ হইতে রক্ষা না পাইলে বড়ই আফসোসের বিষয়। তৎপর তিনি বলিলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! কিয়ামত দিবস আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহীর জন্য প্রস্তুত থাকুন। কারণ, সেই দিন তোমাকে প্রত্যেক মুসলমানের সহিত এক একবার দাঁড় করাইয়া তাহাদের সম্বন্ধে তোমার বিচার করিবেন। ইহা শুনিয়া খলীফা কাঁদিতে লাগিলেন। আব্বাস বলিলেন ঃ হে মহাত্মন! চুপ করুন; আপনি তো খলীফাকে মারিয়াই ফেলিলেন। হযরত ফুযায়ল (র) বলিলেন ঃ হে হামান! তুমি এবং তোমার সঙ্গীরাই খলীফাকে ধ্বংস করিয়া রাখিয়াছ। অথচ আমাকে বলিতেছ যে, আমি তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি। হারুনুর-রশীদ আব্বাসকে বলিলেন ঃ তিনি আমাকে ফিরাউনের ন্যায় মনে করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি তোমাকে 'হামান' নামে সম্বোধন করিলেন। তৎপর হযরত ফুযায়ল (র)-র সম্মুখে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা হাদিয়াস্বরূপ স্থাপনপূর্বক খলীফা বলিলেন ঃ হুযূর! এই মুদ্রাগুলি হালাল। উত্তরাধিকারসূত্রে উহা আম্মার মাহর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। হযরত ফুযায়ল (র) বলিলেন ঃ আমি তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে, তোমার নিকট যে সমস্ত ধন-সম্পদ রহিয়াছে তাহা হইতে তোমার হাত গুটাইয়া ফেল এবং তন্মধ্যে যাহার যতটুকু অধিকার আছে, তাহাকে ততটুকু প্রদান কর। কিন্তু তুমি আমাকে দিতেছ! অনন্তর তাঁহার দরবার হইতে খলীফা বাহির হইয়া পড়িলেন।

খলীফা হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র) একদা হযরত ইব্‌ন কাআব করযীকে বলিলেন ঃ সুবিচার কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ তোমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ মুসলমানগণের নিকট পিতৃতুল্য থাকিবে, তোমার সমবয়স্কদিগকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করিবে এবং প্রত্যেক অপরাধীকে তাহার অপরাধের পরিমাণ ও তাহার ক্ষমতার উপযোগী শাস্তি দিবে। সাবধান, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কাহাকেও অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করিও না। অন্যথায় তোমার স্থান দোযখে হইবে।

এক দরবেশ এক খলীফার দরবারে গমন করিলে খলীফা নিবেদন করিলেন, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন ঃ আমি চীন শহরে গিয়াছিলাম। তথাকার বাদ্‌শাহ বধির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিতেন ঃ আমি যে শুনিতে পাই না তজ্জন্য আমি রোদন করি না: বরং আমি এইজন্য রোদন করিতেছি যে, কোন

মযলুম ব্যক্তি যদি আমার দ্বারে উপস্থিত হয় তবে আমি তাহার অভিযোগ শুনিতে পাইব না। কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান আছে। রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যেন বিচার প্রার্থী ব্যক্তি লাল বর্ণের বস্ত্র পরিধান করে। তদবধি বাদ্‌শাহ প্রত্যহ হস্তী পৃষ্টে আরোহণ করতঃ নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইতেন এবং লাল বর্ণের বস্ত্র পরিহিত লোক দেখিবামাত্র তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার অভিযোগের যথাযথ বিচার করিয়া দিতেন। তৎপর দরবেশ বলিলেন ঃ হে খলীফা! এই বাদশাহ কাফির ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণের প্রতি তাঁহার এইরূপ দয়া ছিল। তুমি মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পরিবারস্থ লোক। অতএব, ভাবিয়া দেখ, প্রজাদের প্রতি তোমার কি পরিমাণ দয়া হওয়া আবশ্যক।

হযরত আবূ কলাবাহ্‌ (র) খলীফা হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)-র দরবারে গমন করিলে খলীফা নিবেদন করিলেন ঃ আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন ঃ হযরত আদম (আ)-র সময় হইতে আজ পর্যন্ত যত খলীফা ছিলেন সকলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন; কেবল তুমি জীবিত আছ। খলীফা বলিলেন ঃ আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন ঃ এখন যে খলীফা সর্বাগ্রে পরলোক গমন করিবে, সে খলীফা তুমি। খলীফা আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌ যদি তোমার সঙ্গে থাকেন তবে কিসের ভয় ? আর তিনি তোমার সঙ্গে না থাকিলে তুমি কাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? খলীফা বলিলেন ঃ এতটুকু উপদেশই আমার জন্য যথেষ্ট।

খলীফা সুলায়মান আবদুল মালিক একদা চিন্তা করিতে লাগিলেন ঃ আমি এত সুখ-শান্তি উপভোগ করিয়াছি যে, কিয়ামত-দিবস আমার কি অবস্থা হয়, তাহাই ভাবিবার বিষয়। তৎকালীন বুযর্গ আলিম হযরত আবূ হাযেম (র)-এর নিকট তিনি লোক পাঠাইয়া প্রার্থনা জানাইলেন ঃ আপনি যে বস্তু দ্বারা ইফ্‌তার করিয়া থাকেন তাহা হইতে সামান্য কিছু আমার জন্য পাঠাইতে মর্যী ফরমাইবেন। গমের কিছু ভূসি ভাজিয়া তিনি খলীফাকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে সেই লোক মারফত জানাইলেন ঃ রাত্রিকালে আমি ইহাই খাইয়া থাকি। ইহা দেখিয়া খলীফা সুলায়মান খুব রোদন করিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িল এবং তিনি উপর্যুপরি তিনটি রোযা রাখিলেন ও এই সময়ের মধ্যে কিছুই আহার করিলেন না। তৃতীয় দিবসে সেই ভাজা ভূসি দ্বারাই ইফতার করিলেন। উক্ত রাত্রিতে খলীফা সুলায়মান আবদুল মালিক স্বীয় স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে আবদুল আযীয জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ঔরসেই ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র) জন্মগ্রহণ করেন যিনি প্রজাপালন ও ন্যায়বিচারে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) পদাংক অনুসরণ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। বুযুর্গগণ বলেন যে, খলীফা সুলায়মান আবদুল

মালিক পবিত্র নিয়্যতে উল্লিখিত বুযর্গ আলিমের ইফতারের বস্তু হইতে আহারের বরকতেই এমন পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।

খলীফা হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি তওবা করেন কেন ? তিনি বলিলেন ঃ একদা আমি এক গোলামকে প্রহার করিতেছিলাম এমন সময় সে বলিতে লাগিল হুযূর! সেই রাত্রির কথা স্মরণ করুন যাহার অবসান ঘটিলেই কিয়ামত হইবে। তাহার এই কথা আমার অন্তরে বসিয়া গিয়াছে।

খলীফা হারুনুর -রশীদ নগ্নপদে অনাবৃত মস্তকে উত্তপ্ত বালুকা ও প্রান্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত উত্তোলনপূর্বক উচ্চস্বরে প্রার্থনা করিতেছিলেন ঃ হে করুণাময় আল্লাহ্! তুমি তো সীমাহীন দয়ার সিন্ধু, আর আমি সেই পাপী যাহার কার্য প্রতি মুহূর্তে পাপ করা, আর প্রতি মুহূর্তেই তুমি তাহা ক্ষমা করিয়া থাক। আমার প্রতি দয়া কর। এক বুযর্গ এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন ঃ দেখ, ইহলোকের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ্ উভয়লোকের সর্বশক্তিমান বাদশাহের নিকট কেমন কাতরকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন। হযরত উমর ইব্‌নে আবুল আযীয (র) হযরত আবু হাযেম (র)-র নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ মাটিতে শয়ন করিবে, মৃত্যুকে শিয়রে রাখিবে এবং তোমার যে বদ্ধমূল ধারণা কখন মৃত্যু আসিয়া পড়ে, এই ধারণা সর্বদা তোমার অন্তরে জাগ্রত রাখিবে। আর যে বস্তু তুমি পছন্দ কর না, তাহা হইতে দূরে থাকিবে। কারণ, মৃত্যু খুব নিকটে থাকাই সম্ভব।

অতএব, উপরিউক্ত কাহিনীসমূহ সর্বদা নিজের চক্ষুর সম্মুখে রাখা বিচারক ও শাসকের কর্তব্য এবং যে সমস্ত উপদেশ অন্যান্য শাসকের জন্য উপরে বর্ণিত হইয়াছে উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করা প্রত্যেক শাসক ও বিচারকের কর্তব্য। আর কোন আলিমের সাক্ষাত পাইলেই তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত। আবার আলিমেরও কর্তব্য কোন শাসক ও বিচারককে দেখামাত্র তদ্রূপ উপদেশ প্রদান করা এবং সত্য গোপন না করা। তোষণ-নীতি অবলম্বন পূর্বক যে ব্যক্তি শাসকদের অহংকার বাড়াইয়া তোলে এবং তাহাদের নিকট সত্য কথা গোপন রাখে, এই শাসকের দ্বারা দুনিয়াতে যে সমস্ত অত্যাচার ও অবিচার অনুষ্ঠিত হইবে, সে ব্যক্তিও এই অত্যাচার ও অবিচারের অংশী হইবে।

নবম নিয়ম ঃ শাসনকর্তা কেবল স্বয়ং অত্যাচার হইতে বিরত থাকিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না; বরং নিজের চাকর-নওকর, কর্মচারী ও প্রতিনিধিগণকেও সংশোধন করিবেন এবং তাহাদের অত্যাচার -উৎপীড়নে শাসনকর্তা কখনই সন্তুষ্ট থাকিবেন না। কারণ, তাহারা যে অত্যাচার ও অবিচার করিবে, তজ্জন্যও শাসনকর্তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহী করিতে হইবে।

হযরত উমর (রা) প্রাদেশিক শাসনকর্তা হযরত আবু মূসা আশআরী (রা)-কে এই মর্মে পত্র লিখিলেন ঃ অতঃপর জানাইতেছি, যে গভর্নরের শাসনে প্রজাগণ নেককার হয়, তিনি বড়ই সৌভাগ্যবান। আর যে গভর্নরের শাসনে থাকিয়া প্রজাগণ দুষ্ট ও অসাধু হয়, সে বড়ই হতভাগ্য। সাবধান, আনন্দে আত্মহারা হইবে না যে, তোমার অধীনস্থ কর্মচারীগণও তদ্রূপ ন্যায়বিচার ও সাধুতার সহিত প্রজাপালন করিবে। তাহা হইলে তুমি এমন চতুষ্পদ জন্তুতুল্য হইবে যে ঘাস দেখিলেই খুব খাইতে আরম্ভ করে; ফলে ইহা মোটা-তাজা হইয়া উঠে এবং এই মোটা-তাজা হওয়াই ইহার ধ্বংসের কারণ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ পশু মোটা-তাজা হইলেই ইহাকে যবেহ্ করিয়া লোকে খাইয়া ফেলে।

তাওরীত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, বাদশাহের কর্মচারী দ্বারা অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া বাদশাহ্ নীরব থাকিলে স্বয়ং বাদশাহই যেন এই অত্যাচার করিল। এইরূপ অত্যাচারের জন্য বাদশাহ ধৃত হইবে।

যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের ধর্ম ও চিরস্থায়ী পরকাল বিনষ্ট করে, তাহার ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্বোধ আর কেহই নাই-এই কথা শাসনকর্তার জানিয়া রাখা আবশ্যক। সকল কর্মচারী ও চাকর-নওকর দুনিয়া অর্জনের জন্য চাকুরী করিয়া থাকে এবং অত্যাচারকে তাহারা রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সুন্দররূপে সাজাইয়া দেখায়। ফলে তাহারা তাঁহাকে দোযখের দিকে ধাবিত করে এবং তাহাদের মতলব উদ্ধার করিয়া লয়। যে ব্যক্তি কয়েকটি মুদ্রা অর্জনের জন্য তোমার ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে তাহার অপেক্ষা বড় শত্রু তোমার আর কে হইতে পারে ?

মোটকথা, যে শাসনকর্তা স্বীয় কর্মচারী, চাকর-নওকর, স্ত্রী, সন্তান -সন্ততি ও ভৃত্যদিগকে সুবিধা ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারেন না তিনি কখনই স্বীয় প্রজাবৃন্দের প্রতিও সুবিচার করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে নিজ দেহরাজ্যের সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন কেবল তিনিই সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। দেহরাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ হইল অত্যাচার, ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তিকে বিবেক-বুদ্ধির উপর প্রাধান্য না দেওয়া। যাহাতে বিবেক-বুদ্ধি ধর্মের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং বুদ্ধি ও ধর্মকে রিপুসমূহের বশীভূত না করা। অধিকাংশ লোক বুদ্ধিকে ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তির গোলাম করিয়া রাখে। এমন কি তাহারা ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাহানা অবতারণা করিয়া বলে, ইহাই বিবেক-বুদ্ধির নির্দেশ। বস্তুত ঃ ইহা কখনও বুদ্ধির নির্দেশ নহে। কারণ, বুদ্ধি ফেরেশতার উপকরণের উৎস এবং আল্লাহ্ তা'আলার সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে কুপ্রবৃত্তি ও ক্রোধ শয়তানের সেনাবাহিনীর অন্তর্গত। অতএব, নাউ'যুবিল্লাহ্, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সৈন্যকে শয়তানের সৈন্যের হস্তে বন্দী করিয়া রাখিবে সে অন্যের প্রতি কি সুবিচার

করিবে ? সুবিচাররূপ সূর্য প্রথমতঃ মানুষের অন্তরাকাশে উদিত হয়। তৎপর ইহার আলো স্বীয় পরিবারবর্গ ও বিশেষ লোকদের উপর পতিত হয়। অতঃপর উহার কিরণ প্রজাবৃন্দের উপর পতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সূর্য ব্যতীত আলোক রশ্মির প্রত্যাশা করে, সে অসম্ভব আশা করিয়া থাকে।

পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি হইতে সুবিচার উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাবতীয় বিষয় বাস্তবে যে অবস্থায় বিদ্যমান আছে, উহাদিগকে ঠিক তদ্রূপই দেখা, উহাদের গূঢ় তত্ত্ব ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা এবং বাহ্য চাকচিক্যে বিমোহিত না হওয়াই বিবেক-বুদ্ধির পূর্ণতা প্রাপ্তির নিদর্শন। মানুষ দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই সুবিচার হইতে বিরত থাকে। সুতরাং ভাবিয়া দেখা উচিত, সে দুনিয়া হইতে কি পাইতে চায়। যদি দেখা যায় যে, উত্তম খাদ্য ভোজন করাই তাহার উদ্দেশ্য, তবে বুঝিবে সে মানুষের আকৃতিতে চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ। কারণ, কেবল আহারের লোভে মত্ত থাকা চতুষ্পদ জন্তুর কার্য। আর কেহ যদি উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের নিমিত্তে সুবিচার হইতে বিরত থাকিয়া অসুদপায় অবলম্বন করে, তবে বুঝিবে সে পুরুষের আকৃতিতে একজন নারী। কারণ, সাজসজ্জা ও সুন্দর বেশ-ভূষা লইয়া ব্যস্ত থাকা নারীদের কাজ। শত্রুর প্রতি স্বীয় ক্রোধ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে কেহ অন্যায় ও অবিচার করিলে বুঝিবে, সে মানুষের আকৃতিতে একটি হিংস্র জন্তু। কারণ, ক্রোধের বশীভূত হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করা হিংস্র জন্তুর কাজ। লোকে তাহার সেবা করিবে এই আশায় পক্ষপাতিত্ব করিয়া সুবিচার না করিলে বুঝিবে সে বুদ্ধিমানের বেশে একজন নিতান্ত নির্বোধ। কারণ, বুদ্ধিমান হইলে সে বুঝিত যে, সমস্ত সেবাকারী উদরপূর্তি, কুপ্রবৃত্তি ও কামভাব চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই অপরের গোলামি করিয়া থাকে। কেননা, একদিনের মজুরি বন্ধ করিয়া দিলেই দেখিবে তাহারা তোমার ত্রিসীমানার মধ্যেও নাই। সুতরাং স্বীয় প্রবৃত্তির ফাঁদে আট্‌কা পড়িয়াই তাহারা পরের সেবা ও দাসত্ব করিয়া থাকে এবং তাহারা যে পরের দাসত্ব করিতেছে দেখিতে পাও, ইহা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্ব। ইহার প্রমাণ এই যে, তাহারা যদি লোক মুখেও শুনিতে পায় যে, শাসন-ক্ষমতা অপর কাহারও হস্তে চলিয়া যাইতেছে, তবে তাহারা তোমার প্রতি বিমুখ হইয়া তৎক্ষণাৎ ভাবী শাসনকর্তার দ্বারে ধর্না দিয়া তাহার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং যেখানে ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে সেখানেই গোলামি ও সেবা করিবে। অতএব প্রকৃতপক্ষে ইহা সেবা করা নহে, সেবার প্রহসন মাত্র। সুতরাং যে ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়ের প্রাণ ও গূঢ় তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করে, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। যাবতীয় বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা বুঝে না, তাহার বুদ্ধি নাই এবং যাহার বুদ্ধি নাই সে ন্যায়বিচারক হইতে পারে না, ফলে তাহার স্থান হয় দোযখে। এই জন্যই বুদ্ধি সর্ববিধ সৌভাগ্যের শীর্ষস্থানীয়।

দশম নিয়ম ঃ অহংকার যেন শাসনকর্তার উপর প্রাধান্যলাভ না করে। কারণ, অহংকারের দরুণই ক্রোধ প্রাধান্যলাভ করে এবং মানুষ প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় ও তাহাকে বিপথে লইয়া যায়। ক্রোধের আপদসমূহ ও উহার প্রতিকারের উপায় বিনাশন খণ্ডে ক্রোধ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। শাসনকর্তার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হইলে সর্ববিধ কার্যে ক্ষমা করিবার আগ্রহ জন্মাইতে চেষ্টা করা তাহার কর্তব্য। করুণা ও ধৈর্যকে নিজের অভ্যাসগত পেশা করিয়া লওয়া এবং এইরূপ উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, আমি যদি করুণা ও ধৈর্যকে স্বীয় অভ্যাসগত পেশা করিয়া লইতে পারি তবে আমি আম্বিয়া (আ), সাহাবা (রা) এবং ওলি (র) গণের ন্যায় হইতে পারিব। ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য করিতে থাকিলে হিংস্র জন্তু ও চতুষ্পদ পশুতুল্য তুর্কী, গোঁয়ার পাহলোয়ান ও নির্বোধ লোকদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িব।

কথিত আছে খলীফা আবু জাফর এক অপরাধীকে হত্যার আদেশ দিলেন। হযরত মুবারক ইব্‌ন ফুযালা (র) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর একখানা হাদীস শ্রবণ কর। খলীফা নিবেদন করিলেন ঃ বর্ণনা করুন। হযরত মুবারক (র) বলিলেন ঃ হযরত হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামত দিবস যখন সকলকে এক ময়দানে সমবেত করা হইবে তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, যাহার সাহস হয় আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। যে ব্যক্তি কাহারও অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে তাহাকে ব্যতীত অপর কেহই দণ্ডায়মান হইবে না। ইহা শুনিয়া খলীফা বলিলেন ঃ এই অপরাধীকে ছড়িয়া দাও। আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলাম।

শাসনকর্তাগণের সম্মুখে কেহ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলেই অধিকাংশ সময় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন; এমন কি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতেও উদ্যত হন। এই সময় হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর প্রতি হযরত ঈসা (আ)-এর উপদেশ তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত। তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে বলিয়াছিলেন ঃ কেহ তোমাকে কিছু বলিলে তাহা যদি সত্য হয় তবে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তাহা মিথ্যা হইলে আরও অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কারণ বিনাপরিশ্রমে তোমার আমলনামায় একটি নেকী বৃদ্ধি পাইল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলিল তাহার ইবাদত হইতে প্রাপ্ত নেকী ফেরেশতা তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সমীপে লোকে বলিল ঃ অমুক ব্যক্তি খুব শক্তিশালী। হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ লোকটি কেমন ? তাহারা নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে ব্যক্তি যাহার সহিতই কুস্তি লড়ে তাহাকেই পরাস্ত করে এবং সকলের সহিতই কুস্তিতে বিজয়ী হয়। হুযূর (সা)

বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তিই শক্তিশালী ও বাহাদুর যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রোধকে পরাস্ত করে; যে ব্যক্তি অপরকে পরাস্ত করে সে বাহাদুর নহে। হুযূর (সা) বলেন যে, তিনটি বিষয় আয়ত্তে আনিতে পারিলে মানুষের ঈমান পূর্ণতা লাভ করে ঃ (১) ক্রোধের সময় অন্যায় কার্যের ইচ্ছা না করা, (২) আনন্দের সময় কাহারও হক ভুলিয়া না যাওয়া এবং (৩) ক্ষমতা হাতে পাইলে নিজের প্রাপ্য হক অপেক্ষা অধিক গ্রহণ না করা।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ ক্রোধের সময়ে কাহাকেও না দেখা পর্যন্ত তাহার সৎস্বভাবের উপর বিশ্বাস করিও না এবং লোভের সময়ে যাচাই না করা পর্যন্ত কাহারও ধার্মিকতার উপর আস্থা স্থাপন করিও না। হযরত আলী ইব্‌ন হযরত হুসায়ন (রা) একদা মসজিদে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। পরিচারকগণ তাহাকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে বারণ করিয়া বলিলেন ঃ প্রিয় ভ্রাতঃ আমার যে দোষ তোমার অজ্ঞাত রহিয়াছে তাহা তুমি যাহা প্রকাশ করিতেছ তদপেক্ষা অধিক। আচ্ছা, তোমার এমন কোন অভাব আছে কি যাহা আমি পূরণ করিতে পারি ? ইহা শুনিয়া লোকটি অত্যন্ত লজ্জিত হইল। তিনি স্বীয় পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া লোকটিকে উপহার দিলেন এবং তাহাকে সহস্র দিরহাম দান করিবার জন্য স্বীয় পরিচারককে নির্দেশ দিলেন। লোকটি এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এই মহাত্মা বাস্তবিকই মহান রাসূল (সা)-এর উপযুক্ত বংশধর। এই মহাপুরুষের সম্বন্ধেই আরও কয়েকটি কাহিনী বর্ণিত আছে। একদা তিনি স্বীয় পরিচারককে দুইবার আহ্বান করিলেন। কিন্তু সে উত্তর দিল না। তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি শুনিতে পাও না ? সে বলিল ঃ আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ তবে উত্তর দিলে না কেন ? সে উত্তর করিল ঃ আপনার সৎস্বভাবের দরুন আমি নির্ভয় ছিলাম যে, আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমার পরিচারক আমা হইতে নির্ভয় রহিয়াছে। এই মহাপুরুষের অপর এক গোলাম ছিল। একদিন সে তাঁহার ছাগলের পা ভাঙ্গিয়া দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কেমন করিয়া তুমি এইরূপ কাজ করিলে ? সে বলিল ঃ আপনাকে রাগান্বিত করিবার জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই ইহা করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ যে শয়তান তোমাকে এইরূপ কুমন্ত্রণা দিয়াছে আমি এখন তাহাকেই রাগান্বিত করিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গোলামটিকে আযাদ করিয়া দিলেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে গালি দিল। তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ হে যুবক! আমার ও দোযখের মধ্যে এই ঘাটিটিই রহিয়াছে। আমি যদি এই ঘাটি অতিক্রম করিতে পারি তবে যাহা কিছু তুমি বলিলে তজ্জন্য আমি আদৌ পরওয়া করি না। আর যদি অতিক্রম করিতে না পারি তবে তুমি যাহা বলিলে তদপেক্ষাও আমি নিকৃষ্টতর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এমন লোকও আছে যে সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার গুণে সারা বৎসর রোযা রাখা ও সারারাত্র দণ্ডায়মান হইয়া নামায পড়ার মর্যাদা লাভ করে। আর এমন লোকও আছে যাহাদের নাম উৎপীড়কদের তালিকাভুক্ত হইয়া থাকে, অথচ নিজ পরিবারবর্গ ব্যতীত অপর কাহারও উপর তাহাদের শাসন-ক্ষমতা ছিল না। হুযূর (সা) বলেন ঃ দোযখের একটি দরজা আছে; যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী ক্রোধ করে, সে ব্যতীত অপর কেহই এই দরজা দিয়া দোযখে প্রবেশ করিবে না।

বর্ণিত আছে যে, শয়তান হযরত মূসা (আ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল ঃ আমি আপনাকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দিব। ইহার বিনিময়ে আপনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিবেন। হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ এই তিনটি বিষয় কি ? শয়তান বলিল ঃ (১) উষ্ণ স্বভাব ও ক্রোধ বর্জন করুন। কারণ, উষ্ণ ও হালকা স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এইরূপে খেলা করিয়া থাকি যেমন বালকেরা বল লইয়া খেলা করিয়া থাকে। (২) স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকুন। কারণ, মানুষের জন্য আমি যত ফাঁদ পাতিয়াছি তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কোন ফাঁদের উপরই আমার আস্থা নাই। (৩) কৃপণতা হইতে আত্মরক্ষা করুন। কারণ, কৃপণের ইহ-পরকাল উভয় আমি ধ্বংস করিয়া ফেলি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-বলেন ঃ যে ব্যক্তি অপরের প্রতি ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তরকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা ভরপুর করিয়া দেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট হীনতা প্রকাশার্থে আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করে না, আল্লাহ্ তাহাকে মর্যাদার পোশাকে অলংকৃত করিয়া থাকেন। হুযূর (সা) বলেন, যে ব্যক্তি (অন্যের উপর) ক্রুদ্ধ হয় এবং নিজের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ ভুলিয়া যায়, তাহার জন্য আফসোস। এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর নিকট আবেদন করিল ঃ আমাকে এমন একটি কাজ শিখাইয়া দিন যদ্দ্বারা আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ক্রুদ্ধ হইও না। তাহা হইলে তোমার জন্য বেহেশত রহিয়াছে। সে ব্যক্তি আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে হুযূর (সা) বলিলেন ঃ কাহারও নিকট কিছু চাহিও না। তাহা হইলে তোমার জন্য বেহেশত। সে ব্যক্তি আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে হুযূর (সা) বলিলেন ঃ আসরের নামাযের পর সত্তরবার আস্তাগফিরুল্লাহ্ পড়িবে তবে করুণাময় আল্লাহ্ তোমার সত্তর বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। সে ব্যক্তি বলিল ঃ আমার সত্তর বৎসরের গুনাহ নাই। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তোমার আম্মার গুনাহ মার্জিত হইবে। সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ আমার আম্মারও এত গুনাহ নাই। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তোমার আব্বার গুনাহ্ মার্জিত হইবে। সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ আমার আব্বারও এত গুনাহ্ নাই। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তোমার মুসলমান ভাইগণের গুণাহ আল্লাহ মার্জনা করিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু ধন বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ঃ এই বিতরণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইতেছে না অর্থাৎ ইহাতে ন্যায়বিচার রক্ষিত হইতেছে না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) লোকটির এই উক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গোচরীভূত করিলে তিনি রাগান্বিত হইলেন এবং তাঁহার পবিত্র বদন মণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল, তথাপি তিনি ইহার অধিক আর কিছুই বলিলেন না ঃ আমার ভাই (হযরত) মূসা (আ) -এর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক। কারণ, লোকে তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি কষ্ট দিয়াছিল এবং তিনি উহা অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন।

বিচারক ও শাসনকর্তাগণের উপদেশ গ্রহণের জন্য উপরিউক্ত উপাখ্যানসমূহ এবং হাদীস-বাণীগুলিই যথেষ্ট। কারণ, তাঁহাদের অন্তরের আসল ঈমান বিদ্যমান থাকিলে এইগুলিই তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। আর যদি দেখা যায় যে, এই সমস্ত উপাখ্যান ও হাদীস-বাণী তাঁহাদের অন্তরে কোনই প্রভাব বিস্তার করে না তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের হৃদয়ে ঈমানের লেশমাত্রও নাই: কেবল ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই অবশিষ্ট আছে। ঈমানের বিষয়গুলির মৌখিক স্বীকৃতি এক কথা এবং অন্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ঈমান ভিন্ন জিনিস। যে সকল শাসক ও কর্মচারী প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মুদ্রা হারাম উপায়ে আদায় করতঃ অপরাপর লোককে প্রদান করে, আবার এ সমস্ত অর্থের দায়িত্ব আদায়কারীদের স্কন্ধেই থাকিয়া যায় এবং কিয়ামত-দিবস ইহার হিসাব-নিকাশ তাহাদের নিকটই তলব করা হইবে, আমি বুঝিতে পারি না যে, তাহাদের অন্তরে যথার্থ ঈমান কিরূপে থাকিতে পারে। অথচ এই সমস্ত অর্থ দ্বারা অপর লোকেরাই লাভবান হইয়াছে। কেবল সংসারাসক্ত অবিবেচক বেঈমান লোকেরাই এইরূপ কার্য করিতে পারে।

والله اعلم بالصواب وعنده ام الكتاب-